

ইতিহাস

দ্বি-বার্ষিক সেমেস্টার ভিত্তিক স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

এম এ প্রথম সেমেস্টার

বাধ্যতামূলক পাঠ -১

Historiography in Theory and Practice

পাঠ সহায়ক গ্রন্থ



**Directorate of Open and Distance Learning (DODL),
University of Kalyani,
Kalyani, Nadia.**

বিষয় সমিতিঃ

- ১) ডঃ সুভাষ বিশ্বাস (প্রধান, ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়) - সভাপতি।
- ২) শ্রী অলোক কুমার ঘোষ (ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)- সদস্য।
- ৩) অধ্যাপক অনিল কুমার সরকার (ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)-সদস্য।
- ৪) অধ্যাপক রূপকুমার বর্মণ (ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)-সদস্য।
- ৫) ডঃ বিদ্যুৎ পাতর সহকারী অধ্যাপক, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)-সদস্য।
- ৬) শ্রী সুকৃত মুখাজ্জী সহকারী অধ্যাপক, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)-সদস্য।
- ৭) অধ্যাপক তপতী চক্রবর্তী (অধিকর্তা, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়) -সদস্য।

বর্তমান গ্রন্থটি রচনায় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন,

শ্রী সুকৃত মুখাজ্জী (সহকারী অধ্যাপক, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)

ডঃ বিদ্যুৎ পাতর (সহকারী অধ্যাপক, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)

- মুদ্রণ মার্চ ২০২১।
- গ্রন্থটি বিভিন্ন বই ও ইন্টারনেট সূত্র থেকে তথ্য একত্র করে নির্মিত।
- প্রণেতাগণ এর মৌলিকত্ব দাবী করেন না।

Director's Note

Open and Distance Learning (ODL) systems play a threefold role- satisfying distance learners' needs of varying kinds and magnitudes, overcoming the hurdle of distance and reaching the unreached. Nevertheless, this robustness places challenges in front of the ODL systems managers, curriculum designers, Self Learning Materials (SLMs) writers, editors, production professionals and other personnel involved in them. A dedicated team of the University of Kalyani under the leadership of Hon'ble Vice-Chancellor has put its best efforts, professionally and in unison to promote Post Graduate Programmes in distance mode offered by the University of Kalyani. Developing quality printed SLMs for students under DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2017 had been our endeavour and we are happy to have achieved our goal.

Utmost care has been taken to develop the SLMs useful to the learners and to avoid errors as far as possible. Further suggestions from the learners' end would be gracefully admitted and to be appreciated.

During the academic productions of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.)Manas Kumar Sanyal , Hon'ble Vice- Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Due sincere thanks are being expressed to all the Members of PGBOS (DODL), University of Kalyani, Course Writers- who are serving subject experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have been utilized to develop these SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would like to convey thanks to all other University dignitaries and personnel who have been involved either at a conceptual level or at the operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their concerted efforts have culminated in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any form without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials are self writing and collected from e-book, journals and websites.

Date: 24.10.2021

Director
Directorate of Open & Distance Learning
University of Kalyani,
Kalyani, Nadia,
West Bengal

SEMESTER- 1

COR-101	4 CREDITS	100 MARKS	120 HOURS
----------------	------------------	------------------	------------------

COR-101: Historiography in Theory and Practice

BLOCK-1: Meaning, scope and importance of History

Unit-1: Meaning and Scope of History.

Unit-2: Truth, Fact and Evidence

BLOCK-2: Objectivities and bias in History; Causation in History

Unit-3: Causation.

Unit-4: Objectivity and bias in History

BLOCK-3: History and its auxiliary subjects: Is history a science, social science, or Arts?

Unit-5: History and Sciences

Unit-6: History and its auxiliary disciplines.

BLOCK-4: Major Theories of Historical Writing

Unit-7: Cyclical, Comparative, Positivist.

Unit-8: Marxist, Post-Marxist.

Unit-9: Post-modernist.

BLOCK-5: Major Thinkers

Unit-13: Von Ranke (1795-1886), Oswald Spengler (1880-1936), Marc Bloch (1886-1944),
Arnold Toynbee (1889-1975).

Unit-14: F.Braudel (1902-85), E.Hobsbawm (1917-2012), E.P.Thompson (1924-93).

BLOCK-6: Themes in Indian History

Unit-15: Dalit, Gender, New Cultural Histories and HISTEM.

Unit-16: Significance of regional History.

পর্যায় গ্রন্থ - ১

একক ১

Meaning and Scope of History

বিন্যাসক্রম :

উপ-একক - ১

১.১.১.১.০ : উদ্দেশ্য

১.১.১.১.১ : সূচনা

১.১.১.১.২ : ইতিহাসের সংজ্ঞা

১.১.১.১.৩ : ইতিহাসের স্বরূপ ও আলোচনার পরিধি

১.১.১.১.৩.১ : ইউরোপে জ্ঞানদীপ্তির যুগে ও পরে ইতিহাসের স্বরূপ

১.১.১.১.৩.২ : উনিশ শতকের শেষ পর্ব ও বিশ শতকে ইতিহাসচর্চার প্রকৃতি ও বিশেষত্ব

১.১.১.১.৪ : উপসংহার

১.১.১.১.৫ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১.১.১.১.৬ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

উপ-একক - ১

১.১.১.২.০ : উদ্দেশ্য

১.১.১.২.১ : ইতিহাসের তথ্য বিশ্লেষণের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক

১.১.১.২.২ : উপসংহার

১.১.১.২.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১.১.১.২.৪ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

উপ-একক - ১

Meaning and Scope of History

১.১.১.১.০ : উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন :

- (১) 'ইতিহাস' কি বা 'ইতিহাস' বলতে কি বোঝায় — ইতিহাসের সংজ্ঞা নির্ধারণে জটিলতা ও সমস্যার কারণ।
- (২) ইতিহাসের স্বরূপ ও পরিধি—যুগে যুগে এই পরিধির সম্প্রসারণ।
- (৩) ইউরোপে জ্ঞানদীপ্তির যুগের পূর্বে ও পরে ইতিহাসের প্রকৃতি।
- (৪) উনিশ শতকের শেষ পর্বে ও বিশ শতকে ইতিহাসচর্চার প্রকৃতি ও বিশেষত্ব।

১.১.১.১.১ : সূচনা

ইতিহাস শব্দটি এসেছে 'ঐতিহ্য' শব্দ থেকে। এর অর্থ হল : "অতীতে যা ঘটেছে"। ইংরেজী 'History' অর্থে 'ইতিহাস' কথাটি ব্যবহার করা হয়। History শব্দটির উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ 'Histor' অর্থাৎ জ্ঞান এবং গ্রীক

লাতিন শব্দ 'Histor' অর্থাৎ জ্ঞান এবং গ্রীক 'Historia' শব্দ অর্থাৎ 'সমস্ত অনুসন্ধান' এই দুই থেকেই 'History' শব্দটির উৎপত্তি।

'Historia' শব্দ থেকে। 'Historia' শব্দটির অর্থ হল 'সমস্ত অনুসন্ধান'। ইতিহাসের জনক বলে পরিচিত গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস প্রথম 'History' শব্দটি ব্যবহার করেন। এর পর থেকেই এই শব্দটি প্রচলিত হয়ে আসছে।

প্রশ্ন

- ১। ইতিহাসের অর্থ কি?
- ২। 'History' শব্দটি কোথা থেকে এসেছে?

১.১.১.১.২ : ইতিহাসের সংজ্ঞা

এখন প্রশ্ন হল, ইতিহাস কি? ইতিহাস কাকে বলে? নিছক অতীতের কাহিনীকেই কি ইতিহাস বলা যাবে? ইতিহাসের প্রকৃত সংজ্ঞা বা প্রকৃতি কি? এই বিষয়ের সন্ধান মনে হয় অসম্ভব। ইতিহাসের প্রকৃতি, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি ও উপকারিতার বলয় নিয়ে সর্বজনস্বীকৃত কোনো সংজ্ঞা পাওয়া কঠিন। বিভিন্ন দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞানী ও ইতিহাসবেত্তা নানা অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে ইতিহাসের স্বরূপ উদ্ঘাটনে প্রয়াসী হন। তাঁদের লেখনীতে

ইতিহাস কি? ইতিহাসের প্রকৃত সংজ্ঞাই বা কি? এই সব বিভিন্ন প্রশ্নের সঠিক উত্তর কোন একটি একক লেখায় পাওয়া যায় না। কারণ এ বিষয়ে সঠিক ধারণা পেতে হলে ইতিহাস নিয়ে আরো অনুসন্ধান ও প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

বিষয়টির বিভিন্ন দিক ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ লাভ করে। এ অভিমতসমূহ পৃথক পৃথকভাবে একদিকে যেমন আমাদের বিষয়ে আংশিক ধারণা দেয়, অন্যদিকে এগুলো আবার বিষয়টির উপর সমকালীন ভাব ও চিন্তাজগতের ধ্যান-ধারণার প্রতিফলনও বটে। কিন্তু বর্তমানকালে ইতিহাস বলতে আমরা যা বুঝি তার সামগ্রিক প্রকাশ কোনো একক লেখায় পাওয়া সম্ভব নয়। অতএব ইতিহাস বিষয়ে আধুনিক ধারণা নিতে হলে নানা অনুসন্ধান ও প্রচেষ্টা চালাতে হবে। ইতিহাসের সঠিক ব্যাখ্যা বা নিখুঁত সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে নানা জটিলতা ও অসুবিধা রয়েছে। এইজন্যই বলা হয়ে থাকে যে, “To define history definitely or accurately is a preposterous proposition.”

ইতিহাসের চূড়ান্ত সংজ্ঞা নির্ধারণে যে অতীতে কখনো সম্ভব হয়নি বা ভবিষ্যতেও হওয়ার সম্ভাবনা কম, তার জন্য দায়ী অনেক কারণ হয়েছে। প্রথমতঃ ইতিহাসের লক্ষ্য বা আদর্শের প্রকৃতি ঘন ঘন পরিবর্তনশীল।

যেহেতু ইতিহাসের লক্ষ্য, আদর্শ, বিষয়বস্তু ও আলোচনার সীমা সর্বদা পরিবর্তিত হতে থাকে সেহেতু এর সর্বজনগ্রাহ্য কোনো সংজ্ঞা নির্ণয় করা অত্যন্ত জটিল।

দ্বিতীয়তঃ ইতিহাসের বিষয়বস্তু, আলোচনার সীমা থেমে থাকে না, তা অনবরত সম্প্রসারিত হতে থাকে। প্রথম কারণটির ব্যাখ্যা করলে বলা যায়, ইতিহাসের সুনির্দিষ্ট আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কে ইতিহাসবেত্তারা কখনই একমত হতে পারেননি। এর কারণ সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের লক্ষ্য ও আদর্শেরও পরিবর্তন ঘটেছে। আবার ইতিহাসের

লক্ষ্যও বিভিন্ন ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে পৃথক পৃথকভাবে ধরা দিয়েছে। দ্বিতীয় কারণের ব্যাখ্যা হিসেবে বলা যায়, ইতিহাসের বৌদ্ধিক সীমার মধ্যে যে সব বিষয় পড়ে, তাদের সংখ্যা বা আলোচ্য বিষয় কখনই অটুট থাকতে পারে না। কারণ যুগের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক পুরোনো বিষয় নতুন আঙ্গিকে বা নতুন অনেক বিষয় ইতিহাসের আলোচনায় ঢুকে পড়ে এবং অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এইসব নানা সমস্যা ও জটিলতা ইতিহাসের সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে।

প্রশ্ন

- ১। ইতিহাসের প্রকৃত সংজ্ঞা কি?
- ২। ইতিহাসের চূড়ান্ত সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে না পারার দুটি কারণ কি?

১.১.১.১.৩ : ইতিহাসের স্বরূপ ও আলোচনার পরিধি

তবুও বিগত বিভিন্ন শতাব্দীতে প্রখ্যাত ঐতিহাসিকগণ অতীতের নানা ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে তাদের যে সব মতামত ইতিহাসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমাদের উপহার দিয়েছেন, সেগুলোর আলোচনা থেকে ইতিহাসের বিভিন্ন সংজ্ঞা, প্রকৃতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ধরা যাবে। যদিও এই মতামতের ক্ষেত্রে নানা পার্থক্য ও চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটেছে তথাপি তাদের মতামত ও সংজ্ঞাগুলিকে একত্রিত করলে সামগ্রিকভাবে ইতিহাসের একটি অপেক্ষাকৃত পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যেতে পারে। এর মাধ্যমে ইতিহাসের ব্যাপক

বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা থেকে ইতিহাসের সংজ্ঞা, প্রকৃতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। ইতিহাসের সরল ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অনেকে ইতিহাসকে মূলতঃ মানুষের কাহিনী বলেই মনে করেন। কিন্তু এই সরল ব্যাখ্যা যথেষ্ট নয়। বিষয়টি সম্পর্কে আরো গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। তবেই আমরা ইতিহাসকে সঠিকভাবে জানতে পারব।

বৈচিত্র্য সম্পর্কেও ধারণা গঠন করা সম্ভব হতে পারে। ইতিহাসের সরল ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অনেকে তাকে মূলত মানুষের কাহিনী বলেই মনে করেছেন। কারণ তাদের মতে, মানুষই ইতিহাসের মূল নায়ক এবং তাদেরকে কেন্দ্র করেই ইতিহাসের যাবতীয় গঠনা গড়ে উঠেছে। কিন্তু বিষয়টি সম্পর্কে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি লাভের জন্য এই সরল ব্যাখ্যা যথেষ্ট নয়। আরও নানা গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা বা আলোচনার বিষয়বস্তুকে অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করা জরুরী হয়ে পড়েছে। কারণ এই সংজ্ঞাগুলির সতর্ক বিবেচনার মাধ্যমেই একমাত্র জ্ঞানলাভ করা সম্ভব বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ বা প্রেক্ষাপট সম্পর্কে, যার সাহায্যে ঐতিহাসিকগণ ইতিহাসকে লক্ষ্য বা বিবেচনা করেছেন।

প্রশ্ন

- ১। ইতিহাসের মূল নায়ক কারা?
- ২। ইতিহাস সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা কিভাবে সম্ভব?

কোনো কোনো ঐতিহাসিক ইতিহাসের শিক্ষামূলক বা উপদেশমূলক ভূমিকাটির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ডায়োনিসিয়াস সুপ্রাচীনকালেই ইতিহাসের প্রয়োজনীয় কার্যাবলী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন, “History is philosophy drawn from examples”। অর্থাৎ দৃষ্টান্ত থেকে গ্রহণ করা দার্শনিক শিক্ষাই হলো

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডায়োনিসিয়াস-এর মতে দৃষ্টান্ত থেকে গ্রহণ করা দার্শনিক শিক্ষাই হল ইতিহাস। “ফ্রান্সিস বেকনের মতে ইতিহাস হল জ্ঞান বিজ্ঞানের এমন একটি শাখা যা মানুষকে জ্ঞানী করে তোলে। কিন্তু এই জ্ঞান ইতিহাস তথ্য সম্পর্কে জ্ঞান নয়, এর অর্থ হল সংযম বা পরিমিত বোধ, যা কেবল মাত্র ইতিহাস পাঠ করলে অর্জন করা যায়।

ইতিহাস। ডায়োনিসিয়াস মনে করতেন ইতিহাস একান্তভাবেই শিক্ষামূলক ও নীতিবিরোধসংক্রান্ত মূল্যবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত। আবার ফ্রান্সিস বেকন ইতিহাসের পাঠ থেকে জ্ঞানার্জন, সংযম বা পরিমিতবোধ লাভের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, “History is a discipline which makes man wise.” অর্থাৎ ইতিহাস জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন একটি শাখা বা মানুষকে জ্ঞানী করে। তাঁর মতে, এই

জ্ঞান ইতিহাসের তথ্য সম্পর্কে জ্ঞান নয়, এর অর্থ হল সংযম বা পরিমিতবোধ, যা কেবলমাত্র ইতিহাস পাঠ করলে অর্জন করা যায়। ইতিহাসের চরিত্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে স্যার ওয়াল্টার র্যালের অনেকটা ফ্রান্সিস বেকনের সঙ্গে সুর মিলিয়েছেন র্যালের মতে, “সমস্ত ইতিহাসেরই চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো বিগত দিনের উদাহরণ বা ঘটনাবলী থেকে সেই শিক্ষা দেওয়া, যে শিক্ষা আমাদের ইচ্ছা এবং কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে”। র্যালের ইতিহাসের এই শিক্ষামূলক দিকটির উপরই বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছেন।

প্রশ্ন

- ১। ‘History is a discipline which makes man wise’ এটি কার উক্তি? এর প্রকৃত অর্থ কি?
- ২। “History is philosophy drawn from examples” এটি কার উক্তি? এর প্রকৃত অর্থ কি?
- ৩। ঐতিহাসিক র্যালের ইতিহাসের কোন দিকটির উপর বেশি জোর দিয়েছেন?

আবার লাইবনিৎস (Leibnitz) বা লেকির (Lecky) মতো ঐতিহাসিকগণ মনে করেন, ইতিহাসের মূল ভিত্তি হলো একান্তভাবেই ধর্ম বা ধর্মসংযুক্ত নীতিবোধ। তাঁদের মতে, ইতিহাস বিভিন্ন সভ্যতার উত্থান-পতনের

মধ্যে, মানুষের নানা ক্রিয়া-কর্মের মধ্যে ধর্মই বার বার প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। তবে লাইবনিৎস ইতিহাসের মূল ভিত্তি হিসেবে বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানযুক্ত ধর্মের উপর জোর দিলেও (যেমন হিন্দুধর্ম, ইসলাম, খ্রিস্টান ধর্ম ইত্যাদি), লেখক কিন্তু জোর দিয়েছেন নৈতিক মূল্যবোধ বা নীতিবোধের উপর। তাঁর মতে, নৈতিক বিপ্লবই ইতিহাসে বড় বড় বিপ্লবের উদ্ভব ঘটাতে পারে।

লাইবনিৎস বা লেকির মতে ধর্ম ইতিহাসে বিভিন্ন সভ্যতার উত্থান পতন ঘটালেও নৈতিক বিপ্লবই একমাত্র বড় বিপ্লব ঘটাতে পারে।

প্রশ্ন

১। ইতিহাসের মূলভিত্তি হিসেবে কারা ধর্মের কথা বলেন?

আবার আরেক দল ঐতিহাসিক তাঁদের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে 'Personality cult' বা ব্যক্তিত্বের পূজাবাদে অধিকতর আস্থা স্থাপন করেন। এই মতে বিশ্বাসী ঐতিহাসিকদের মতে, পৃথিবীর বহু দেশের ইতিহাসের সিংহভাগ অধিকার করে রয়েছেন বিখ্যাত যোদ্ধা, সাম্রাজ্যবিজেতা, দক্ষ প্রশাসক বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনন্য কৃতিত্বের অধিকারী ঐতিহাসিক মহান ব্যক্তিত্ব। এই দলের ঐতিহাসিকদের মতে, ১৭৯৯ থেকে ১৮১৫ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সের ইতিহাস একান্তই ফরাসি সম্রাট প্রথম নেপোলিয়নের ব্যক্তিত্বে ইতিহাস, কারণ সে সময় ফ্রান্স তথা ইউরোপের ইতিহাসের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন তিনিই। এই মতের সবচেয়ে বড় সমর্থক ছিলেন উনিশ শতকের খ্যাতনামা ইংরেজ দার্শনিক ও ঐতিহাসিক টমাস কার্লাইল (Thomas Carlye)। তাঁর মতে, এই পৃথিবীতে মানুষের অর্জিত সাফল্যের মূলে রয়েছে কয়েকজন মহান ব্যক্তিত্বের মহান কার্যকলাপের ইতিহাস। কার্লাইল আরো মনে করেন, একটি দেশের সামাজিক জীবনের অগ্রগতি পেছনে বিখ্যাত, মহান ব্যক্তিবর্গের সামাজিক জীবনযাত্রার সমষ্টিগত ফলাফল গুরুত্ব হয়ে দেখা দিয়েছে। কার্লাইলের ব্যক্তিপূজাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করেছেন আর. ডবলিউ. এমার্সন (R.W.Emmerson). তিনি আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেন— “Thers is properly no history but only biography” অর্থাৎ ইতিহাস বলতে যা বোঝায় তা কেবল ব্যক্তির জীবনী। একথা অনস্বীকার্য যে, পৃথিবীর ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ইতিহাসের মহৎ ব্যক্তিগণ তাঁদের অনন্য কৃতিত্ব ও জীবনদর্শের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে জাতীয় জীবন ও সমসাময়িক ইতিহাসকে অনেকাংশে প্রভাবিত করে গেছেন। তবে একইসঙ্গে ইতিহাসকে এই সংকীর্ণতার সীমায় আবদ্ধ রাখলে সঠিক হবে না। কারণ সমাজ গঠনে বা ইতিহাস পরিবর্তনে অনামী বৃহত্তর সাধারণ মানুষের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনেক সময়েই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। সেই ইতিহাস আমাদের ভুললে চলবে না।

টমাস কার্লাইল ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে কয়েকজন মহান ব্যক্তিত্বের কার্যকলাপের কথা বলেন। কিন্তু ইতিহাসকে সঙ্গীর্ণতায় আবদ্ধ রাখলে চলবে না কারণ সমাজ গঠনে বা ইতিহাস পরিবর্তনে অনামী বৃহত্তর সাধারণ মানুষের একটা গুরুত্বপূর্ণ বড়ো ভূমিকা রয়েছে।

প্রশ্ন

১। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্র হিসেবে কারা 'personality cult'-এর কথা বলেন?

২। ইতিহাস পরিবর্তনে বা সমাজ গঠনে সাধারণ মানুষের কতটা ভূমিকা রয়েছে?

আবার ইতিহাসের স্বরূপ সম্পর্কে নেতিবাচক এবং নৈরাশ্যজনক সংজ্ঞা প্রদান করেছেন ভলতেয়ার (Voltaire), গিবন (Gibbon) বা জেমস জয়েসের (James Joyce)-এর মতো দার্শনিক-ঐতিহাসিকগণ। ভলতেয়ার বলেন,

“History is just the portrayal of crimes and fortunes” অর্থাৎ ইতিহাস কেবল ধারাবাহিক অপরাধ ও দুর্ভাগ্যের কাহিনী। আরও এক ধাপ এগিয়ে গিবল বলেছেন যে, ইতিহাস হল মানব জাতির দুর্ভাগ্য, মূর্খতা ও

কিছু দার্শনিক ঐতিহাসিক অতীতের নানা যুদ্ধবিগ্রহ, ধ্বংসলীলা, নিষ্ঠুরতা অন্যায়-অত্যাচার ইত্যাদি ঘটনা পড়ে এতটাই বিচলিত যে তাদের মতে ইতিহাস কেবল ধারাবাহিক অপরাধ ও দুর্ভাগ্যের কাহিনী। এর অর্থ ইতিহাসের কেবল মন্দ দিকটাই তারা দেখেছেন, ভাল দিকটা নয়, একারণে তাদের ইতিহাসটা অর্ধসত্য ও অখণ্ডিত ইতিহাস।

অপরাধের নথিবন্ধ বিবরণী। ইতিহাসের চরিত্র বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে এই হতাশার ও অন্ধকারজনিত বিবরণীর চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা গেছে জেমস জয়েসের লেখায়। তিনি বলেন, “History is a nightmare from which I am trying to awaken”. ইতিহাস তার কাছে এক দুঃস্বপ্ন, যা কাটাবার তিনি অনবরত চেষ্টা করে গেছেন। এইসব লেখকদের বিবরণ ও মন্তব্য থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে যে,

অতীতের নানা যুদ্ধবিগ্রহ, ধ্বংসলীলা, অমানবিক নিষ্ঠুরতা, অন্যায়-অত্যাচার, অবিচার ইত্যাদির ঘটনা পড়ে তাঁরা এতই বিচলিত ও মর্মান্বিত হয়েছেন যে ইতিহাসের কেবল মন্দ দিকটাই তাদের মনে গেঁথে গেছে, ভাল দিকটা তাঁদের লেখায় স্থান লাভ করেনি। এর ফলে তাদের ইতিহাস এক খণ্ডিত ও অর্ধসত্য উপস্থাপিত করেছে।

প্রশ্ন

- ১। ইতিহাসের স্বরূপ সম্পর্কে কারা নেতিবাচক এবং নৈরাজ্যজনক সংজ্ঞা প্রদর্শন করেন?
- ২। ‘History is just the portrayal of crimes and fortunes’ এটি কার উক্তি? এর অর্থ কি?

১.১.১.১.৩.১ : ইউরোপে জ্ঞানদীপ্তির যুগে ও পরে ইতিহাসের স্বরূপ

ইউরোপে জ্ঞানদীপ্তির যুগে (Age of Enlightenment) প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ইতিহাসচর্চা প্রণালী ও বিষয়বস্তুর পরিবর্তে আধুনিক ইতিহাসচর্চা প্রণালীর সূচনা ঘটে। বিখ্যাত ফরাসি দার্শনিক ভলতেয়ারের নেতৃত্বে একদল ঐতিহাসিক আধুনিক ইতিহাসচর্চার গোড়াপত্তন করেন। প্রধানতঃ মধ্যযুগের ধর্মভিত্তিক ইতিহাসচর্চার বদলে ধর্মনিরপেক্ষ, যুক্তিবাদী এক নতুন ইতিহাসচর্চা ইউরোপে বিকশিত হতে থাকে। এর ফলে ইতিহাসের স্বরূপ, বিষয়বস্তু, পরিধির পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ইতিহাসের পরিধি ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হতে থাকে। ভলতেয়ার ও রবার্টসন ইতিহাসকে মধ্যযুগীয় ধর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত করে যুক্তিবাদী, বৈজ্ঞানিক ইতিহাসচর্চার দিকে টেনে নিয়ে যান; জ্ঞানদীপ্ত ঐতিহাসিকরা এই নতুন আলোকে তাদের ইতিহাস লেখা শুরু করেন। সাহিত্য ও ধর্মের মোড়ক থেকে মুক্ত হয়ে ইতিহাস বিজ্ঞান ও যুক্তিনির্ভর প্রকৃত ইতিহাসে পরিণত হল। রাজা-রাজড়াদের ইতিহাস বদলে হল মানব সমাজের অগ্রগতির ও সভ্যতা-সংস্কৃতির কাহিনী। ইতিহাসের উদ্দেশ্য ও আদর্শের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রকৃতিরও পরিবর্তন হল।

ইউরোপে জ্ঞানদীপ্তির যুগে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় অর্থাৎ ধর্ম ও সাহিত্য ভিত্তিক ইতিহাস চর্চা প্রণালী ও বিষয় বস্তুর পরিবর্তে আধুনিক অর্থাৎ বিজ্ঞান ও যুক্তি নির্ভর ইতিহাস চর্চা প্রণালীর সূচনা ঘটে।

প্রশ্ন

- ১। Enlightenment-এর যুগে ইতিহাস চর্চার কি পরিবর্তন ঘটেছিল?

উনিশ শতকে ইতিহাস রচনার পদ্ধতি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে ব্যবধান গড়ে উঠল। তাদের মধ্যে শুরু হল বিতর্ক। ইতিহাসের তথ্য ও বিশ্লেষণ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিল। একদল ঐতিহাসিক বললেন, ইতিহাস কেবলমাত্র ঘটনা বর্ণনা করেই তাদের কাজ শেষ করবে। তাদের মতে, মূলতঃ তথ্যের উপস্থাপনাই ঐতিহাসিকদের প্রধান কাজ। তবে এই তথ্য হবে পরীক্ষিত সত্য। তাই তথ্যের দিক থেকে উনিশ শতক ছিল এক মহান যুগ। ‘কঠিন সময়’ (হার্ড টাইমস্) উপন্যাসে থ্যাডগ্রিগু বলেছিলেন, ‘আমি যা চাই তা হলো তথ্য।... জীবনে শুধু তথ্যই চাই।’ উনিশ শতকের ঐতিহাসিকরা মোটের পর তাঁর সঙ্গে একমত ছিলেন। ইতিহাসকে নৈতিক রূপ দেওয়ার প্রতিবাদ হিসেবে জার্মান ঐতিহাসিক র্যাঙ্কে (Ranke) মন্তব্য করেন, ঐতিহাসিকের কর্তব্য হলো, ‘আসলে কি রকম ছিল ঠিক তা-ই দেখানো।’ এই ধুর্যো তুলে লড়াই-এ এগিয়ে গিয়েছিলেন তিন প্রজন্মের জার্মান, ব্রিটিশ, এমনকি ফরাসি ঐতিহাসিকরা। র্যাঙ্কে ছিলেন জার্মানির সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ঐতিহাসিক। বৌদ্ধিক অনুসন্ধিৎসা এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য সম্পর্কে আগ্রহ র্যাঙ্কেকে উনিশ শতকের প্রধান ঐতিহাসিক করে তুলেছে। সাধারণভাবে আধুনিক ঐতিহাসিকের মধ্যে তাঁকেই প্রথম আধুনিক মনে করা হয়। র্যাঙ্কে তাঁর ইতিহাসচর্চায় সবক্ষেত্রই ‘objectivity of History’ বা বস্তুগত বা বিষয়গুলি ইতিহাসের প্রতি ও তথ্যের প্রতি গুরুত্ব দিতেন। ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে বা ইতিহাসের স্বরূপ উদ্ঘাটনে তিনি এক নতুন পদ্ধতি নিয়ে আসেন। এই পদ্ধতি ঐতিহাসিক উপাদানগুলির যথাযথ ও সযত্ন ব্যবহার। Objective ইতিহাস রচনার পদ্ধতি হিসাবে তিনি মৌলিক উপাদানগুলির সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ আগে করতেন। চিরাচরিত গল্পগাথাকে তিনি বাতিল করেন। যা প্রমাণিত নয়, তা অপ্রাসঙ্গিক বলেই তিনি মনে করতেন। কোনোরকম কল্পনাভিত্তিক, অনুমানভিত্তিক ইতিহাস রচনা তার কাছে ছিল সম্পূর্ণ করিত্যজ্য। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল তথ্যের কঠোর উপস্থাপনা। এর ফলে তাঁর ইতিহাস critical বা বর্ণহীন। তিনি কোনো ভাবাবেগ বা জাতীয়তাবাদী ঝোঁককে প্রশ্রয় দিতেন না। তাঁর শেষ কথা হল, “The strict presentation of facts is the supreme law of historical writing”. অর্থাৎ একনিষ্ঠভাবে সততার সঙ্গে ঐতিহাসিক তথ্যের উপস্থাপনা করা। ঐতিহাসিক কখনও কোন ঐতিহাসিক ঘটনাক বা তথ্যের বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা করে আপন সিদ্ধান্ত পাঠকদের উপর চাপিয়ে দিতে পারেন না।

উনিশ শতকে ইতিহাসের তথ্য ও বিশ্লেষণ নিয়ে ইতিহাস রচনা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানা মত পার্থক্য দেখা দেয়। এ সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্ন কথা বললেও ঐতিহাসিক কিন্তু কখনও কোন ঘটনার বা তথ্যের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করে আপন সিদ্ধান্ত পাঠকদের উপর চাপিয়ে দিতে পারেন না।

প্রশ্ন

- ১। একজন Objectivist ঐতিহাসিকের নাম কর।
- ২। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে Objectivist দের মূল বক্তব্য কি?

১.১.১.১.৩.২ : উনিশ শতকের শেষ পর্ব ও বিশ শতকে ইতিহাসচর্চার প্রকৃতি ও বিশেষত্ব

উনিশ শতকের শেষ পর্ব ও বিশ শতকের শুরু থেকে একদল ঐতিহাসিক মূল্যায়নধর্মী, বিশ্লেষণধর্মী ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তার উপর অত্যধিক গুরুত্ব দিতে শুরু করলেন। এঁর ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ‘উপলক্ষ্যগত’ মন্যয় (Subjective) ব্যাখ্যার দিকগুলির উপর জোর

Subjectivist-দের মতে ইতিহাসের চূড়ান্ত লক্ষ্য নিছক সত্যঘটনার পরিবেশন নয়, বরং তার মূল্যায়ন ও সঠিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন দরকার।

দিতে চেয়েছেন। ইতিহাসের চূড়ান্ত লক্ষ্য নিছক ঘটনা পরিবেশন নয়, এমনকি তা শুধু সত্য ঘটনা হলেও নয়, বরং মূল্যায়ন ও ব্যাখ্যার উপস্থাপনা। এই বক্তব্যের ও ঐতিহাসিক রচনার দৃষ্টিকোণ থেকেই ইতিহাসের নতুন নতুন সংজ্ঞা, প্রকৃতি আবার ধরা পড়ল।

প্রশ্ন

১। Subjectivist-দের মূল বক্তব্য কি?

বিশ শতকের ইতিহাসচর্চার ও ইতিহাসদর্শনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, যুগবিভাজন সম্পর্কে ধারণা বা অনুভূতিবোধ। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রভৃতি যুগবিভাগগুলি সম্পর্কে সময়-সচেতনতা এবং অতীতের

যুগবিভাজন সম্পর্কে ঐতিহাসিকের লেখা পুরোপুরি অনুভূতিগত ব্যাপার। কেননা সময় সচেতনতা এবং অতীতের পুনরুদ্ধার বা পুনর্গঠন করতে গিয়ে ঐতিহাসিক গণ অনিবার্যভাবে তার সময়ের পরিবেশ ও সমস্কৃতিতে এসে পড়ে।

পুনরুদ্ধার বা পুনর্গঠন করতে গিয়ে ঐতিহাসিক যে অনিবার্যভাবে তাঁর ব্যক্তিগত রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গি, ধ্যানধারণার প্রতিফলন ঘটনা, সে সম্পর্কে অনুভূতি। নতুন শতকের গোড়ার দিকে এই ধ্যানধারণা ও ইতিহাস দর্শনের মশাল গিয়ে পৌঁছল ইতালিতে। সেখানে ইতিহাসের এই দর্শনের প্রস্তাবনা করলেন বেনেদেত্তো

ক্রোচে (Beneditto Croce)। ক্রোচে ঘোষণা করলেন, সব ইতিহাসই ‘সমসাময়িক ইতিহাস’। “All history is 'contemporary history'”। তার মানে ইতিহাস মূলত বর্তমানের চোখ দিয়ে ও তারই সমস্যার নিরিখে অতীতকে দেখা এবং ঐতিহাসিকের আসল কাজ নথিকরণ নয়, বরং মূল্যায়ন। তিনি যদি মূল্যায়ন না করেন তাহলে কোন্টা নথিবদ্ধ কররা উপযুক্ত তা তিনি জানবেন কি করে? ঐতিহাসিকের চেতনায়, ধ্যানধারণায় ও মননে অতীত পুনঃসৃষ্টি হয় এবং এই পুনঃসৃষ্টি অতীতের কথাই ঐতিহাসিক লেখেন। যেহেতু একই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হলেও একওকজন ঐতিহাসিকের মনে অতীতের পুনঃসৃজন ভিন্ন ভিন্ন, সেহেতু ইতিহাস রচনাও নানা ধরনের হতে বাধ্য। ঐতিহাসিক যেহেতু তাঁর সময়ের পরিবেশ ও সংস্কৃতির থেকে মুক্ত নন, সে কারণে অতীত সম্পর্কে তাঁর রচনার সব সময়েই একটি সমসাময়িকত্বের বা সমকালীনতার ছাপ থাকে।

প্রশ্ন

১। ক্রোচের মতে ইতিহাস কি?

বেনেদেত্তো ক্রোচের ইতিহাসের মূল্যায়নধর্মী, ব্যাখ্যানির্ভর মতবাদের জোরালো সমর্থন তাঁর সমসাময়িককালে ও পরবর্তীকালে অনেক লেখকের লেখার প্রতিফলিত হয়েছিল। নিছক তথ্যের উপস্থাপনা নয়, এর মূল্যায়ন—এই মতবাদের অন্যতম প্রথম সার্থক প্রবক্তা হিসেবে ক্রোচে অবশ্যই কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন। ১৯১০ সালে বিখ্যাত মার্কিন ঐতিহাসিক কার্ল বেকার বললেন, ‘ঐতিহাসিকের জন্য ইতিহাসের কোনো তথ্য থাকে না যতক্ষণ না তিনি তা সৃষ্টি করেন।’ (“The facts of history do not exist for any historian till he creates them”.) একইভাবে মাইকেল

কার্লবেকারের মতে ঐতিহাসিকের জন্য ইতিহাসের কোন তথ্য থাকে না তিনি তা সৃষ্টি করেন। মাইকেল ওকশট-এর মতে ইতিহাস মূলত ঐতিহাসিকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা-প্রসূত বিষয় ঐতিহাসিক ব্যতীত তা কেউই তৈরি করতে পারে না।

ওকশট (Michael Oakeshott) মত প্রকাশ করেন যে, “History is the historian's experience, it is made by nobody save the historian, to write history is the only way of making it”. অর্থাৎ ইতিহাস মূলতঃ ঐতিহাসিকের নিজস্ব অভিজ্ঞতাপ্রসূত। ঐতিহাসিক ব্যতীত কেউই একে ‘তৈরি’ করতে পারেন না এবং ইতিহাস নির্মাণ করার একমাত্র উপায় সেটি লিখে ফেলা।

ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেনে ক্রোচে যথেষ্ট গ্রাহ্য হতে শুরু করেন ১৯২০-এর পরেই। এর কারণ হিসেবে E.H. Carr বলেছেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ঐতিহাসিকদের দিকে তথ্যের কুপাদৃষ্টি বর্ষণে ১৯১৪-র আগের বছরগুলোর চেয়ে যেন কম উদারতা দেখা গেল। অতএব, যে দর্শন তথ্যের মর্যাদা ছোট করতে চাইল তার দিকেই লেখকদের ঝোঁক পড়ল বেশি। অক্সফোর্ড-এর দার্শনিক ও ঐতিহাসিক R.G. Collingwood (আর.জি. কলিংউড) এর উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়েছিল ক্রোচের। তাই ব্যাখ্যানির্ভরতা বা ব্যাখ্যা প্রবণতা ইতিহাসরচনার চূড়ান্ত প্রতিফলন ঘটে কলিংউডের অসমাপ্ত রচনাবলীতে।

‘Subjective history’ বা ‘Subjective attitude to history’ তাঁর রচনায় পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। কলিংউড দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, “History is the revival and reenactment of the past experience in the mind of the historian”

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ঐতিহাসিক তথ্যের দিকে বেশি ঝোঁক পড়ে। কারণ বৈজ্ঞানিক ইতিহাস লিখতে গেলে অতীতের সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা ও ধারণা ঐতিহাসিকের মনে জাগ্রত হওয়া প্রয়োজন। আসলে ইতিহাস মানে ঐতিহাসিকের মনে সেই চিন্তার পুনঃরূপায়ন যার ইতিহাস তিনি চর্চা করছেন।

অর্থাৎ ইতিহাস হলো ঐতিহাসিকের মননে অতীত ঘটনার বা অভিজ্ঞতার পুনরুজ্জীবন ও পুনরাভিনয়। অন্যভাবে বলতে গেলে, তাঁর মতে, ঐতিহাসিক যে অতীতের মানুষের বিবরণ রচনায় ব্রত হয়েছেন, তাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা ও ধারণা যদি ঐতিহাসিকের মনে জাগ্রত না হয় তাহলে বৈজ্ঞানিক ইতিহাস লেখা সম্ভব হতে পারেনা। এই কারণে যে সমস্ত গবেষক বা লেখক শুধুমাত্র একটি গ্রন্থ থেকে তথ্য আহরণ ও সংকলন করে তার নিজের গ্রন্থটি রচনা করে দায়িত্ব শেষ করেন, তাদের তিনি ‘ব্যর্থ’ ঐতিহাসিক বলে মনে করেন। তাঁর কাছে ‘সব ইতিহাসই চিন্তার ইতিহাস’ আর ‘ইতিহাস মানে ঐতিহাসিকের মনে সেই চিন্তার ‘পুনঃরূপায়ণ’, যার ইতিহাস তিনি চর্চা করছেন। ঐতিহাসিকের মনে অতীতের পুনর্গঠন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সাক্ষ্যপ্রমাণের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এটি স্বয়ং কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রক্রিয়া নয় এবং শুধু তথ্যের পুনরাবৃত্তি করে এটি গড়ে ওঠেনি। তার বদলে পুনর্গঠনের প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করে তথ্যের নির্বাচন ও ব্যাখ্যান। এর ফলেই সেগুলো পরিণত হয় ঐতিহাসিক তথ্যে।

প্রশ্ন

- ১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইতিহাস চর্চার কি পরিবর্তন দেখা গেল?
- ২। E.H. Carr-এর একটি বই এর নাম লেখ?
- ৩। R.G. Collingwood-এর একটি বই এর নাম লেখ। তিনি কোন গোষ্ঠীর সমর্থক?

ইতিহাসের ‘subjectivity’ মতবাদের গোষ্ঠীর সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন ঐতিহাসিক R.G. Collingwood এর মতবাদকে অতিরিক্ত দার্শনিকতার দোষে দুষ্ট বলে অভিযুক্ত করেছেন। এই ঐতিহাসিকদের মতে এর কারণ হলো, ইতিহাস নিয়ে তিনি খুব কমই লিখেছেন এবং সে অর্থে তিনি পেশাদার ঐতিহাসিকের মধ্যে পড়েন না, বরং ইতিহাস-দার্শনিক বলাই তাঁকে যুক্তিসঙ্গত হবে। ব্যাখ্যা প্রবণতার প্রতি তাঁর অতিরিক্ত গুরুত্ব

আরোপ তাঁকে একটি অবাস্তব অবস্থার দিকে নিয়ে গেছে, যেখানে বলা যায়, যত অসম্ভবই হোক না কেন, উপস্থাপিত প্রত্যেকটি ব্যাখ্যাই মূল্যের দিক থেকে সমান এবং ইতিহাসে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সত্য বলে কোনো কিছু

E.H. Carr তথ্যের চেয়ে ব্যাখ্যা ইতিহাসের মূল উপাদান মূল উপাদান হিসেবে মেনে নিলেও কতগুলি বিপদের কথাও বলেছেন। যদিও ইতিহাস একান্তভাবে ও অনিবার্য ভাবেই ব্যক্তিগত ব্যাখ্যানির্ভর ও তথ্যবিশ্লেষণের ব্যাপারে, তথাপি ঐতিহাসিককে সব তথ্যের উপর মনোযোগ না দিয়ে তথ্য নির্বাচন করেনিতে হয়। তা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা বা সততার মাধ্যমে তথ্যসংগ্রহের আদর্শকে কোন ভাবেই পরিত্যাগ করা যায় না। আসলে ঐতিহাসিক ও ইতিহাসের তথ্য দুয়েরই দরকার দুটিকেই। তথ্য ছাড়া ঐতিহাসিক অসহায় ও ব্যর্থ আবার ঐতিহাসিক ছাড়া তথ্যেরাও মৃত ও অর্থহীন।

থাকতে পারেনা। এই বিশ্বাস বা যুক্তি প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের সত্য নিরূপণের জন্য ঐতিহাসিকদের সমস্ত প্রচেষ্টার যথার্থ্যকেই বাতিল করে দেয়।

এর বিরোধিতার সুর লক্ষ্য করা গেছে E.H.Carr (ই. এইচ. কার) এর মন্তব্য। তিনি তথ্যের চেয়ে ব্যাখ্যাকে ইতিহাসের মূল উপাদান হিসেবে মেনে নিলেও কতকগুলি বিপদের কথাও বলেছেন। যদিও ইতিহাস একান্তভাবেই ও অনিবার্যভাবেই ব্যক্তিগত ব্যাখ্যানির্ভর এবং তথ্য বিশ্লেষণের ব্যাপারে ঐতিহাসিককে সব তথ্যের উপর মনোযোগ না দিয়ে তথ্য নির্বাচন করে নিতে হয়, তা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা

বা সততার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের আদর্শকে কোনোভাবেই পরিত্যাগ করা যায় না। সুতরাং এই প্রেক্ষাপটে what is history? বা ইতিহাস কাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কার নিজস্ব অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন। সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্য দেওয়া হলো। কার-এর মতে, মানুষ কখনোই পরিবেশ থেকে পুরোপুরি স্বাধীন থাকে না ও তার নিঃশর্ত প্রভুও হয় না। মানুষের সঙ্গে তার পরিবেশের সম্পর্ক—ঐতিহাসিকের সঙ্গে তার বিষয়ের সম্পর্ক। ঐতিহাসিক তাঁর তথ্যের বিনীত দাস বা অত্যাচারী প্রভু—কোনোটাই নন। ঐতিহাসিকের সঙ্গে তাঁর তথ্যের সম্পর্ক—সমতার সম্পর্ক, লেনদেনের সম্পর্ক। যে কোনো গবেষণারত ঐতিহাসিক যেমন জানেন, তিনি যখন চিন্তা করেন ও লেখেন তখন যদি কী করছেন তা ভাবার জন্য থামেন, তাহলে ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে ব্যাখ্যান ও ব্যাখ্যানের সঙ্গে তথ্যকে গড়ে-পিটে নেওয়ার একটি নিরন্তর প্রক্রিয়ায় তিনি নিযুক্ত থাকেন। এটা আগে, ওটা পরে— এমন ঠিক করে দেওয়া সম্ভব নয়। ঐতিহাসিকের কাজ আরম্ভ হয় বিভিন্ন তথ্যের তখনকার মতো বাছাই করা দিয়ে, আর তখনকার মতো একটা ব্যাখ্যান যার সাহায্যে ঐ বাছাই করা হয়েছে—অন্যরা এবং তিনি নিজেও যা বাছাই করেছেন তাই দিয়ে। তিনি যখন কাজ করতে থাকেন তখন বাছাই ও বিন্যাস—এই দুয়েরই সূক্ষ্ম ও বোধহয় আংশিকভাবে অচেতন পরিবর্তন ঘটে। এই পারস্পরিক ক্রিয়ার সঙ্গে বর্তমান ও অতীতের মধ্যকার পরস্পর সম্বন্ধও জড়িয়ে থাকে, কারণ ঐতিহাসিক হচ্ছেন বর্তমানের অংশ আর তথ্যগুলো অতীতের। ঐতিহাসিক ও ইতিহাসের তথ্য— দুয়েরই দরকার দুটিকেই। তথ্য ছাড়া ঐতিহাসিক অসহায় ও ব্যর্থ। ঐতিহাসিক ছাড়া তথ্যেরাও মৃত ও অর্থহীন। অতএব ‘কাকে বলে ইতিহাস’? এই প্রশ্নে ঐতিহাসিক কার বলেন “It is a continuous process of interaction between the historian and his facts, an unending dialogue between the past and the present” অর্থাৎ ইতিহাস হলো ঐতিহাসিক ও তার সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে এক অন্তর্নিহিত দেওয়া নেওয়া বা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার প্রক্রিয়া এবং অতীত ও বর্তমানের মধ্যে এক নিরবচ্ছিন্ন সংলাপ। এই সব কারণেই একই শ্রেণীর তথ্য একাধিক ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করলেও তাঁদের উপনীত সিদ্ধান্তের মধ্যে এতো পার্থক্য দেখা যায়। আর এটিই হলো ইতিহাসের প্রকৃত আকর্ষণ।

প্রশ্ন

১। What is History-তে Carr-এর মূল বক্তব্য কি?

১.১.১.১.৪ : উপসংহার

আগাথা ক্রিস্টি তাঁর ‘The moving finger’ নামক রহস্যোপন্যাসে দেখিয়েছেন—একটি ছোট মেয়ে স্কুলের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে বলছে, “এত রকমের বাজে জিনিসও শেখানো হয়। ধর— ইতিহাস। প্রত্যেক বইতে আলাদা বর্ণনা।” উত্তরে প্রবীণ অভিভাবক বলেছিলেন “That is its real interest” এখানেই ইতিহাসের বিশেষত্ব। এর স্বরূপ, লক্ষ্য, আদর্শ দ্রুত পরিবর্তনশীল ও দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। “It is a movement in time”. সময়সীমার মধ্যে ইতিহাস একটি আন্দোলন। এ আন্দোলন থেমে নেই, এ নিয়ত প্রবহমান ও গতিশীল। এই গতিশীলতাই ইতিহাসের প্রাণ। ইতিহাসে ধারাবাহিকতা আছে এবং ঐতিহাসিক ও গবেষকের কর্তব্য হলো ইতিহাসে প্রবহমানতা, পরিবর্তন এবং স্থিতিশীলতা লক্ষ্য করা অর্থাৎ রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি প্রভৃতির রূপ ও প্রতিষ্ঠান যেমন পরিবর্তিত হয়, তেমনি এদের মধ্যে কিছু কিছু অস্তিত্ব বজায় রাখে, আবার কিছু কিছু বিলীন হয়ে যায়।

তবে ইতিহাসে কল্পনার কোনো স্থান নেই, নেই কবির মতো ভাবাবেগের স্থান, ইতিহাস নির্মোহ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সত্যকেই প্রকাশ করে। ইতিহাস বিজ্ঞানের মতই প্রশ্ন করে কি? কেন? এবং কিভাবে? ইত্যাদি। তারপর যুক্তি, বোধ, বাস্তবতার প্রয়োগে রচিত হয় ইতিহাস।

আধুনিক সমাজবিজ্ঞানী ও প্রগতিশীল চিন্তাবিদগণ ইতিহাসের অগ্রগতি বা প্রক্রিয়াকে বিভিন্ন যুগে মানবসমাজের বিবর্তনের মাপকাঠিতে বিচার করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতে, ইতিহাস একটি লিপিবদ্ধ বিবরণী যাতে মানুষের জীবন বা সমাজের কাহিনী থাকবে। যে সব পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সেই সমাজ অতিক্রম করে বিবর্তিত হয়েছে সেই পরিবর্তনের কথা থাকবে, যে সব চিন্তা বা আদর্শ মানুষের ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রিত বা প্রভাবিত করেছে তার বিবরণ থাকবে এবং সকলের শেষে যে বাস্তব প্রেক্ষাপট বা অবস্থা সেই মানুষের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছে বা বাধা দিয়েছে তার বিবরণও থাকবে। ইতিহাস বলতে বোঝায় ‘total history’ বা সামগ্রিক ইতিহাস। এতে মানুষের সার্বিক ক্রিয়াকলাপ ও তার সমাজের পরিবর্তনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইতিহাসের বিষয়বস্তু হিসেবে এবং মানব সমাজ ও সভ্যতার অধ্যয়নের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে এসেছে সংস্কৃতির (culture) কথা। ইতিহাসের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক নিবিড়। সংস্কৃতি হল মানুষের সেই সব বস্তুগত এবং বৌদ্ধিক ক্রিয়াকলাপের সমষ্টিগত ফলাফল; যার মাধ্যমে সে তার জৈবিক ও সামাজিক জীবনের প্রয়োজনগুলি মেটাতে পারে।

১.১.১.১.৫ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

- ১। What is history—E. H. Carr
কাকে বলে ইতিহাস?—(বঙ্গানুবাদ—স্নেহোৎপল দত্ত ও সৌমিত্র পালিত)
- ২। Mare Bloch—The Historian’s Craft
- ৩। R. G. Collingwood—The Idea of History

- ৪। অমলেশ ত্রিপাঠী—ইতিহাস ও ঐতিহাসিক
 ৫। সুশোভন সরকার, (ক) প্রসঙ্গ ইতিহাস
 (খ) ইতিহাসের ধারা
 ৬। মমতাজুর রহমান তরফদার—ইতিহাস ও ঐতিহাসিক।
 ৭। সুকান্ত পাল—ইতিহাস ও ইতিহাস দর্শন।
 ৮। লাডলীমোহন রায়চৌধুরী—ইতিহাস নানাবিধ।

১.১.১.১.৬ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

- ১। ইতিহাসের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি নিরূপণ করো। এক্ষেত্রে নানা সমস্যা ও জটিলতার কারণগুলি উল্লেখ করো।
 ২। উনিশ ও বিশ শতকের ঐতিহাসিকগণ ইতিহাসের স্বরূপ ও সীমা কিভাবে দেখাতে চেষ্টা করেছেন?
 ৩। “Historical objectivity” বলতে কি বোঝায়? ইতিহাসকে ‘objective’ করতে হলে কোন পথে বা উপায়ে করা যেতে পারে?
 ৪। বিংশ শতকে মূল্যায়নধর্মী ইতিহাসের উদ্ভব ও গুরুত্ব বিচার করো।
 ৫। ঐতিহাসিকদের প্রধান সংজ্ঞার ভিত্তিতে ইতিহাসের প্রকৃতি ও বিশেষত্ব আলোচনা করো।
 ৬। “To define history definitely or accurately is a preposterous proposition”— তুমি কি একমত?

উপ-একক - ২

Debate among historians about the relative importance of facts and interpretations in History

১.১.১.২.০ : উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন :

- (১) ইতিহাসের তথ্য ও বিশ্লেষণের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক
- (২) 'objective' ইতিহাসের গুরুত্ব
- (৩) 'subjective' ইতিহাসের গুরুত্ব
- (৪) আধুনিককালে ইতিহাসচর্চা কিভাবে করা যুক্তিযুক্ত।

১.১.১.২.১ : ইতিহাসের তথ্য ও বিশ্লেষণের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক

উনিশ শতকের শেষ পর্বে এবং বিশ শতকে একটি প্রশ্ন খুব স্বাভাবিকভাবেই ইতিহাস রচয়িতাদের কাছে এসে পড়েছিল। প্রশ্নটা হলো, ইতিহাসের পুনর্বিচারের ক্ষেত্রে ঘটনাগত সত্যতা রক্ষা ছাড়া ঐতিহাসিকের আরও কিছু মহান দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি? বিশ শতকের শুরু থেকে একদল ঐতিহাসিক মনে করতে থাকেন যে, ইতিহাসের চূড়ান্ত লক্ষ্য নিছক ঘটনা পরিবেশন নয়, এমনকি তা শুধু সত্য ঘটনা হলেও নয়, বরং এর সঙ্গে প্রয়োজন ঘটনার মূল্যায়ন, বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা। এই

বিশ শতকের শুরু থেকে ইতিহাস লেখার পদ্ধতি নিয়ে ঐতিহাসিক বিতর্ক দেখা দেয়। ইতিহাসের চূড়ান্ত লক্ষ্য নিছক ঘটনা পরিবেশন নয় বরং এর সঙ্গে প্রয়োজন ঘটনার মূল্যায়ন, বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা। তার সাথে ঐতিহাসিককে হতে হবে নিরপেক্ষ ও সৎ।

চিন্তাধারা ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করল। ইতিহাস রচনার পদ্ধতি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে দেখা দিল বিতর্ক। বিতর্কের বিষয় : ইতিহাস লেখার পদ্ধতি। প্রখ্যাত জার্মান ঐতিহাসিক র্যাঙ্কে এবং তাঁর সমর্থকগোষ্ঠীর ঐতিহাসিকগণ বললেন, ইতিহাস কেবল তথ্য দিয়েই তার কাজ শেষ করবে। মূলতঃ তথ্যের উপস্থাপনাই ঐতিহাসিকদের প্রধান কাজ। তবে এই তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিককে হতে হবে নিরপেক্ষ ও সৎ। নির্মোহ, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তিনি তথ্য সংগ্রহ করবেন, যা হবে এক পরীক্ষিত সত্য। এই মতামতকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বেনেদেত্তো ক্রোচে এবং তার প্রবল সমর্থকগোষ্ঠীয় ঐতিহাসিকগণ বললেন, ঐতিহাসিক শুধু তথ্য উপস্থাপন করেই তার কাজ শেষ করবে না, তথ্যের বিচার-বিশ্লেষণও তার অন্যতম প্রধান কাজ।

প্রশ্ন

- ১। বিশ শতকে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন দেখা যায়?
- ২। ইতিহাস রচনার সময় ঐতিহাসিককে কি রকম হওয়া প্রয়োজন?

উনিশ শতকের প্রায় গোটা সময়টাই ইতিহাসচর্চা র্যাঙ্কের পথ ধরেই চলেছিল। তথ্যের দিক থেকে উনিশ শতক ছিল এক মহান যুগ। ‘কঠিন সময়’ (হার্ড টাইমস) উপন্যাসে প্র্যাডগ্রিগু বলেছিলেন, ‘আমি যা চাই তা হলো

উনিশ শতকের ইতিহাস ছিল তথ্যের দিক থেকে এক মহান যুগ। এই সময় র্যাঙ্কের মতে ঐতিহাসিকের প্রধান কাজ ছিল ‘Strict presentation of fact’ অর্থাৎ একনিষ্ঠা সততার সঙ্গে ঐতিহাসিক তথ্যের উপস্থাপনা করা। বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার পাঠকদের ঐতিহাসিকদের নয়।

তথ্য। জীবনে শুধু তথ্যই চাই। উনিশ শতকের ঐতিহাসিকরা মোটের উপর তাঁর সঙ্গে একমত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে র্যাঙ্কে মস্তব্য করেন, ঐতিহাসিকের কর্তব্য হলো, ‘আসলে কি রকম ছিল ঠিক তা-ই দেখানো।’ উনিশ শতকে এই বীজমন্ত্রই অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছিল। এর ফলে ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে বস্তুগত বা বিষয়গত (objective) দিকের উপর বিশেষ

জোর দেওয়া হল। এই ‘objective history’-এর সার্থক প্রবক্তা র্যাঙ্কের মতে ঐতিহাসিকদের প্রধান কাজ হল ‘strict presentation of facts’ অর্থাৎ একনিষ্ঠভাবে সততার সঙ্গে ঐতিহাসিক তথ্যের উপস্থাপনা করা। ইতিহাস রচনায় তথ্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ ইতিহাসে কল্পনার বা আবেগের কোনো স্থান নেই। ঐতিহাসিক কেবলমাত্র সঠিক তথ্য থেকে সংগৃহীত সত্য ঘটনাবলী পাঠকদের কাছে তুলে ধরবেন। বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার পাঠকদের, ঐতিহাসিকদের নয়।

প্রশ্ন

১। ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে ‘Strict Presentation of fact’ কি?

ঐতিহাসিক বিউরীও (Bury) প্রায় এরই প্রতিধ্বনি করেছেন। তাঁর মতে, “History is a Science, no less and no more” অর্থাৎ “ইতিহাস একটি বিজ্ঞান, এর বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম নয়।” ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে লিখতে হবে, কিন্তু তা কখনও সীমা লঙ্ঘন করে যাবে না। সুতরাং তথ্য উপস্থাপনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর হতে হবে। ঐতিহাসিক তথ্যের বিশ্লেষণের বিরুদ্ধবাদীরা মনে করেন, বিশ্লেষণ বা মূল্যায়ন করতে গেলেই ঐতিহাসিক তাঁর সীমা লঙ্ঘন করবেন, কখনও বেশি বলবেন, কখনও কম বলবেন। সেক্ষেত্রে ঐতিহাসিক তথ্যের বিকৃতি এবং ঐতিহাসের সৌন্দর্য নষ্ট হতে পারে।

বিশ্লেষণধর্মী বা ব্যাখ্যা নিভর ইতিহাসচর্চার বিরুদ্ধবাদী ঐতিহাসিকেরা এ ধরনের ইতিহাসচর্চার আরও নানা বিপদের কথা বলেছেন। তাঁদের মতে, তথ্যের বিশ্লেষণ শুরু হলে, তা কেবলমাত্র একটি ব্যাখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। বিভিন্ন ঐতিহাসিকের চোখে একই ঘটনা নানাভাবে ধরা পড়বে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক একই ঘটনার নানা ব্যাখ্যা দিতে শুরু করবেন। এর ফলে বিভিন্ন মতাদর্শ গোষ্ঠীর বক্তব্যে তার নিজস্ব মতাদর্শ বড় হয়ে দিতে পারে। এর ফলে ঐতিহাসিকের প্রয়োজনীয় নিরপেক্ষতা, সততা, নির্মোহ ও নৈব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইতিহাস রচনার স্বচ্ছতা থাকবে না।

বিউরীর মতে ইতিহাস একটি বিজ্ঞান। তবে ইতিহাস লেখার সময় তার সীমালঙ্ঘন না করে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ইতিহাস রচনা করা প্রয়োজন। তা না হলে ইতিহাসের নিরপেক্ষতা, সততা ও স্বচ্ছতা থাকবে না।

প্রশ্ন

১। History is a science, no less and no more এটি কার উক্তি ও এর অর্থ কি?

দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, আধুনিক ভারতের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতাদর্শ গোষ্ঠী ইতিহাসচর্চায় গোষ্ঠীগত মতাদর্শকেই বিশেষ প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে একই ঘটনাকে ব্রিটিশ ও ভারতীয় ঐতিহাসিকরা ভিন্ন চোখে বিচার-বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছেন। এর ফলে ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে নানা অসঙ্গতি ও অর্ধসত্য ধরা পড়েছে। খণ্ডিত ইতিহাসচর্চার রূপটিও ধরা পড়েছে। একইভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য কে দায়ী এই প্রশ্নে ঐতিহাসিকেরা নানাভাবে বিভক্ত। কেউ জার্মানিকে দায়ী করেছেন, কেউ রাশিয়াকে, কেউ আমেরিকাকে, আবার কোনো কোনো ঐতিহাসিক ইঙ্গ-ফ্রান্স তোষণ নীতিকেই এর জন্য দায়ী বলে মতামত দিয়েছেন। এর কারণ হল, ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করার সময় ঐতিহাসিকেরা তার দেশ, দেশপ্রেম, তার মানসিকতাকে বিসর্জন দিতে পারেন না। এর ফলেই ঐতিহাসিক তথ্যের বিকৃতি বা ভুল-ভ্রান্তি নজরে পড়ে। এইসব কারণেই বিশ্লেষণ বিরোধী ঐতিহাসিকগণ এই বিপদের কথা ভেবে শুধু তথ্যের উপস্থাপনা করেই নিজেদের কাজ শেষ করেছেন। তাঁদের মতে, একমাত্র ‘objective’ দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাস রচনাই এইসব বিভ্রান্তি বা বিকৃতি দূর করতে পারে।

আধুনিককালে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে একটা গোষ্ঠীগত মতাদর্শ বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে। এর ফলে একই ঘটনা বিভিন্ন গোষ্ঠীর চোখে ভিন্ন ভিন্ন দেখাচ্ছে। এ কারণে বিশ্লেষণ বিরোধী ঐতিহাসিকরা শুধু তথ্যের উপস্থাপনা করে নিজেদের কাজ শেষ করেছেন।

প্রশ্ন

১। আধুনিক ভারতের ইতিহাস রচনার বিভিন্ন গোষ্ঠীগত মতাদর্শটি কি?

অন্যদিকে লর্ড অ্যাক্টন (Lord Acton) প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা বিশ্লেষণধর্মী বা ব্যাখ্যানির্ভর ইতিহাসচর্চার দিকটিকে জোরালো সমর্থন করেছেন। এঁরা ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ‘উপলক্ষ্যগত’ (subjective) দিকগুলির উপর জোর দিতে চেয়েছেন। তাঁদের মতে ঐতিহাসিক তথ্যের সঠিক ব্যাখ্যা না করলে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর গভীরের রহস্য উন্মোচিত হতে পারে না। এই বিতর্কের সূত্র ধরে ‘value judgement’ কথাটি প্রযুক্ত হতে থাকে। অর্থাৎ

Subjectivist তথা Lord Acton-এর মত ঐতিহাসিকেরা বিশ্লেষণধর্মী বা ব্যাখ্যানির্ভর ইতিহাস চর্চার দিকটিকে জোরালো সমর্থন করেছেন। এদের মতে ঐতিহাসিক তথ্যের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন ছাড়া ইতিহাস চর্চা অর্থহীন ও আকর্ষণহীন। ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অবদান হল মানুষের সুস্থির চেতনার জাগরণ ঘটানো।

বিতর্কটি এই ধরনের রূপ গ্রহণ করে যে, ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তথ্যের ‘value judgement’ বা মূল্যায়নের প্রয়োজন আছে কি না? লর্ড অ্যাক্টন প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, ঐতিহাসিক তথ্যের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন ছাড়া ইতিহাসচর্চা অর্থহীন ও আকর্ষণহীন। অ্যাক্টনের মতে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অবদান হল মানুষের মধ্যে সুস্থির

চেতনার জাগরণ ঘটানো। তথ্যের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমেই তা একমাত্র করা সম্ভব। এই দৃষ্টিভঙ্গির ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে ইতিহাসকে ‘নীরস শুষ্ক কাষ্ঠ’ থেকে রেহাই দিতে হবে ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন ছাড়া কোনো পথ নেই। তবে তারা এটাও মনে করেন যে, তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিককে সততা, নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে। ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণ করে আসল সত্য মানুষের সামনে উপস্থাপিত করার মহান দায়িত্ব ও নৈতিক কর্তব্য ঐতিহাসিকদের। ঐতিহাসিককে সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হলে তাদের তথ্য বিশ্লেষণ করার সুযোগ দিতে হবে বলে বিশ্লেষণধর্মী ঐতিহাসিকরা মনে করেন। এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন

জগৎ বিখ্যাত গ্রীক ঐতিহাসিক থুডিডিডিস। তিনি বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে বিশ্লেষণ ও নৈতিকতার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি। তথ্য উপস্থাপনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি সমাজকে নৈতিকতার পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করেছিলেন।

প্রশ্ন

১। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ‘Value judgement’ কথাটির অর্থ কি?

উনিশ শতকে ইউরোপে দৃষ্টিবাদী বা Positivist ঐতিহাসিকেরা আরও এক ধাপ এগিয়ে ইতিহাসকে বিজ্ঞানের সমতুল্য বলে ঘোষণা করেন। কোং, বার্কলে প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা ইতিহাসের তথ্য বিশ্লেষণ করে তার থেকে কতকগুলি সাধারণ সূত্র বের করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে ইতিহাস ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। কেউ কেউ আবার বলেন, “History is social physics” অর্থাৎ তাদের বক্তব্য হল, বিজ্ঞান যেমন কতকগুলি সূত্র অনুযায়ী চলে এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন সূত্র দিয়ে যেমন বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়কে ব্যাখ্যা করা যায়, তেমনি ইতিহাসেরও সূত্র বা নিয়মাবলী রয়েছে। ইতিহাসের নিয়মবিদ্যা বা সূত্র নির্ণয় করে তা দিয়ে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করা যায় এবং রাষ্ট্র ও সমাজকে সঠিক পথে চালিত করা যায়। অতএব ঐতিহাসিক তথ্যের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমেই ঐতিহাসিক সূত্র খুঁজে পাওয়া সম্ভব এবং তা রাষ্ট্র ও সমাজের নানা উপকার সাধন করতে পারে।

Positivist বা দৃষ্টিবাদীদের মতে ইতিহাস হল বিজ্ঞানের সমতুল্য ‘History is social physics’ বিজ্ঞানের ন্যায় ইতিহাসও কতগুলি সূত্র বা নিয়মাবলী মেনে চলে যে নিয়মবিদ্যা রাষ্ট্র ও সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

প্রশ্ন

১। ইতিহাস চর্চায় Positivist ঐতিহাসিকদের যুক্তি কি?

বিশ্লেষণধর্মী ইতিহাসচর্চার প্রবক্তারা মনে করেন যে একমাত্র তথ্যের বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা বা মূল্যায়নের ফলেই কোনো তথ্যের গুরুত্ব ও নানা দিক উন্মোচিত হতে পারে। কোনো বিদ্রোহ বা বিপ্লবের বিবরণ দিলেই ঐতিহাসিকের দায়িত্ব শেষ হয় না। এই বিবরণ পাঠক সমাজের কাছে অনেক প্রশ্ন জাগাতে পারে। কারণ বিপ্লব বা বিদ্রোহের

বিশ্লেষণধর্মী ইতিহাস চর্চার প্রবক্তাদের মতে কোন বিদ্রোহ বা বিপ্লবের বিবরণ দিয়েই ঐতিহাসিকের কাজ শেষ নয়। ঐতিহাসিকের প্রধান কাজ হল বিপ্লব বা বিদ্রোহ সম্পর্কে পাঠকের মনে জাগ্রত নানা কৌতূহল দূর করা। একমাত্র তথ্যের বিশ্লেষণ বা গভীর অনুসন্ধানের ফলেই তা দূর করা সম্ভব।

কারণ, প্রকৃতি সম্বন্ধে পাঠকের মনে নানা কৌতূহল সৃষ্টি হতে পারে। ঐতিহাসিকের কাজ পাঠক সমাজের সেই কৌতূহল দূর করা। কোনো ঘটনা বা বিদ্রোহ ঠিক কি কারণে ঘটেছিল তা সবার জানা দরকার। ঐতিহাসিকই কেবলমাত্র কারণের গভীরে প্রবেশ করে অন্তর্নিহিত কারণগুলি খুঁজে বের করতে পারেন। এই কারণগুলি জানতে পারাই পাঠক সমাজের কাছে ইতিহাসের

আকর্ষণ দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। যেমন দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যেতে পারে, বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পেছনে একসময়ে ঐতিহাসিকেরা সামরিক ও রাজনৈতিক কারণকে বড়ো করে দেখিয়েছিলেন। কিন্তু সাম্প্রতিক ইতিহাসচর্চায়

আরও অনেক কারণ খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ আধুনিক ঐতিহাসিকদের ইতিহাসচর্চায় বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। একমাত্র তথ্য বিশ্লেষণের ফলেই এবং গভীর অনুসন্ধানের ফলেই তা আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। আরও একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ৭১২ খ্রিস্টাব্দে সিন্দুদেশের রাজা দাহির আরবীয় মুসলমানদের হাতে পরাস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু কি কারণে পরাস্ত হয়েছিলেন? সাধারণভাবে জানা যায় মুসলমানদের সামরিক শক্তির তুলনায় তাঁর সামরিক শক্তি দুর্বল ছিল বলে তার পরাজয় ঘটে। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকরা তথ্য বিশ্লেষণ করে জানতে পেরেছেন যে সামাজিক দিক থেকে রাজা দাহিরের পূর্বেই পতন ঘটেছিল। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বৌদ্ধদের একটা সংঘাত সবসময়েই ছিল। রাজা দাহির ব্রাহ্মণ ছিলেন বলে সিন্দু দেশের বৌদ্ধরা রাজার প্রতি তাদের সমর্থন তুলে নিয়েছিল। রাজা দাহিরের পরাজয়ের এই সামাজিক ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব হয়েছে তথ্য বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমেই।

প্রশ্ন

১। বিশ্লেষণধর্মী ইতিহাস চর্চার প্রবক্তারা ইতিহাস ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কোন বিষয়ের উপর জোর দেন?

ঐতিহাসিক কার (Carr)-এর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল এই যে, কেউ যদি সত্যিই ঐতিহাসিক হন তাহলে তাঁর ক্ষেত্রে, যে দুটি প্রক্রিয়াকে অর্থনীতিবিদরা ‘প্রদান’ ও ‘প্রতিদান’ বলেন সে দুটি একসঙ্গে চলতে থাকে এবং আসলে তারা একই প্রক্রিয়ার দুটি অংশ। আর কেউ যদি তাদের আলাদা করতে চেষ্টা করেন এবং আরেকটিকে অন্যটির চেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন, তাহলে সেই ঐতিহাসিক দুটি বিপ্রবণতার একটিতে পড়ে থাকেন। হয়, তিনি অর্থহীন, তাৎপর্যহীন ‘কাঁচি ও আঠা’ মার্কা ইতিহাস লিখবেন, নইলে লিখবেন প্রচার-কাহিনী বা ঐতিহাসিক উপন্যাস। তিনি আরও বলেন, এর ফলে অতীতের তথ্যকে শুধু একধরনের লেখায় নকশা করার কাজে ব্যবহার করা হবে, যার সঙ্গে ইতিহাসের কোনো সম্পর্ক নেই। তাঁর মতে, ঐতিহাসিকের সঙ্গে তাঁর তথ্যের সম্পর্ক— সমতার সম্পর্ক, লেনদেনের সম্পর্ক। যে কোনো গবেষণারত ঐতিহাসিক যেমন আছেন, তিনি যখন চিন্তা করেন ও লেখেন তখন যদি কি করছেন তা ভাবার জন্য থামেন, তাহলে ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে ব্যাখ্যা ও ব্যাখ্যার সঙ্গে তথ্যকে গড়ে-পিঠে নেওয়ার একটি নিরন্তর প্রক্রিয়ায় তিনি নিযুক্ত থাকেন। এটা আগে, ওটা পরে— এমন ঠিক করে দেওয়া সম্ভব নয়। ঐতিহাসিক ও ইতিহাসের তথ্য—দু-এরই দরকার দুটিকেই। তথ্য ছাড়া ঐতিহাসিক চলতে পারেন না, তিনি ব্যর্থ হবেন। আবার ঐতিহাসিক ছাড়া তথ্যেরা মৃত ও অর্থহীন।

অর্থনীতিবিদরা যেমন দুটি প্রক্রিয়াকে অর্থাৎ ‘প্রদান’ ও ‘প্রতিদান’-কে একসাথে চলার কথা বলেন। ঐতিহাসিক তেমনি ঐতিহাসিক ও ইতিহাসের তথ্যের এই দুয়ের কথা বলেন। কারণ তথ্য ছাড়া ঐতিহাসিক আবার ঐতিহাসিক ছাড়া তথ্যেরাও মৃত ও অর্থহীন।

প্রশ্ন

১। ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ও তথ্যের গুরুত্ব কতখানি?

১.১.১.২.২ : উপসংহার

অতএব কার (Carr)-এর বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে, তথ্যকে আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত করার জন্য ঐতিহাসিকের প্রয়োজন হয়েছে। আবার একইসঙ্গে তথ্য ছাড়া ঐতিহাসিক তার কাজে ব্যর্থ হবেন। তাই বিশ্লেষণপন্থী ও বিশ্লেষণবিরোধী ঐতিহাসিকদের বিতর্কের জের টেনে বলা যায়, উভয় পক্ষের বক্তব্যের মধ্যে যুক্তি থাকলেও কতকগুলি বিষয়ে উভয়েরই সতর্ক থাকা প্রয়োজন। সত্য ঐতিহাসিক তথ্য উপস্থাপনার ক্ষেত্রে যেমন এই মতের প্রবক্তাদের বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক তেমনি নীরস তথ্য পর পর উপস্থাপনা ইতিহাসের আকর্ষণ ও ঐতিহাসিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য কমিয়ে দেবে। আবার বিশ্লেষণপন্থী ঐতিহাসিকদেরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। ঐতিহাসিক তাঁর নিজস্ব মতাদর্শ, চিন্তাধারা ও বিশ্বাস তথ্য বিশ্লেষণের সময় জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে প্রাপ্ত তথ্যের বিকৃতি ঘটানোর যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। তাঁর বিশ্বাস, মতাদর্শের ঝাঁক অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর রচনায় প্রতিফলিত হওয়ার প্রবণতা থাকবে। এই আশঙ্কার কথাই বিশ্লেষণ বিরোধী ঐতিহাসিকেরা জোরের সঙ্গে বলে থাকেন এবং তাদের বক্তব্যকে অস্বীকার করা যায় না। সব সত্ত্বেও বলা যায়, উভয় পক্ষের বক্তব্যের মধ্যেই সত্যতা আছে। আবার দুপক্ষেরই নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে যথেষ্ট সতর্ক ও সততা, নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে। নির্মোহ ও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাসচর্চা করতে হবে। তা না হলে কোনো ঐতিহাসিক ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করে দেখানো হবে, আর হয়তো বা কোনো ঐতিহাসিক সত্যকে লঘু করে দেখাবার ঝাঁক দেখা দিবে। অতএব ঐতিহাসিক যে পক্ষেরই হোক না কেন, তাঁকে ঐতিহাসিক সত্য উপস্থাপনার ক্ষেত্রে পাঠক সমাজের কাছে দায়বদ্ধ থাকতে হবে। তবে আধুনিক যুগে ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণই বিশেষ প্রাধান্য পাচ্ছে। একইসঙ্গে ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে নানা মতাদর্শের ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর উদ্ভবের ফলে অনেক ক্ষেত্রে তথ্যের বিকৃতি ঘটছে। ঐতিহাসিক তাঁর নিজস্ব মতাদর্শ; বিশ্বাস, ধ্যানধারণা বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের সময় চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। এর ফলে সেই ইতিহাসের তথ্যে বিকৃতি ধরা পড়ছে, ইতিহাসচর্চা হচ্ছে খণ্ডিত ও অর্ধসত্য। ইতিহাসের এই বিপদ সম্পর্কে সমগ্র ঐতিহাসিক সমাজকে সতর্ক থাকতে হবে।

১.১.১.২.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

- ১। ইতিহাস ও ঐতিহাসিক — অমলেশ ত্রিপাঠী
- ২। প্রসঙ্গ ইতিহাস — সুশোভনচন্দ্র সরকার
- ৩। ইতিহাসের ধারা — সুশোভনচন্দ্র সরকার
- ৪। ইতিহাস নানাবিধ — লাডলীমোহন রায়চৌধুরী
- ৫। What is History? — E. H. Carr
বঙ্গানুবাদ : কাকে বলে ইতিহাস — অনুবাদক : স্নেহোৎপল দত্ত ও সৌমিত্র দত্ত
- ৬। ইতিহাস ও ইতিহাসদর্শন — সুকান্ত পাল

- ৭। P. Geyl — Debates with Historians.
- ৮। G. R. Elton — The Practice of History
- ৯। P.L. Gardiner — The Philosophy of History

১.১.১.২.৪ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

- ১। তথ্য ও বিশ্লেষণের আপেক্ষিক গুরুত্ব আলোচনা করো।
 - ২। ইতিহাসের তথ্য ও বিশ্লেষণ সম্পর্কে যে ঐতিহাসিক বিতর্ক হয়েছে তা আলোচনা করো। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তুমি কোনটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করো?
 - ৩। ইতিহাসের তথ্য ও বিশ্লেষণ কয়েকজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিকের বক্তব্য আলোচনা করো।
 - ৪। আধুনিককালে বিশ্লেষণধর্মী ইতিহাসচর্চার গুণাগুণ বিচার করো।
-

একক ২

Collection and Selection of Data : Evidence and its Transmission

বিন্যাসক্রম :

- ১.১.২.০ : উদ্দেশ্য
- ১.১.২.১ : সূচনা
- ১.১.২.২ : ইতিহাসের তথ্যসংগ্রহ ও নির্বাচন
- ১.১.২.৩ : প্রামাণ্য তথ্য ও লিখন পদ্ধতি
- ১.১.২.৪ : উপসংহার
- ১.১.২.৫ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী
- ১.১.২.৬ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১.১.২.০ : উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন :

- (১) ঐতিহাসিক তথ্য বলতে কি বোঝায়
- (২) তথ্যের উৎসসমূহ ও নির্বাচন পদ্ধতি
- (৩) তথ্যের লেখার নিয়মবিদ্যা — গ্রহণ ও বর্জন নীতি
- (৪) বিজ্ঞানসন্মত ইতিহাস রচনার দৃষ্টিভঙ্গি ও গুরুত্ব।

১.১.২.১ : সূচনা

জ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো ইতিহাসচর্চার নিজস্ব গবেষণা ও লিখন পদ্ধতি আছে। সাধারণভাবে বলা হয় সাক্ষ্য বা প্রামাণিক তথ্যের বিচার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার ঐতিহাসিক ইতিহাস রচনা করেন। তবে তথ্যের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণজনিত জটিলতার নিরিখে ঐতিহাসিকগণ যথোপযোগী ইতিহাস লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন। বিজ্ঞানসন্মত ইতিহাস রচনার লক্ষ্যে সকলকে এ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়।

১.১.২.২ : ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ ও নির্বাচন

একজন ঐতিহাসিক কিভাবে ইতিহাস লেখার কাজে অগ্রসর হবেন সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। সচরাচর দেখা যায় ঐতিহাসিক তাঁর কাজকে সরাসরি দুই পর্যায় ভাগ করে নেন। প্রথম পর্যায়ে তিনি গবেষণাধীন বিষয় সংক্রান্ত যাবতীয় পাঠে নিজেকে নিয়োজিত করেন এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী স্বীয় নোটখাতায় লিপিবদ্ধ করেন। এ প্রক্রিয়া সমাপ্তির পর তিনি উৎসসমূহ রেখে দেন, সংগৃহীত নোট নিয়ে বসে পড়েন এবং প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত লিখে কাজ শেষ করেন।

ইতিহাস রচনার এ পদ্ধতিটি খুব একটা সুবিধাজনক বা গ্রহণীয় বলে মনে হয় না। সঠিক পদ্ধতি হিসেবে নির্বাচিত বিষয়ের উপর প্রধান উৎসসমূহের গভীর অনুশীলনের পর ঐতিহাসিকের মনে যখন বিষয়টি সম্পর্কে ব্যাপক ধারণার জন্ম নেয় তখনই লেখা আরম্ভ করা প্রয়োজন।

এরপর তথ্যানুসন্ধান, পড়া ও লেখা পর্যায়ক্রমে চলবে। এ প্রক্রিয়া চলতে থাকাতালে লেখা বাড়ানো হয়, বাদ দেওয়া হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে ঢেলে সাজানো হয়। লেখা পড়াকে পথনির্দেশনাদেয় এবং নিয়ন্ত্রণও ফলপ্রসূ করে। ঐতিহাসিক যতই লেখার কাজে অগ্রসর হন ততই তিনি বুঝতে পারেন

যেহেতু ইতিহাস উৎসভিত্তিক সে কারণে বিজ্ঞান সম্মত ইতিহাস রচনার জন্য ইতিহাস গবেষণার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে উৎসের অনুসন্ধান করতে হয়। ঐতিহাসিকের পদক্ষেপ হল তথ্য সংগ্রহ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এবং তা যাচাই করে ব্যাখ্যা করা। কার অতীতের সব তথ্যই ঐতিহাসিক তথ্য নয়।

যে তাঁর আর কি খোঁজা দরকার এবং পাওয়া যায় তার তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা তার কাছে বেশি করে প্রতিভাত হয়। তথ্যানুসন্ধান ও লিখন, যে দুটি প্রক্রিয়াকে অর্থনীতির ভাষায় উৎপাদন (input) ও উৎপাদিত (output) দ্রব্য বলতে পারা যায় তা পর্যায়ক্রমে ঘটনা থাকে। এটা একই প্রক্রিয়ার দুটি দিক মাত্র। একাজ হল ‘প্রদান’ ও ‘প্রতিদান’। কিন্তু কোনো ঐতিহাসিক যদি তাদের আলাদা করতে চেষ্টা করেন বা আরেকটিকে অন্যটির চেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন, তাহলে তিনি দুপ্রকারের ভ্রান্তির কোনো না কোনোটিতে পড়ে যাবেন। হয়, তিনি অর্থহীন, তাৎপর্যহীন জোড়াতালির ইতিহাস লিখবেন, নইলে লিখবেন প্রচার কাহিনী বা রহস্য উপন্যাস বা ঐতিহাসিক উপন্যাস। এ ধরনের কাজে অতীতের তথ্যাবলীকে শুধু নকশা করার কাজে ব্যবহার করা হবে যার সঙ্গে ইতিহাসের কোনো সম্পর্ক নেই।

এখন প্রশ্ন হল, বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস প্রণয়নের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিককে কিকি নিয়মবিদ্যা অনুসরণ করতে হবে? কিভাবে তিনি উৎসব সংগ্রহের কাজে লিপ্ত হবেন? উৎস গ্রহণ বা বর্জনের ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ নীতি অনুসরণ করবেন? ইতিহাস গবেষণায় প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে উৎসের (source) অনুসন্ধান লাগতে হয়। ইতিহাস উৎসভিত্তিক, উৎস ছাড়া ইতিহাস হয় না। উৎসও আবার নানা ধরনের—(ক) প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন যেমন লিপি, মুদ্রা, জীবাশ্ম, হাড়গোড়, যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র, আসবাবপত্র, সৌধচিহ্ন, ইত্যাদি।(খ) মৌখিকভাবে হস্তান্তরিত বিশ্বাস বা প্রথা যেমন অতিকথন, রূপকথা, কাহিনীমালা, পালা, গান ইত্যাদি, (গ) ছবি ভিত্তিক উপাত্ত যেমন নকশা, মানচিত্র প্রভৃতি, (ঘ) দলিল, দস্তাবেজ, প্রত্নলেখ ইত্যাদি। লিখিত বিবরণ-এর মধ্যে অতি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি থেকে আরম্ভ করে সকল সন্ধি, চুক্তি, দিনলিপি, মুদ্রিত পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, সংবাদপত্র, চিঠি এবং মহাফেজখানায় রক্ষিত আরও নানা ধরনের উৎস।

এইসব উৎস থেকে ঐতিহাসিকের কাছে নানা তথ্য আসে। তিনি সেগুলো জড়ো করেন, বাড়ি নিয়ে যান, রান্না করেন এবং তাঁর পছন্দ অনুযায়ী যে কোনোভাবে পরিবেশন করেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ঐতিহাসিকের পদক্ষেপ হলো যাচাই করা তথ্যের সংগ্রহ, এরপর তথ্যবিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। তথ্য যাচাই করে নেবার পর ব্যাখার কাজে অগ্রসর হতে হবে। কারণ অতীতের সব তথ্যই ঐতিহাসিক তথ্য নয় বা ঐতিহাসিকের সেগুলোকে ঐভাবে বিবেচনা করেনা না।

প্রশ্ন

১। ইতিহাস গবেষণার প্রথম পদক্ষেপ কি।

১.১.২.৩ : প্রামাণ্য তথ্য ও লিখন পদ্ধতি

ঐতিহাসিক তথ্য বলতে কি বোঝায়? এটি একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। লোকচলতি মতে এমন কিছু মৌলিক তথ্য আছে যা সব ঐতিহাসিকের কাছেই সমান এবং বলা যায় যে, সেগুলো ইতিহাসের মেরুদণ্ড তৈরি করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোনো বড় যুদ্ধের সন্ তারিখ সম্পর্কে বা কোনো বড় ঘটনার সন্ কারিখ সম্পর্কে ঐতিহাসিকের ‘নির্ভুল হওয়াটা কর্তব্য, কোনো সন্দেহ নয়।’ এটি তাঁর কাজের প্রয়োজনীয় শর্ত, কিন্তু মূল কাজ নয়। ঠিক এইভাবে কাজের জন্য ঐতিহাসিককে ‘ইতিহাসের সহায়ক বিজ্ঞা’ বলে যা পরিচিত তার উপর নিভরশীল হতে হয়। যথা প্রত্নতত্ত্ব, প্রত্নলেখবিদ্যা, মুদ্রাতত্ত্ব, কালানুক্রম ইত্যাদি। মাটির বা মার্বেল পাত্রের টুকরোর উৎপত্তি ও পর্ব নির্ধারণ, কোনো দুর্বোধ্য প্রত্নলেখের পাঠোদ্ধার বা কোনো তারিখ সঠিক প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় বিশদ জ্যোতির্বিজ্ঞানভিত্তিক গণনা—এই সবেরই জন্য একজন বিশেষজ্ঞের যে বিশেষ দক্ষতা লাগে তা ঐতিহাসিকের থাকার দরকার নেই। যেমন পলাশীর যুদ্ধ হয়েছিল ১৭৫৭ সালে। এটি একটি সর্বজনগ্রাহ্য তথ্য। এইসব তথ্যকথিত ভিত্তিস্থানীয় তথ্য— যা সব ঐতিহাসিকের কাছেই সমান— সাধারণতঃ ইতিহাসের নয়, বরঞ্চ ঐতিহাসিকের কাঁচা মালের পর্যায়ে পড়ে। ঐতিহাসিকের মহান দায়িত্ব হল, বিভিন্ন তথ্যের নির্বাচন ও বিন্যাস। তথ্য নিজেই কথা বলে এটি ঠিক নয়। তথ্যেরা একমাত্র তখনই কথা বলে যখন ঐতিহাসিক তাদের ডাক দেন, তিনিই ঠিক করেন কোন্ তথ্যকে তিনি বলতে দেবেন, কোন্ ক্রমে বা কোন্ প্রসঙ্গে পলাশীতে যে ১৭৫৭ সালে যুদ্ধ হয়েছিল তা জানার পাটকদের আগ্রহী হওয়ার একমাত্র কারণঃ ঐতিহাসিক এটিকে ইতিহাসের একটি বড় ঘটনা বলে মনে করেন। অধ্যাপক ট্যালকট্ পারসন্স একবার বলেছিলেন, বিজ্ঞান হলে ‘বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞানাত্মক বোধশক্তির নির্বাচনমূলক পদ্ধতি’। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ইতিহাসও তাই। ঐতিহাসিককে ঘটনা বাছাই করতেই হয়। ইতিহাসের তথ্য ও অতীত সম্পর্কে অন্যান্য তথ্যের মধ্যে অনেক ফারাক আছে। অল্পসংখ্যক তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য বাছাই করে সেগুলোকে ঐতিহাসিক তথ্যে পরিণত করা এবং প্রচুর তাৎপর্যহীন তথ্যকে অনৈতিহাসিক বলে বাদ দেওয়া— এই দুই দায়িত্বই হল ঐতিহাসিকের। মধ্যযুগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ব্যারাক্লো মন্তব্য করেছিলেন, ‘যে ইতিহাস আমরা পড়ি তা তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও সঠিকভাবে বলতে গেলে তথ্যবিভিক নয়, বরঞ্চ এক সারি স্বীকৃত অভিমত।’

ঐতিহাসিক বিউরী প্রাচীন ও মধ্যযুগ—এই দু-যুগই নিয়ে কাজ করেছিলেন। তিনি বলেন, ‘প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ইতিহাসের বিভিন্ন নথি নানারকম ছিদ্রে ভরা’। এর বড় কারণ হল তথ্য বাছাই-এর ক্ষেত্রে নানা ভ্রান্তি। একটা দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টা আরও স্পষ্ট হবে। খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচ শতকের গ্রীস সম্পর্কে আমাদের জানা ইতিহাসে দোষত্রুটি থাকার প্রধান কারণ এই নয় যে এর অনেক টুকরো দুর্ঘটনাক্রমে হারিয়ে গেছে। আসল কারণ হল ঃ এই ইতিহাসটা তৈরি হয়েছে মোটামুটি এথেন্স শহরের ছোট একদল লোককে

নিয়ে। এথেন্স-এর একজন নাগরিকের চোখে পঞ্চম শতকের গ্রীস কেমন ছিল আমরা তার অনেক কিছুই জানি, কিন্তু স্পার্টা, করিন্থ বা থিবস্-এর নাগরিকের কাছে তা ছিল সে বিষয়ে প্রায় কিছুই জানি না। পার্সিয়া, দাস বা অন্যান্য অনাগরিক বাসিন্দাদের কথা না হয় বাদই দিলাম। এর কারণ এ ধরনের ইতিহাস আগের থেকেই আমাদের জন্য নির্বাচিত

ঐতিহাসিকের মহান দায়িত্ব হল বিভিন্ন তথ্যের নির্বাচন ও বিন্যাস। ঐতিহাসিক প্রচুর পরিমাণে তথ্য জোগাড় করেন। কিন্তু তার সবগুলো ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত করেন না। গবেষণাধীন বিষয়ের উপর উৎস জোগাড় এবং উৎসের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের পর শেষ ধাপে ঐতিহাসিককে তার বিষয়ের সাথে সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক তথ্যবলী বাছাই করে নিতে হয়।

ও নির্ধারিত হয়েছে। আর তা হয়েছে, যতটা দুর্ঘটনাক্রমে, তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু মানুষের মাধ্যমে, যাঁরা সচেতন বা অবচেতনভাবে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে উদ্ভুদ্ধ ছিলেন এবং ভেবেছিলেন যে শুধু সেইসব তথ্যই সংরক্ষণযোগ্য যেগুলো তাঁদের সেই দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করে। ঠিক একইভাবে মধ্যযুগীয় ইতিহাসের তথ্য বলতে আমরা যা জানি তার প্রায় সবই প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে কালপঞ্জিকারেরা বাছাই করে গেছেন। পেশাগতভাবে এঁরা ধর্মের তত্ত্ব ও চর্চায় নিযুক্ত ছিলেন। ফলে ধর্মকে তাঁরা চূড়ান্ত মনে করতেন ও তার সঙ্গে সম্পর্কিত প্রত্যেকটি ব্যাপার নথিবদ্ধ করেছেন, তা ছাড়া আর বিশেষ কিছু করেননি। আর উনিশ শতকের ঐতিহাসিকেরা নীরস তথ্যভিত্তিক ইতিহাস আমাদের জন্য রেখে গেছেন। তথ্যের বিষয়ে উনিশ শতকের লেখকদের অন্ধভক্তি পরিণত হয়েছিল দলিল দস্তাবেজের প্রতি অন্ধভক্তি। এঁদের তথ্যের মন্দিরে দলিল-দস্তাবেজ ছিল বিগ্রহস্বরূপ। কিন্তু এই সমস্ত দলিল ফতোয়া, চুক্তিপত্র, খাজনার হিসাব, সংসদীয় বিবরণ, সরকারি পত্রালাপ, ব্যক্তিগত চিঠি ও দিনপঞ্জী খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, দলিল লেখক যা ভেবেছিলেন, কোনো দলিলই তার থেকে বেশি কিছু জানাতে পারে না— যা ঘটেছিল বলে তিনি ভেবেছেন, যা হওয়া উচিত বা হতে পারে বলে তিনি ভেবেছেন। এর কোনোটারই কোনো অর্থ হয় না যতক্ষণ না ঐতিহাসিক এদের বিচার করে অর্থ উদ্ধার করেন। দলিলে পাওয়া যাক বা না যাক, তথ্যকে যে-কোনোরকমে ব্যবহারের পূর্বে ঐতিহাসিককে তো তা মাপসই করে নিতে হবে। অতএব ইতিহাস লিখন প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল সংশ্লেষণ। গবেষণাধীন বিষয়ের উপর উৎস জোগাড় এবং উৎসের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের পর যে বিপুল তথ্যের পাহাড় তখনও থেকে যায়, তার বর্জন। তার সবগুলো ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। শেষ ধাপে ঐতিহাসিককে তার বিষয়ের সাথে সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক তথ্যবলী বাছাই করে নিতে হয়। নির্বাচন, তথ্য গ্রহণ-বর্জনের এ পর্যায়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণাধীন বিষয় যত জটিল, ব্যাপক ও বিস্তৃত হবে, ঐতিহাসিকের পক্ষে গ্রহণ বর্জনের পালাও তত কঠিন হয়।

গ্রহণ-বর্জন করে ইতিহাস প্রণয়নের সময় ঐতিহাসিককে তথ্যবিষয়ক সিদ্ধান্ত ও তথ্যের বিচার-বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা দিকে নজর দিতে হবে। তথ্যের সঠিকতা ও মৌলিকত্ব যাচাই-এর মাধ্যমে উৎসের ভিতর কোনো জালিয়াতি, জুয়াচুরি, ভাঁওতাবাজি প্রভৃতি থাকলে তা খুঁজে বার করতে হবে। অনেক সময় লিপিকার, নকলনবিশ বা অনুবাদকদের গাফিলতির জন্য প্রাচীন দলিল দস্তাবেজে বেশ ভুল ভ্রান্তি প্রবেশ করে। উৎস ব্যবহারের পূর্বে খুব সাবধানে ঐতিহাসিককে এ সকল অপূর্ণতা দূর করতে হবে।

উৎস বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য ধাপ হল অভ্যন্তরীণ সমালোচনা। লিখিত উপাদানের মূল্যায়নে ঐতিহাসিককে সর্বদা উৎস প্রণেতার দৃষ্টিভঙ্গি, ভাবাদর্শ ও উদ্দেশ্য (motivation) সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে এবং বর্ণিত বক্তব্য সঠিক কিনা তা যাচাই করতে হবে। এজন্য গবেষণাধীন জনগোষ্ঠার ধ্যানধারণা, যুগধর্ম,

ইতিহাস হচ্ছে ঐতিহাসিক ও তথ্যের মধ্যে পারস্পরিক অবিচ্ছিন্ন ক্রিয়া প্রক্রিয়া এবং বর্তমানে ও অতীতের মধ্যকার এক অন্তর্হীন সংলাপ।

উপাদানের ভাষা প্রভৃতি ঐতিহাসিকের আয়ত্তে আনতে হবে, বা যে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিতে উৎস প্রণেতা বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেন তা অনুধাবন একান্ত প্রয়োজন। উৎসের বতীরে প্রবেশ করে সঠিক তথ্য উদঘাটনের নিমিত্ত এটা একান্ত দরকার। উদাহরণস্বরূপ

রাজনীতিবিদদের দিনলিপির কথা বলা যায়। এসব উৎস দারুণ সন্দেহের চোখে দেখতে হয়, কারণ এটা অনেকটা সর্বজনস্বীকৃত যে মানুষ সহজাতভাবে নিজেদের কৃতিত্ব গাঁথা সর্বাধিক সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে তুলে ধরে এবং অপযশ ও দুর্বল দিকগুলো যথাসম্ভব আড়ালে রাখে। সরকারি নথিপত্রের বেলায়ও ঠিক একই কথা খাটে। এসব কাগজপত্রে কিছু বিষয় গোপন ও কিছু বিষয় প্রকাশ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে সরকার যখন কোনো বিষয়ে স্বীয় অবস্থায় ব্যাখ্যা, বা বৈদেশিক নীতির পরিবর্তনের যথার্থতা বা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য দলিলাদি জনসমক্ষে প্রকাশ করে তখন ব্যাপারটি প্রকটভাবে দেখা যায়। মোট কথা, উৎস ব্যবহারের পূর্বে ঐতিহাসিককে প্রতিটি দলিল প্রণেতার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থান এবং আশ্বাস, বিশ্বাস, পছন্দ, অপছন্দ ও তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। তা না হলে উৎসের সঠিক ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ কখনও সম্ভব হয় না।

পরিশেষে ঐতিহাসিক ও তাঁর তথ্যের মূল্যায়নে আমাদেরকে বাহ্যত দুই বিপরীতমুখী পরিস্থিতির মধ্যে নিয়ে যায়। অনেকটা উভয় সংকট পরিস্থিতিতে ইতিহাসের তরী বেয়ে নেওয়া দুষ্কর বলেই মনে হয়। একদিকে ইতিহাসকে তথ্যের নৈব্যক্তিক সংকলন বলে দেখানো হয়েছে, যেখানে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের চাইতে তথ্যের প্রাধান্য বেশে। অন্যদিকে দেখানো হয় ইতিহাস ঐতিহাসিকের মানসিকতার নিরিখে ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রতিবেদন, যেখানে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঐতিহাসিক তথ্যাবলীকে স্বীয় আয়ত্তে আনেন এবং প্রতিষ্ঠিত করেন। এক ধারণা মতে, ইতিহাসের ভরকেন্দ্র আছে অতীতে, আবার অন্য ধারণা মতে, এর ভরকেন্দ্র আছে বর্তমানে। অবশ্য উভয় ধারণার কোনোটিই এককভাবে সমর্থনযোগ্য নয়। বাস্তবিকপক্ষে আমাদের পরিস্থিতি যত বিব্রতকর বলে মনে হচ্ছে তত নয়। ঐতিহাসিকের এ বিপজ্জনক অবস্থা মানব প্রকৃতিরই প্রতিফলন। প্রথম শৈশব ও অতিবৃদ্ধ অবস্থায় ছাড়া মানুষ পরিবেশের সঙ্গে পুরোপুরি জড়িয়ে পড়ে না ও নিঃশর্তভাবে তার অধীন হয় না। অন্যদিকে, সে কখনোই পরিবেশ থেকে পুরোপুরি স্বাধীন থাকে না ও তার নিঃশর্ত প্রভুও হয় না। পরিবেশের সাথে মানুষের যে সম্পর্ক, ঐতিহাসিকের সাথে তার বিষয়বস্তুর সম্পর্কও ঠিক তেমনি। ঐতিহাসিক তথ্যের হাতে ক্রীড়নক বা তথ্যের স্বেচ্ছাচারী প্রভু— এই দুই-এর কোনোটাই নন। ঐতিহাসিকের সঙ্গে তথ্যের সম্পর্ক— সমতার সম্পর্ক, লেনদেনের সম্পর্ক। যে কোনো কর্মরত ঐতিহাসিকই জানেন যে তার ইতিহাস লেখা চলাকালে তিনি অনবরত তথ্যের সাথে ব্যাখ্যার এবং ব্যাখ্যার সাথে তথ্যের সমন্বয় ঘটিয়ে থাকেন। এ অবস্থায় একটি থেকে অন্যটির প্রাধান্য বেশি এমনটি ভাবাও ঠিক নয়।

প্রশ্ন

- ১। ইতিহাসের সহায়ক বিজ্ঞান কি কি?
- ২। ইতিহাস রচনায় তথ্যের গুরুত্ব কি?

১.১.২.৪ : উপসংহার

তাই ইতিহাস লিখনের সময় ঐতিহাসিকের কাজ আরম্ভ হয় বিভিন্ন তথ্যের ও ব্যাখ্যার নির্বাচনের মাধ্যমে। তার কাজ যখন অগ্রসর হতে থাকে তখন পারস্পরিক প্রভাবের কারণে ব্যাখ্যা, নির্বাচন ও তথ্যবিন্যাসে সূক্ষ্ম ও সম্ভবতঃ অচেতন পরিবর্তন এসে যায়। যেহেতু ঐতিহাসিক বর্তমানের এবং তথ্য অতীতের অংশ, তাই ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও তথ্যের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া বর্তমান ও অতীতের পারস্পরিক সম্বন্ধকেও সংশ্লিষ্ট করে। ঐতিহাসিক ও ইতিহাসের তথ্য পরস্পরের কাছে প্রয়োজনীয়। তথ্য ছাড়া ঐতিহাসিক শিকড়হীন ও বিফল। আবার ঐতিহাসিক ছাড়া তথ্যেরা মৃত ও অর্থহীন। এভাবে বলা যায়, ইতিহাস হচ্ছে ঐতিহাসিক ও তথ্যের মধ্যে পারস্পরিক অবিচ্ছিন্ন ক্রিয়া-প্রক্রিয়া এবং বর্তমান ও অতীতের মধ্যকার এক অনন্তহীন সংলাপ। সচেতন বা অবচেতন যেভাবেই হোক না কেন ঐতিহাসিকের লেখায় সমসাময়িককালে তার অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হবেই।

১.১.২.৫ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

- ১। কাকে বলে ইতিহাস?—ই. এইচ. কার
(বঙ্গানুবাদ গ্লেনহোৎপল দত্ত ও সৌমিত্র পালিত)
- ২। ইতিহাস ও ঐতিহাসিক—মমতাজুর রহমান তরফদার।
- ৩। ইতিহাস ও ঐতিহাসিক—অমলেশ ত্রিপাঠী।
- ৪। ইতিহাস ও ঐতিহাসদর্শন—সুকান্ত পাল।
- ৫। ইতিহাসের ধারা—সুশোভনচন্দ্র সরকার।
- ৬। প্রসঙ্গ ইতিহাস—সুশোভনচন্দ্র সরকার।

১.১.২.৬ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

- ১। ইতিহাসের তথ্য ঐতিহাসিক কোন্ পদ্ধতিতে গ্রহণ করবেন?
- ২। বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে লিখনপদ্ধতি কি হওয়া উচিত?
- ৩। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে উৎস ও বিশ্লেষণের গুরুত্ব আলোচনা কর।
- ৪। তথ্য সংগ্রহ ও নির্বাচনের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিককে কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে?
- ৫। ইতিহাসের তথ্য ও তার সঙ্গে ঐতিহাসিকের সম্পর্ক আলোচনা কর।

পর্যায় গ্রন্থ - ১

একক ৩

Causation in History

বিন্যাস ক্রম :

উপ-একক-১

- ১.১.৩.১.০ : উদ্দেশ্য
- ১.১.৩.১.১ : সূচনা
- ১.১.৩.১.২ : ঐতিহাসিক কারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা
- ১.১.৩.১.৩ : ইতিহাসের কার্যকারণ উদ্ঘাটন প্রক্রিয়া— নির্ধারণবাদ বা নিমিত্তবাদের গুরুত্ব
- ১.১.৩.১.৪ : দৈবঘটনা বা 'আপতন'-এর (Chance) গুরুত্ব
- ১.১.৩.১.৬ : উপসংহার
- ১.১.৩.১.৬ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী
- ১.১.৩.১.৭ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

উপ-একক-২

- ১.১.৩.২.০ : উদ্দেশ্য
- ১.১.৩.২.১ : 'ইতিহাসবাদ' কথাটার অর্থ
- ১.১.৩.২.২ : ইতিহাসবাদ নিয়ে চিন্তাভাবনা —বিশ শতকে ঐতিহাসিক বিতর্ক
- ১.১.৩.২.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী
- ১.১.৩.২.৪ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

উপ-একক - ১

Causation in History

১.১.৩.১.০ : উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন :

- (১) ইতিহাস ‘কার্যকারণ’ কথাটির অর্থ।
- (২) প্রাচীন থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ইতিহাসে ‘কার্যকারণ’র প্রভাব ও গুরুত্ব— কিছু দৃষ্টান্ত।
- (৩) নির্ধারণবাদ বা নিমিত্তবাদ কথাটির অর্থ ও গুরুত্ব—নির্ধারণবাদের কিছু দৃষ্টান্ত।
- (৪) ঘটনার আকস্মিকতা ও ইতিহাসে এর প্রভাব— কিছু দৃষ্টান্ত।
- (৫) কার্যকারণ ও ফলাফল।

১.১.৩.১.১ : সূচনা

ইতিহাসচর্চা হলো কারণ-এর চর্চা। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো প্রতিটি ঐতিহাসিক ঘটনার গভীরে নিহিত কার্যকারণ খুঁজে বার করা। ঐতিহাসিক অবিরত প্রশ্ন তোলেন কেন এই ঘটনা ঘটল? কিভাবে ঘটল? আর যতক্ষণ না পর্যন্ত তিনি এর কোনো সদুত্তর পাচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি থামতে পারেন না।

১.১.৩.১.২ : ঐতিহাসিক কারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা

ঐতিহাসিক ঘটনার কারণ খুঁজে বার করার ইচ্ছাটি অতি প্রাচীন কাল থেকেই ঐতিহাসিকদের মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে। ইতিহাসের জনক প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে ইতিহাস ঘটনার কার্যকারণের উপর বেশে জোর দেন। তাঁর রচনার গোড়াতেই তিনি নিজের উদ্দেশ্য নির্দেশ করেছেন। “গ্রীক ও বর্বরদের কাজকর্মের স্মৃতি সংরক্ষণ, ‘এবং বিশেষত, আর সব কিছু ছাড়াও, তাদের পারস্পরিক যুদ্ধের কারণ দেখানো।’ হেরোডোটাস গ্রীক ও পারসিকদের মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধের কারণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাই তিনি শুধু ঘটনাবলীর বর্ণনায় নিজেকে আবদ্ধ না রেখে ঘটনাগুলোর সম্ভাব্য কারণ বিশ্লেষণের চেষ্টা করেন। থুকিডিডিসের কার্যকারণ সম্পর্কে কোনো সঠিক ধারণা ছিল না বলে অভিযোগ করা হয়। অষ্টাদশ

ইতিহাস চর্চার প্রধান উদ্দেশ্য হলো প্রতিটি ঐতিহাসিক ঘটনার গভীরে নিহিত কার্য-কারণ খুঁজে বার করা। এটা সর্বজন স্বীকৃত যে ইতিহাসে অতীত কাহিনী পুনর্গঠনের অর্থই হলো পরস্পরের বর্ণনা করা। কার্য কারণ নির্ধারণ প্রক্রিয়ার যুক্তি প্রদর্শনের সময় কোন কারণটি প্রাধান্য পাবে তার ভিত্তিতে ইতিহাস রচনা আবির্ভূত হয়।

শতকে আধুনিক ইতিহাসতত্ত্বের গোড়াপত্তন শুরুর লগ্নে ফরাসি দার্শনিক মন্টেস্কু (Montesquieu) তাঁর প্রণীত “Considerations on the causes of the greatness of the Romans and of their Rise and Decline”

-নামক ইতিহাস গ্রন্থের শুরুতেই নীতি হিসাবে ধরে নেন, ‘প্রতিটি রাজবংশ বা সাম্রাজ্যের উত্থান, অবক্ষয় ও পতনের মূলে কিছু সাধারণ, নৈতিক বা বাস্তব কারণ সক্রিয় থাকে, আর যত কিছু ঘটুক না কেন তা এসব কারণের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত।’ এরপর ‘Spirit of Laws’ গ্রন্থে তিনি বিষয়টি আরও বিকশিত ও বোধগম্য করে তোলেন। তাঁর মতে ‘এ পৃথিবীতে মানুষের কর্মকাণ্ডের দৃশ্যমান ফলাফল অন্ধ নিয়তি সৃষ্টি করেছে এরূপ মনে করা অযৌক্তিক ও অসম্ভব’। বরং সবকিছুর পশ্চাতে কারণ লুকিয়ে আছে।

মন্টেস্কুর পর দু’শতাধিক বছর ধরে ঐতিহাসিক ও ইতিহাস-দার্শনিকরা ঐতিহাসিক ঘটনার কার্যকারণ খুঁজে বার করার চেষ্টায় রত হন। এ কারণগুলি কখনও অধিবিদ্যামূলক, কখনও অর্থনৈতিক, আবার কোনো সময় মনস্তাত্ত্বিক বলে ভাবা হত। মোটের উপর ঘটনার প্রতি যে ধরনের কারণই আরোপ করা হোক না কেন এটা এখন স্বীকৃত সত্য যে ইতিহাসে অতীত কাহিনী পুনর্গঠনের অর্থই হলো কারণ ও ফলাফলের নিরিখে ঘটনা পরস্পরার বর্ণনা কার। দার্শনিক ভলতেয়ার যথার্থই বলেন যে, ঘটনার মূলে নিহিত কারণ বিশ্লেষণ ব্যতীত শুধু বর্ণনামূলক ইতিহাসের কোনো তাৎপর্য নেই। এটা আমাদের কোনো কাজে আসে না এবং আসতে পারে না।

কারণ-বিষয়ক সমস্যা নিয়ে ঐতিহাসিকের এগিয়ে যাবার প্রথম বৈশিষ্ট্যই হলো এই যে, তিনি সাধারণতঃ একই ঘটনার জন্য একাধিক কারণ নির্দেশ করবেন। অর্থনীতিবিদ মার্শাল একবার লিখেছিলেন, ‘কোনো কারণের ফলের সঙ্গে অন্যান্য নানা কারণের ফল মিলেমিশে থাকে— কোনো একটি কারণের ফল বিবেচনা করার বিষয়ে লোকেদের তাই সর্ব উপায়ে সচেতন করে দেওয়া উচিত যে তাঁরা যেন সেইসব কারণকেও হিসেবে ধরেন।’ ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় কেন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটে, এর উত্তরে মূলত একজন ঐতিহাসিককে ঘটনার বহু কারণ নিয়ে গবেষণা চালাতে হবে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, বলশেভিক বিপ্লবের কারণগুলি আলোচনা করার সময় একজন ঐতিহাসিককে রাশিয়ার উপর্যুপরি সামরিক পরাজয়, যুদ্ধের চাপে রুশ অর্থনীতিতে বিপর্যয়, বলশেভিকদের সফল প্রচার, কৃষি সমস্যা সমাধানে জারতন্ত্রী সরকারের ব্যর্থতা, পেট্রোগ্রাডের কল-কারখানায় দরিদ্র ও শোষিত সর্বহারাদের সমাবেশ, আর লেনিনের কর্মদক্ষতা—সংক্ষেপে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ভাবাদর্শগত, ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি নানা কারণের উল্লেখ করতে হবে।

ঐতিহাসিকের কারণ উদ্ঘাটন পদ্ধতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হোল তাঁর সৃজনশীলতা। তাঁর কাজ হোল কারণগুলিকে কিছুটা ক্রমপরম্পরায় সাজিয়ে দেওয়া, যাতে একটির সঙ্গে অন্যটির সম্পর্ক স্থির হয়। কোনো কারণ বা কারণ পর্যায়কে ‘শেষ বিচারে’ বা ‘চূড়ান্ত বিশ্লেষণে’ চূড়ান্ত কারণ বা সব কারণের কারণ গণ্য করা হবে তা স্থির করার জন্যই সম্ভবতঃ এটা করতে হবে। একজন খাঁটি ঐতিহাসিক তার বিষয়টিকে এইভাবেই ব্যাখ্যা করেন। ঐতিহাসিককে চেনা যায় তাঁর আছত কারণগুলি দিয়ে। রোম সাম্রাজ্যের অবনতি ও পতনের কারণ হিসেবে গিবন মনে করতেন বর্বরতা ও ধর্মের বিজয়। উনিশ শতকের ইংরেজ হুইগ ঐতিহাসিকেরা ব্রিটিশ শক্তি ও সমৃদ্ধির কারণ দেখিয়েছিলেন এমন সব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বিকাশ যা সাংবিধানিক স্বাধীনতার নীতিগুলিকে ধারণ করে। সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে গিবন ও উনিশ শতকের ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের সেকেলে বলে মনে হয়, কেননা কার্যকারণ নির্ধারণে তাঁরা অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটকে গণ্য করেননি। অথচ আধুনিক ঐতিহাসিকেরা অর্থনৈতিক কারণসমূহের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। আসলে কার্যকারণ নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত প্রদর্শনের সময় কোন্ প্রাধান্য পাবে তার ভিত্তিতে ইতিহাস রচনা আবর্তিত হয়।

আধুনিককালে বিজ্ঞান একইসঙ্গে ‘বৈচিত্র্য ও জটিলতা’ একত্ব ও সরলতা’র দিকে ধাবমান। ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রেও এ নিয়মটি সমভাবে প্রযোজ্য। ঐতিহাসিক গবেষণার পরিধি সদা বিস্তৃত ও গভীরতর করে ‘কেন’ এই প্রশ্নের অধিক থেকে অধিকতর উত্তর খুঁজে বের করেছে।

সাম্প্রতিককালে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আইনসংক্রান্ত ইতিহাস ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তদুপরি রাজনৈতিক ইতিহাসে জটিলতার বিষয়ে নতুন চিন্তাভাবনা ও অনুশীলন এবং মনস্তত্ত্ব ও পরিসংখ্যানের কলাকৌশল ঐতিহাসিকের উত্তরের গণ্ডি ও সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে। ঐতিহাসিক অতীতকে অনুধাবনের আগ্রহে বৈজ্ঞানিকের মতো যুগপৎভাবে তাঁর উত্তরের সংখ্যাধিক্য সরলী করতে, এক উত্তর অন্য উত্তরের অধীন করতে এবং বিশৃঙ্খলা ঘটনাপ্রবাহ ও কারণাদির মধ্যে কিছু না শৃঙ্খলা উপস্থাপিত করতে বাধ্য। ঐতিহাসিককে কারণের সরলীকরণ ও বৃদ্ধিকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই গবেষণা কাজ চালিয়ে নিতে হয়। বিজ্ঞানের মত ইতিহাসও দ্বৈত তথা আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়।

প্রশ্ন

১। কার্য-কারণ সম্পর্কে মন্টেস্কুর মত কি?

২। ঐতিহাসিকের কারণ উদ্ঘাটন পদ্ধতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য কি?

১.১.৩.১.৩ : ইতিহাসের কার্যকারণ উদ্ঘাটন প্রক্রিয়া—নির্ধারণবাদ বা নিমিত্তবাদের গুরুত্ব

এ পর্যয়ে ইতিহাসে কার্যকারণ উদ্ঘাটন প্রক্রিয়ায় দুটি আকর্ষণীয়, কিন্তু বিভ্রান্তিকর বা ‘মোহন ফাঁদ’ বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। এদের একটি হলো (ক) নির্ধারণবাদ (Determinism) বা নিমিত্তবাদ ও অন্যটি অপ্রত্যাশিত বা দৈব ঘটনা, পরিভাষায় যাকে বলে আপতন (chance) বা ‘ক্লিওপাত্রার নাক’। (Cleopatras nose)

(ক) নির্ধারণবাদ বা নিমিত্তবাদের সংজ্ঞার্থ হল : এমন এক ধরনের বিশ্বাস যে, যা কিছু ঘটনা তার সবেই এক বা একাধিক কারণ আছে বেং সেই কারণগুলি যদি অন্যরকম না হতো তাহলে এর চেয়ে আলাদা কিছুই হতে পারত না। আরও সহজ করে এর অর্থ বোঝালে বলা যায়, নির্ধারণবাদ অর্থ হল, তথ্যগুলো একই থাকলে, যা ঘটবেই, কিছুতেই এর অন্যথা হতে পারে না। অন্যরকম ঘটতে পারে বলে মনে করার অর্থ শুধু এই যে তথ্যগুলো আলাদা হলে তবেই অন্যরকম কিছু হতো। নির্ধারণবাদ শুধু ইতিহাসের সমস্যা নয়, সমগ্র মানবীয় আচার আচরণেরই সমস্যা। প্রত্যেক ঘটনার মূলে কোনো না কারণ নিহিত আছে বলে কথিত স্বতঃসিদ্ধটি আমাদের চারদিকে কি ঘটছে তা বোঝার পূর্বশর্ত। মানুষের আচরণ কার্যকরণ দ্বারা নির্দিষ্ট এবং এ কারণগুলো সনাক্ত করা সম্ভব— অনুরূপ ধারণা ছাড়া মানুষের দৈনন্দিন জীবন প্রায় অসম্ভব।

সাধারণ মানুষের মত ঐতিহাসিকও বিশ্বাস করেন যে মানুষের প্রত্যেক কাজেরই এক বা একাধিক কারণ আছে যা নীতিগতভাবে নির্ণয় বা অবধারণ যোগ্য। অনুরূপ ধারণা না করলে দৈনন্দিন জীবনের মত ইতিহাসচর্চা ও অসম্ভব হয়ে পড়বে। ঐতিহাসিকের বিশেষ কাজ ও দায়িত্ব হল এ সকল কারণ অনুসন্ধান করা। এর দ্বারা হয়তো

মনে হবে যে, তিনি মানবীয় আচরণের স্থিরকৃত (Determined) দিকটার প্রতি বিশেষভাবে আগ্রহী। কিন্তু এতে করে তিনি মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার ব্যাপারটি বাদ দেন না। কোনো ঘটনার অনিবার্যতার প্রশ্ন নিয়েও তিনি মাথা

ইতিহাসের কার্যকরণ উদ্ঘাটনা প্রক্রিয়ায় দুটি মতবাদ প্রচলিত—(ক) নির্ধারনবাদ বা নিমিত্তবাদ (খ) অপ্রত্যাশিত বা দৈব ঘটনা পরিভাষায় যাকে বলে আপাতন যা ক্লিওপাত্রার নাক। নির্ধারনবাদের অর্থ হল, তথ্যগুলো একই থাকলে যা ঘটবেই। কিছুতেই এক অন্যথা হতে পারে না।

ঘামান না। সাধারণ লোকের মতো অনেক সময় ঐতিহাসিক অসার বাগাড়ম্বরপূর্ণ ভাষায় কোনো ঘটনাকে অনিবার্য বলে বর্ণনা করেন। এর দ্বারা তিনি আসলে বোঝাতে চান যে বর্তমান পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন না হলে ঘটনাটি ঘটার সম্ভাবনা অত্যধিক বেশি। বাস্তবিকপক্ষে ঘটনা না ঘটা পর্যন্ত কোনো ঐতিহাসিক তা অনিবার্য বলে ভাবেন না। ইতিহাসে কোনো ঘটনাই অনিবার্য নয়।

ঐতিহাসিকদের ‘অনিবার্য’, ‘অবশ্যম্ভাবী’, ‘অপরিবার্য’ ইত্যাদি শব্দ পরিহার করে চলা উচিত।

‘অনিবার্যতা’ বিষয়ক সমস্যাটি খুবই অস্তঃসারশূন্য ও অর্থহীন বলে মনে হয়। তবুও যে প্রবল আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে সমসাময়িককালে এর অনুশীলন চলছে তার জন্য বিষয়টির মূলে নিহিত উদ্দেশ্য বা প্রেরণা খুঁজে বের করা দরকার। অনুরূপ চিন্তাচেতনার প্রধান উৎস হিসাবে মানুষের আবেগপ্রবণতা বা ‘যদি এমন না হয়ে তেমন হত’ চিন্তাধারাকে চিহ্নিত করা যায়। এ দৃষ্টিভঙ্গিটি শুধুমাত্র সমসাময়িক ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অতীত ইতিহাস যেমন ‘গোলাপের যুদ্ধ’ (১৪৮৫) আওমরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ (১৭৭৬) ইত্যাদির বেলায় অনুরূপ চিন্তা ভাবনা মনে জাগে না। এগুলো আমরা চূড়ান্ত বলেই ধরে নিই। এখানে ঐতিহাসিকের দায়িত্ব হলো— শুধু কি হয়েছে এবং কেন হয়েছে তা ব্যাখ্যা করা। এজন্য কেউ ঐতিহাসিককে নির্ধারনবাদী বলে অভিযুক্ত করে না এবং উইলিয়াম বা আমেরিকান বিদ্রোহীরা পরাজিত হলে কি ঘটতে পারত সে বিষয়ে বিকল্প চিন্তাভাবনা তুলে না ধরায় কেউ তাকে দোষারোপও করে না। কিন্তু নির্ধারনবাদী বা নিমিত্তবাদের সাথে কল্পকথার কোনো সংশ্রব নেই। আসলে ইতিহাসে অনুমানের কোনো স্থান নেই। অতীতে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনাকে নিয়ে বা তার ফলাফলকে নাকচ করে দিতে কেহ আগ্রহী নয় বা এগুলোর বিরুদ্ধে বিযোদগার করারও কিছু নেই। এ জন্য ঐতিহাসিক, যখন ঐ সকল বিষয়ে যবনিকা টানেন তখন কেউ তার প্রতিবাদ করে না। কিন্তু সামসাময়িক ইতিহাসের বড় সমস্যা হলো এই যে, প্রতিটি ঘটনা ঘটার বিকল্প পথগুলো জনগণের মনে থাকে এবং তাদের পক্ষে ঐতিহাসিকের মতামত গ্রহণ করা কঠিন হয়। এটি সম্পূর্ণভাবে আবেগপ্রবণ ও অনৈতিহাসিক প্রতিক্রিয়া। কিন্তু এ ধরনের ‘মাহন ফাঁদ’ বা চিন্তা-চেতনা থেকে আমাদেরকে চিরকালের মত মুক্তি পেতে হবে।

প্রশ্ন

- ১। ইতিহাসের কার্যকরণ উদ্ঘাটন প্রক্রিয়ায় প্রচলিত দুটি মতবাদের নাম কি?
- ২। নির্ধারনবাদ কি?

১.১.৩.১.৪ : দৈবঘটনা বা ‘আপাতন’-এর (Chance) গুরুত্ব

(খ) আপাতন (Chance) বা ‘ক্লিওপাত্রার নাক’ (Cleopatra's nose) বা অপ্রত্যাশিত বা দৈব ঘটনা তত্ত্ব অনুসারে ইতিহাসকে কেবল আকস্মিক ঘটনার সংগ্রহ বা সংকলন বলে অভিহিত করা হয়। এখানে

ঘটনাপ্রবাহ দৈবক্রমে যুগপৎভাবে ঘটে যায় এবং ঘটনার কারণ হিসেবে একমাত্র আভাবিত পূর্বপ্রেক্ষিতের উপর জোর দেয় হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে একটিয়াম (Actium) যুদ্ধের ফলাফল ঐতিহাসিক বর্ণিত কারণের প্রতি আরোপ না করে ক্লিওপাত্রার প্রতি এন্টোনিওর মোহাচ্ছন্নতাকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। অনুরূপভাবে ১৯২৩ সালের শরতকালে জিনোভিয়েভ, কামেনেভ এবং স্টালিনের সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ট্রুটস্কির পরাজয়কে কেবল হেমন্তকালে হাঁস শিকারে গিয়ে তার অসুস্থ হয়ে পড়ার উপর আরোপ করা হয়। ঐতিহাসিকের পক্ষে বিপ্লব ও যুদ্ধ সম্বন্ধে আগাম বলা সম্ভব, কিন্তু হেমন্তকালে বন্য হাঁস শিকারে গিয়ে তার অসুস্থ হয়ে পড়ার ফলশ্রুতি কি হতে পারে তা পূর্বে বলা অসম্ভব। নির্ধারণবাদ বা নিমিত্তবাদের সাথে এর কোনো সংযোগ নেই। ক্লিওপাত্রার জন্য এন্টোনিওর মোহাচ্ছন্নতা বা ট্রুটস্কির ঠাণ্ডা লেগে জ্বর অতি সাধারণভাবে কার্যকারণসূত্রে নির্ধারিত। রমণীর সৌন্দর্য ও পুরুষের মোহাচ্ছন্নতা বা পুরুষের সৌন্দর্য ও রমণীর মোহাচ্ছন্নতা প্রাত্যহিক জীবনের সাধারণ ঘটনা। তবুও বিশ্লেষণের আভাবজনিত কারণে বা বিশ্লেষণের প্রতি অনীহার জন্য অনেকের নিকট আকস্মিক বা দৈব ঘটনাগুলিই বেশি প্রাধান্য পায়। যে সব ব্যক্তি দৈবক্রম বা আকস্মিকতা বা ভাগ্যকে (Fortune) ইতিহাসে বিশ্লেষণের সময় বেশি গুরুত্ব দেয় তারা ঠিক কাজ করেন না।

ঘটনার আকস্মিকতা ইতিহাস প্রক্রিয়াকে কতটুকু প্রভাবিত করে তা একটু তলিয়ে দেখা দরকার। সাধারণভাবে দেখা যায় মন্টেস্কু প্রথম ব্যক্তি যিনি আকস্মিকতার অহেতুক প্রবাব থেকে ইতিহাসচর্চার রীতিনীতিকে রক্ষা করার প্রয়াস চালান। তার মতে যদি কোনো নির্দিষ্ট ব্যাপার, যেমন যুদ্ধের

আকস্মিক ফলাফল একটি রাষ্ট্রের ধ্বংস সাধন করে তবে মনে করতে হবে যে সেখানো এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল যাতে করে একটি খণ্ডযুদ্ধে পরাজয়ই রাষ্ট্রটির অধঃপতনের জন্য যথেষ্ট বলে প্রমাণিত হয়। অন্যান্য প্রতিকূল পরিস্থিতি বর্তমান না থাকলে একটি মাত্র যুদ্ধের জয়-পরাজয় চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণে সক্ষম হতো না। তাই একটি আকস্মিক ঘটনার ফলাফলের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া

আপারন বা ক্লিওপাত্রার নাক তত্ত্ব অনুসারে ইতিহাসকে কেবল আকস্মিক ঘটনার সংগ্রহ বা সংকলন বলে অভিহিত করা হয়। এখানে ঘটনা প্রবাহ দৈবক্রমে যুগোপৎ-ভাবে ঘটে যায় এবং ঘটনার কারণ হিসাবে একমাত্র আভাবিত পূর্ব-প্রেক্ষিতের উপর জোর দেওয়া হয়।

কোনো ঐতিহাসিকের পক্ষে উচিত হবে না। কার্ল মার্কসের মতে আকস্মিক ঘটনা ঘটনাপ্রবাহের গতিবেগকে ত্বরান্বিত বা বিলম্বিত করে, কিন্তু ঘটনা প্রক্রিয়ায় আমূল পরিবর্তন আনতে পারে না। আবার কোনো কোনো মতে অজ্ঞতার জন্যই আমরা ঘটনার আকস্মিকতার উপর বেশি জোর দিই। সহজভাবে যা বুঝি না তা আকস্মিক বলে আমরা চালানোর চেষ্টা করি। আবার কায়ক্লেশ সাধ্য অনুসন্ধান প্রক্রিয়া পরিহার করার উদ্দেশ্য অনেকে দুর্ঘটনাকে প্রাধান্য দেয়ার ব্যাপারে বেশি আগ্রহী হয়ে উঠে। মোট কথা যারা ইতিহাসকে আকস্মিক ঘটনার সংকলন বলে ধরে নেয় তাদেরকে অলস বা নীচু মানের বুদ্ধিজীবী বলে আখ্যায়িত করা যায়। আন্তরিক ইতিহাস গবেষকরা তথাকথিত আকস্মিক ঘটনাবলীকে মোটেও আকস্মিক মনে করে না। তার এগুলোকে যৌক্তিক ও তাৎপর্যপূর্ণভাবে ঘটনা প্রবাহের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের সাথে মিলিয়ে পর্যলোচনা করে। অবশ্য এর দ্বারাও ইতিহাসে আকস্মিকতার ভূমিকার যথেষ্ট ব্যাখ্যা মিলে না। অন্য দৃষ্টিকোণ থেকেও বিষয়টির ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে অনেক সময় সাধারণ ঘটনা ঐতিহাসিক ঘটনায় রূপান্তরিত হয়। সকল ঘটনা ঐতিহাসিক ঘটনা নয়। আবার ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক ঘটনার পার্থক্যও অনমনীয় বা অপরিবর্তনীয় নয়। যখনই কোনো ঘটনা প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয় তা ঐতিহাসিক ঘটনায় রূপান্তরিত হতে পারে। কার্যকারণ বিষয়ক ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গিও অনুরূপভাবে আবর্তিত হয়। ঐতিহাসিক ও তার তথ্যের মধ্যকার আবর্তনশীলতার মত ঐতিহাসিক কর্তৃক আরোপিত কার্যকারণ ও ঐতিহাসিকের মধ্যে দ্বৈত ও পারস্পরিক ক্রিয়া প্রক্রিয়া বর্তমান আছে। কার্যকারণ ঐতিহাসিকের ইতিহাস প্রক্রিয়া ব্যাখ্যার ধরণ স্থির করে, আবার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ধরন ঐতিহাসিক দ্বারা আরোপিত কারণগুলি ঠিক করার ব্যাপারে বড় ভূমিকা পালন করে। তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সার কথা হলো কারণাদির গুরুত্ব অনুসারে ঠিক করা বা কারণাদির মধ্যে আপেক্ষিক বা পারস্পরিক তাৎপর্য নির্ধারণ। ইতিহাসে আকস্মিকতাজনিত সমস্যার সূত্র এখানে পাওয়া যায়। ক্লিওপাত্রার সৌন্দর্য, লেনিনের অকাল মৃত্যু প্রভৃতি আকস্মিক ঘটনা ইতিহাসের গতিধারাকে পরিবর্তিত করেছিল, এগুলোর উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ বা সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া অনুচিত। অন্যপক্ষে যেহেতু এগুলো আকস্মিক ব্যাপার, তাই তারা ইতিহাসের যৌক্তিক বিশ্লেষণে বা তাৎপর্য অনুসারে ঐতিহাসিকের সাজানো কারণাদির মধ্যে স্থান পায় না। ঐতিহাসিকের জগৎ বৈজ্ঞানিকের জগতের মতো প্রকৃতি পৃথিবীর আলোকচিত্রতুল্য প্রতিলিপি নয়, বরং এটাকে কাজ চালানোর মতো একটি প্যাটার্ন বা আদল বলা যায়, যার মাধ্যমে ঐতিহাসিক মোটামুটি কার্যকরভাবে একে বুঝতে ও রপ্ত করতে সক্ষম হন। ঐতিহাসিক অতীত অভিজ্ঞতা থেকে ছেকে সিদ্ধান্ত বের করেন, অথবা নাগালের মধ্যকার বা যৌক্তিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের আওতাধীন অতীত অভিজ্ঞতাকে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণে কাজে লাগান। এটা কার্যকারণ উদ্ঘাটনের নির্দেশক বলেও প্রয়োজনে আসতে পারে। ঠিক কি ঘটে, কেন ঘটে তা নিরূপণের জন্য পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্যাবলী স্তূপীকৃত করা হয়। তারপর গবেষণাধীন প্রতিপাদ্যের অনুকূলে ও প্রতিকূলে তথ্যাদির গ্রহণ-বর্জন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যৌক্তিক ও বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন জ্ঞানের জাল তৈরি করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় আত্মবাদী (subjective) ধারার বাড়াবাড়ির বিপদ থাকলেও ঐতিহাসিক এভাবেই কাজ করে থাকেন।

প্রশ্ন

- ১। দৈব ঘটনা বা আপাতন তত্ত্ব অনুসারে ইতিহাসকে কি হিসাবে অভিহিত করা হয়?
- ২। দৈব ঘটনা বা আপাতন তত্ত্বের দুটি উদাহরণ দাও।

১.১.৩.১.৫ : উপসংহার

অতএব বলা যায় যে, ইতিহাস রচনা ঐতিহাসিক তাৎপর্যানুসারে ঘটনাবলীর এক নির্বাচন প্রক্রিয়া মাত্র। ট্যালকট পারসনস যথার্থই বলেন, ইতিহাস শুধু বাস্তবতার সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক নির্ধারণেই নয়, কারণসম্মত সম্পর্ক নির্ধারণেও ‘নির্বাচনমূলক পদ্ধতি’। অনন্ত তথ্যের মধ্য থেকে ঠিক যেভাবে ঐতিহাসিক তার প্রয়োজনীয় তথ্যটুকু ঘটনার তাৎপর্য অনুসারে নির্বাচন করে থাকেন, ঠিক তেমনি সংঘটিত ঘটনার কারণ ও ফলাফলের অজস্র ক্রমের মধ্য থেকে তিনি শুধু সেগুলোই নির্বাচন করেন যেগুলো তার নিকট গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। আবার কারণগুলির প্রতি কোনো ঐতিহাসিকের গুরুত্ব আরোপের মান নির্ভর করবে সেগুলোকে যৌক্তিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে

খাপ খাইয়ে নেওয়ার মধ্যে। অন্যান্য কার্যকারণ-পরস্পরাকে আপতন (Chance) বলে বাতিল করতে হয়, কেননা তাদের কার্যকারণের সম্পর্কই যে শুধু পৃথক তা নয়, পরস্পরাটিও অপ্রাসঙ্গিক। এখানে ঐতিহাসিকের করার কিছু থাকে না। যৌক্তিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সাথে এদের কোনোভাবেই সংশ্লিষ্ট করা যায় না বা মেলানো যায় না এবং অতীত ও বর্তমানের ক্ষেত্রে তা অর্থবহও নয়, বরং অপ্রাসঙ্গিক। ক্লিওপাত্রার নাকের সৌন্দর্য, লেনিনের অকাল মৃত্যু প্রভৃতির কিছু না কিছু ফল ছিল। কিন্তু এর থেকে যদি ধরে নেওয়া হয় যে সুন্দরীর প্রতি মোহাচ্ছন্নের জন্য সেনাপতিদের সামরিক পরাজয় ঘটে তবে তা অর্থহীন হয়ে পড়বে। ঠিক তেমনি ১৯২০-এর দশকে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে যে সব সংঘাত হয়েছিল তার কারণ হলো,

যুক্তিগ্রাহ্য কারণগুলো দেশ, কাল ও অবস্থান ভেদে প্রযোজ্য হতে পারে বলে সেগুলিকে শেষ অবধি ফলদায়ী সাধারণীকরণের দিকে নিয়ে যাওয়া যায় এবং সেগুলো থেকে শিক্ষাও পাওয়া যায়। অপততিক কারণ গুলোর কোনো সাধারণীকরণ করা যায় না। আর যেহেতু সব অর্থেই সেগুলো অনন্য তাই শেষ পর্যন্ত সেগুলো থেকে না পাওয়া যায় কোন শিক্ষা, না পৌঁছানো যায় কোনো সিদ্ধান্তে।

শিল্পায়নের হার বা শহরের লোকদের খাদ্য সরবরাহের জন্য আরও বেশি শস্য উৎপাদন করতে কৃষকদের উৎসাহিত করার সেরা উপায় ইত্যাদি নিয়ে আলাপ আলোচনা বা মতানৈক্য, বা এমনকি প্রতিদ্বন্দী নেতাদের মধ্যে তীব্র ক্ষমতার লড়াই ও তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা। এইসব কারণ নিয়ে তখনকার ঘটনা ব্যাখ্যাকরলে সে বক্তব্যকে যুক্তযুক্ত ও ঐতিহাসিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এগুলিই ছিল আসল কারণ এবং অন্য ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতেও এগুলি প্রয়োগ করা যেতে পারে। অতএব লেনিন-এর অকালমৃত্যু এই আপততিক ঘটনাটি কারণ নয়। এটিকে রাশিয়ার দক্ষমুখর সংগ্রামের কারণ বললে ভুল ব্যাখ্যা হবে। এক্ষেত্রে হেগেলের সেই বহু উদ্ধৃত বাণীটির কথা বলা যায় : ‘যা কিছু যৌক্তিক তা-ই বাস্তব এবং যা কিছু বাস্তব, তা-ই যৌক্তিক’। বাণীটি উদ্ধৃত হয়েছে বহুবার এবং ভুল বোঝাও হয়েছে বহুবার।

ইতিহাসের কারণগুলি খুঁজতে গিয়ে ঐতিহাসিক যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ও আপততিক কারণের মধ্যে পার্থক্য করেন। যুক্তিগ্রাহ্য কারণগুলো দেশ, কাল ও অবস্থা-ভেদে প্রযোজ্য হতে পারে বলে সেগুলিকে শেষ অবধি ফলদায়ী সাধারণীকরণের দিকে নিয়ে যাওয়া যায় এবং সেগুলো থেকে শিক্ষাও পাওয়া যায়। সেগুলো তাই আমাদের বোধ বিস্মৃত ও গভীর করার উদ্দেশ্যে কাজে লাগে। অন্যদিকে আপততিক কারণগুলোর কোনো সাধারণীকরণ করা যায় না, আর যেহেতু সব অর্থেই সেগুলো অনন্য তাই শেষপর্যন্ত সেগুলো থেকে না পাওয়া যায় কোনো শিক্ষা, না পৌঁছানো যায় কোনো সিদ্ধান্তে। উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখার ধারণাটি থেকেই ইতিহাসে কার্যকারণ নির্ণয়ে আমাদের পর্যালোচনার চাবিকাঠিটি পাওয়া যায়। এর সঙ্গে আবার মূল্যায়নের প্রশ্নটিও অবধারিতভাবেই জড়িয়ে আছে। ইতিহাসের ব্যাখ্যান, বিশ্লেষণ সর্বদাই মূল্যায়নের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, আর ব্যাখ্যানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কার্যকারণ নির্ণয়। এইখানেই ইতিহাসের দ্বৈত তথা পরস্পর-নির্ভর ভূমিকাটির কথা চলে আসে। আর এই ভূমিকাটি হলো, বর্তমানের আলোয় অতীতকে তথা অতীতের আলোয় বর্তমানকে আরও ভালো করে বুঝতে সাহায্য করা। যা কিছু এই দ্বৈত উদ্দেশ্য সাধনে সহায় হতে পারে না, যেমন ক্লিওপাত্রার নাকের সৌন্দর্যের প্রতি অ্যান্টনির মোহ, ঐতিহাসিকের চোখে তা-ই মৃত ও নিষ্ফল। তবে অতীত ও বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যতেরও সম্পর্ক রয়েছে। ঐতিহ্যকে এক হাত থেকে অন্য হাতে তুলে দিয়েই ইতিহাসের সূচনা। আর ঐতিহ্য বলতে বোঝায় অতীতের অভ্যাসে ও শিক্ষা ভবিষ্যতে বয়ে নিয়ে যাওয়া। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুবিধার জন্যই শুরু হয়েছিল অতীতে

বিবরণ রেখে যাওয়ার কাজ। ‘ঐতিহাসিক চিন্তা’, ওলন্দাজ ঐতিহাসিক হুইৎসিঙ্গা বলেছেন, ‘সর্বদাই পরিণতিমূলক’। সার চার্লস স্নো রাদারফোর্ড সম্বন্ধে লিখেছেন যে ‘সব বিজ্ঞানীর মতোই... তাঁরও মজ্জায় ছিল ভবিষ্যৎ, যদিও এর অর্থ নিয়ে তিনি মাথাই ঘামাতেন না।’ তেমনি ভাল ঐতিহাসিকদের মজ্জায় থাকে ভবিষ্যৎ, সে নিয়ে তাঁরা ভাবুন আর নাই ভাবুন। ‘কেন?’ এই প্রশ্নটি ছাড়াও ঐতিহাসিক প্রশ্ন করেন ‘কোন্ দিকে?’

প্রশ্ন

- ১। ট্যালকট পারশনস-এর মতে ইতিহাস কি?
- ২। ঐতিহাসিক কিভাবে যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ও আপাতিক কারণের মধ্যে পার্থক্য করেন?

১.১.৩.১.৬ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

- ১। E.H. Carr—What is History?
- ২। অমলেশ ত্রিপাঠী—ইতিহাস ও ঐতিহাসিক
- ৩। E. Sreedharan—A Textbook of Historiography 500 BC to AD 2000
- ৪। মমতাজুর রহমান তরফদার—ইতিহাস ও ঐতিহাসিক
- ৫। এম. দেলওয়ার হোসেন—ইতিহাসতত্ত্ব

১.১.৩.১.৭ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

- ১। ‘ইতিহাসচর্চা হলো কারণের চর্চা’—তুমি কি এই মত সমর্থন কর?
- ২। যুক্তিগ্রাহ্য ইতিহাস রচনায় কার্যকারণের গুরুত্ব আলোচনা কর।
- ৩। ‘কার্যকারণের ইতিহাস’ বলতে কি বোঝায়? কয়েকটি উদাহরণসহ ইতিহাসে কার্যকারণের ভূমিকা আলোচনা কর।
- ৪। কার্যকারণের ইতিহাসে নির্ধারণবাদের ভূমিকা আলোচনা কর।
- ৫। কার্যকারণের ইতিহাসে আকস্মিকতাবাদের কোন গুরুত্ব আছে কি?

উপ-একক - ২

Historicism

১.১.৩.২.০ : উদ্দেশ্য

এই এককটির এই অধ্যায়টি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন :

- (১) ইতিহাসবাদ কথাটির অর্থ।
- (২) বিশ শতকে ইতিহাসবাদ নিয়ে আলোচনা, বিতর্ক।
- (৩) ইতিহাসবাদের গুরুত্ব।

১.১.৩.২.১ : 'ইতিহাসবাদ' কথাটার অর্থ

'ইতিহাসবাদ' কথাটির আভিধানিক অর্থ ধরলে যা বোঝায় তা হল, ইতিহাসের নানা ঘটনা নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত হয় এই বিশ্বাস বা ধারণা। ইতিহাস যে নিয়মকে অস্বীকার করতে পারেনা এই তত্ত্বের উপর এখানে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। একই সঙ্গে এই তত্ত্বের আরও ব্যাখ্যা হল যে, ইতিহাসের বিভিন্ন যুগ স্বতন্ত্র এবং অনন্য। এর অর্থ হল প্রতিটি ঐতিহাসিক যুগের আলাদা মূল্য আছে যা অন্য যুগে আরোপ করা যায় না। এই তত্ত্ব অবশ্য এটাও স্বীকার করে নেয় যে বিভিন্ন যুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনাবলী ইতিহাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তবে 'ইতিহাসবাদ' নিয়ে বিশ শতকে ঐতিহাসিক বিতর্ক যত জোরদার হয়েছে ততই উপরিউক্ত সংজ্ঞার দুর্বলতা প্রকট হয়েছে।

'ইতিহাসবাদ' কথাটির আভিধানিক অর্থ হল ইতিহাসের নানা ঘটনা নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত হয় এই বিশ্বাস বা ধারণা। এই তত্ত্বের আরও ব্যাখ্যা হল যে, ইতিহাসের বিভিন্ন যুগ স্বতন্ত্র ও অনন্য।

প্রশ্ন

- ১। ইতিহাসবাদ কথাটির আভিধানিক অর্থ কি?
- ২। 'ইতিহাসবাদ' তত্ত্বের একটি ব্যাখ্যা দাও?

১.১.৩.২.২ : ইতিহাসবাদ নিয়ে চিন্তাভাবনা—বিশ শতকে ঐতিহাসিক বিতর্ক

'ইতিহাসবাদ' বিষয়ে অধ্যাপক পপার- এর নানা মূল্যবান লেখাগুলি দরুন শব্দটির নিদিষ্ট অর্থ লুপ্ত হয়ে গেছে। ১৯৩০-এর দশকে কার্ল পপারের 'দ্য লজিক অব সায়েন্টিফিক এনকোয়ারি' (The Logic of Scientific Enquiry) নামে বইটি প্রকাশিত হলে 'ইতিহাসবাদ' শব্দটির ব্যবহার সম্পর্কে নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। E.H. Carr সহ অনেক প্রথিতযশা ইতিহাসবিদ এই শব্দটির ব্যবহার সম্পর্কে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন

করেন। এমনকি কার নিজেও স্বীকার করেন যে, এই শব্দের সংজ্ঞার্থের ব্যাপারে সর্বক্ষণ জিদ ধরাটা নেহাতই পণ্ডিতপনা। কার্ল পপার পরে আরও দুই বই লেখেন। এই বইগুলো মূলতঃ মার্কসবাদ-বিরোধিতার ভিত্তির উপর

অধ্যাপক পপার এর নানা মূল্যবান লেখাগুলির দরুণ 'ইতিহাসবাদ' শব্দটির ব্যবহার করেছেন। তিনি ইতিহাসবাদ এর সঙ্গে ঐতিহাসিকতা'র তফাৎ করেন। M.C. Darcy তার 'ইতিহাসবোধ : ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মীয়' (১৯৫৯ পৃষ্ঠা ১১) 'ইতিহাসবাদ' শব্দটি ব্যবহার করলেন দর্শনের অভিন্নার্থক হিসাবে।

রচিত। ইতিহাস সম্বন্ধে যে সব মত অধ্যাপক পপার-এর অপছন্দ, তার সবগুলোকেই একযোগে ধরার জন্য তিনি 'ইতিহাসবাদ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। পপার তাঁর 'ইতিহাসের দৈন্য' (The Poverty of Historicism) গ্রন্থে স্বীকার করেছেন যে তিনি এমন সব 'ইতিহাসবাদী' যুক্তি আবিষ্কার করেছেন, যা কোনো জানা 'ইতিহাসবাদী' কখনও ব্যবহার করেননি। কোনো

কোনো মতবাদে বিজ্ঞানের সঙ্গে ইতিহাসকে মিলিয়ে দেওয়া হয়, কোথাও আবার এ দুটিকে করা হয় সম্পূর্ণ আলাদা। অধ্যাপক পপার-এর রচনায় এই দুই মতবাদই 'ইতিহাসবাদের' আওতায় পড়ে। পপার মনে করতেন হেগেলের এবং মার্কসের ইতিহাসদ্বন্দ প্রকৃতিগতভাবে নির্ধারণবাদী। হেগেলের বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে পপার তাঁর গ্রন্থগুলি রচনা করেন। হেগেল ও মার্কস ছিলেন পপারের আক্রমণের মূল লক্ষ্য। 'ইতিহাসবাদ' এই নাম দিয়ে এঁদের দুজনকে পপার সমপর্যায়ভুক্ত করেন। ভবিষ্যৎ কথনের ব্যাপারটা হেগেল এড়িয়ে গিয়েছিলেন। পপারের 'ইতিহাসবাদের দৈন্য'-র ভূমিকায় ইতিহাসবাদকে বর্ণনা করা হয়েছে এই বলে যে, এ হলো 'সমাজবিজ্ঞানগুলির এমন এক পরিমার্গ, যাতে ধরে নেওয়া যায় যে, ঐতিহাসিক ভবিষ্যৎ কথনই তাদের মূল লক্ষ্য।'

পপারের রচনাগুলির পূর্বে 'ইতিহাসবাদ' (Historicism) শব্দটি সাধারণতঃ ব্যবহার করা হতো জার্মান 'হিস্টোরিসমুস' শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হিসাবে। অধ্যাপক পপার 'ইতিহাসবাদ'(Historicism)-এর সঙ্গে 'ঐতিহাসিকতা'(Historicism)-র তফাৎ করলেন। E.H.Carr এই প্রসঙ্গে বলেন যে, এভাবে শব্দটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল, তাতে পপার যোগ করলেন আরও খানিকটা বিভ্রান্তির উপাদান। ১৯৫৯ সালে অর্থাৎ এর পরবর্তী সময়ে এম.সি ডার্সি তাঁর গ্রন্থ 'ইতিহাসবোধ : ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মীয়' (দ্য সেন্স অফ হিসট্রি : সেকুলার এ্যাণ্ড সেক্রেড), (১৯৫৯, পৃষ্ঠা ১১) 'ইতিহাসবাদ' শব্দটি ব্যবহার করলেন 'ইতিহাসের দর্শনের অভিন্নার্থক' হিসেবে।

ইতিহাসের 'কার্যকারণ' আলোচনাপ্রসঙ্গে নির্ধারণবাদের ভূমিকার কথা সবিস্থারে বলা হয়েছে। এই নির্ধারণবাদ, কথটির অর্থ হল, এমন কোনো বিশ্বাস যে, যা কিছু ঘটছে তার সবেই একবা একাধিক কারণ আছে এবং সেই কারণ বা কারণগুলি যদি অন্যরকম না হতো কহলে এর চেয়ে আলাদা কিছুই হতে পারতো না। অর্থাৎ নির্ধারণবাদের মানে হল, তথ্যগুলো একই থাকলে, যা ঘটবেই, কিছুতেই এর অন্যথা হতে পারে না। অন্যরকম ঘটতে পারে বলে মনে করার অর্থ শুধু এই যে তথ্যগুলো আলাদা হলে তবেই অন্যরকম কিছু হতো।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির ধারণাটি বা ইতিহাসের অতীতের সঙ্গে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্পর্কটি 'ইতিহাসবাদের' ধারণা থেকেই উদ্ভূত বলে মনে হয়। কারণ এই ধারণা থেকেই মনে কার হয় যে, অতীত কখনও লুপ্ত হয়না, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় অতীত ফিরে আসে।

প্রশ্ন

- ১। পপারের রচনার পূর্বে ইতিহাসবাদ শব্দটি কোন শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হত?
- ২। পপারের আক্রমণের মূল লক্ষ্যে কারা ছিলেন?

১.১.৩.২.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

- ১। কাকে বলে ইতিহাস?
What is History?—E. H. Carr
- ২। R.G. Collingwood—The Idea of History.
- ৩। অমলেশ ত্রিপাঠী—ইতিহাস ও ঐতিহাসিক।
- ৪। কার্ল পপার—The Poverty of Historicism.
- ৫। ইতিহাসতত্ত্ব—এম. দেলওয়ার হোসেন।
- ৬। এফ. স্টার্ন (সম্পাদিত)—Varieties of History.
- ৭। ইতিহাস ও ঐতিহাসিক—মমতাজুর রহমান তরফদার।

১.১.৩.২.৪ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

- ১। ‘ইতিহাসবাদ’ শব্দের অর্থ কি? বিশ শতকে ‘ইতিহাসবাদ’ সম্পর্কে যে বিতর্ক ও সমস্যা দেখা গিয়েছিল তা তুলে ধর।
- ২। ‘ইতিহাসবাদ’ সম্পর্কে কার্ল পপার-এর বক্তব্য আলোচনা কর।

পর্যায় গ্রন্থ - ২

একক ৪

Objectivity of History

বিন্যাসক্রম :

- ১.২.৪.০ : উদ্দেশ্য
- ১.২.৪.১ : নৈব্যক্তিক ইতিহাসচর্চার মূল বিষয়বস্তু
- ১.২.৪.২ : নৈব্যক্তিক ইতিহাসচর্চার সমস্যা
- ১.২.৪.৩ : উপসংহার
- ১.২.৪.৪ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী
- ১.২.৪.৫ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১.২.৪.০ : উদ্দেশ্য

- এই অধ্যায়টি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন :
- (১) নৈব্যক্তিক ইতিহাসচর্চার মূল বিষয়বস্তু কি?
 - (২) নৈব্যক্তিক ইতিহাসচর্চার সমস্যা কি কি?
 - (৩) ইতিহাস চর্চায় ব্যাখ্যার দিকগুলি কতটা প্রয়োজনীয়?

১.২.৪.১ : নৈব্যক্তিক ইতিহাসচর্চার মূল বিষয়বস্তু

তথ্যের ভিত্তিতে সমাজবদ্ধ মানুষের অতীত জীবনচর্চাই হল ইতিহাস। এই অতীত জীবনের চর্চার কাজটি করেন ঐতিহাসিক। কিন্তু সেক্ষেত্রে তাঁকে তথ্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। নৈব্যক্তিক ইতিহাসচর্চার মূল বিষয়বস্তু হল তথ্যের ভিত্তিতে অতীত সমাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ প্রদান করা। সেক্ষেত্রে কোনরূপ ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণের বিষয়টি গুরুত্ব পায় না। এই ধরনের ইতিহাস চর্চার পদ্ধতি হল তথ্যের কঠোর উপস্থাপনা। জার্মান ঐতিহাসিক র্যাঙ্কের মতে, ঐতিহাসিকের কর্তব্য হল আসলে যা ছিল তাই দেখানো। এক্ষেত্রে তথ্যসূত্রগুলি কঠোর বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেগুলি প্রামাণ্য তথ্য কিনা যাচাই করে নিতে হবে। অতঃপর সেগুলির উপস্থাপনা করাই হবে ঐতিহাসিকের কাজ।

তথ্য উপস্থাপনায় ঐতিহাসিকের ভূমিকা হতে হবে নিরপেক্ষ, কোনরূপ ব্যক্তিগত আবেগ বা চিন্তাধারার প্রভাব ইতিহাস রচনার ওপর পড়লে সেই ইতিহাস আর অবিকৃত থাকবে না, এবং যথাযথ উপস্থাপনা করা যাবে না। এই ধারণা অনুসারে তথ্যগ্রহণের প্রক্রিয়াটি ঐতিহাসিকের চেতনা নিরপেক্ষ। তথ্য গ্রহণের পর ঐতিহাসিককে সেটির বিষয়ে ক্রিয়াশীল হতে হয়। এক্ষেত্রে কোনওরকম কল্পনা বা অনুমান সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বাণভট্টের হর্ষচরিতে হর্ষবর্ধন দ্বারা শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতির বিবরণ পাওয়া গেলেও, যুদ্ধের কোনও বর্ণনা পাওয়া যায় না। আবার অন্য তথ্যসূত্র থেকে আমরা শশাঙ্ককে গৌড়ের সিংহাসনে অসীন রূপে পাওয়া যায়। কিন্তু কোনও সূত্রেই হর্ষবর্ধন ও শশাঙ্কের প্রত্যক্ষ যুদ্ধের বিবরণ বা ফলাফল পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে নৈব্যক্তিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে যে বিষয়ের ওপর তথ্য পাওয়া যায়নি সেই বিষয়ের ওপর ঐতিহাসিক নীরব থাকবেন। এক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক প্রমাণের ভিত্তিতে যদি তিনি এই সিদ্ধান্ত নেন যে যুদ্ধযাত্রার বিবরণ থাকা সত্ত্বেও সভাকবির বিবরণে বিজয়ের উল্লেখ না থাকা হর্ষবর্ধনের চূড়ান্ত সামরিক বিপর্যয় ও মর্যাদাহানির ঘটনাকে লুকিয়ে যাওয়ার প্রয়াস, তাহলে নৈব্যক্তিক ইতিহাসচর্চাকারী দের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। তারা কেবল প্রমাণিত তথ্যকেই গুরুত্ব দেবেন। কেবলমাত্র পরীক্ষিত তথ্য হবে গ্রহণযোগ্য। সেই তথ্য পরপর সাজিয়ে উপস্থাপনাই হবে ঐতিহাসিকের একমাত্র কাজ। তাঁর নিজস্ব বিশ্লেষণ ও চিন্তাসম্বন্ধিত ব্যাখ্যা ইতিহাস রচনায় প্রবেশ করলে তা পাঠকদের প্রভাবিত করতে পারে।

এই ধরনের ইতিহাসচর্চা আধুনিক ইতিহাস রচনার এক নবযুগের সূচনা করলেও এর কিছু মূলগত সমস্যা থেকে যায়। যার ফলে বাস্তব প্রয়োগে এই ধারণার সম্পূর্ণ প্রয়োগ সম্ভব নয়। তাছাড়া কেবলমাত্র ঘটনার বর্ণনায় সমাজবদ্ধ মানুষের অতীত জীবন ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়।

১.২.৪.২ : নৈব্যক্তিক ইতিহাসচর্চার সমস্যা

নৈব্যক্তিক ইতিহাসচর্চা সর্বদা বিশ্লেষণের ওপর গুরুত্ব না দিয়ে তথ্যের পর্যায়ক্রমিক উপস্থাপনাকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করে। কিন্তু তথ্য বলতে আমরা যা বুঝি সেগুলি কখনই সম্পূর্ণ অবিকৃত থাকতে পারে না। পাশাপাশি এই বিষয়টিও স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে ঐতিহাসিক বহু তথ্যসূত্রের মধ্যে তাঁর আলোচ্য বিষয়ের প্রয়োজনে প্রাসঙ্গিক অংশটুকু বেছে নেন, আলোচ্য বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে সেটি হয় Historical evidence। তাই এক্ষেত্রে তথ্যপ্রমাণের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় ঐতিহাসিকের কাছে সেটির প্রাসঙ্গিকতা পাওয়া।

যে-কোনো সাধারণ মানুষের গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হওয়া আর সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ দুটিকেই অতীতের তথ্য বলে মনে হলেও সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ ঐতিহাসিকের কাছে ইতিহাসের তথ্যরূপে বেশি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। এই গ্রহণ বা বর্জনের কাজটি করেন ঐতিহাসিক। সুতরাং object তথ্য অপেক্ষা subject ঐতিহাসিক বেশি গুরুত্ব পান। যেহেতু ইতিহাসের তথ্য কখনই অবিকৃত থাকতে পারে না তাই সেক্ষেত্রে ইতিহাসে বর্ণিত তথ্য অপেক্ষা ঐতিহাসিকই আমাদের কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত। এইভাবে আমরা সমাধান করতে পারি যে সভাকবি হবার কারণে বাণভট্ট হর্ষবর্ধনের পরাজয় স্বীকার করতে অপারগ ছিলেন।

পাশাপাশি তথ্য সংগ্রহের সময় ঐতিহাসিকের মতই প্রাধান্য পায়। কার্ল বেকারের মতে, ‘ঐতিহাসিকের জন্য ইতিহাসের কোনও তথ্য থাকে না যতক্ষণ না তিনি সেগুলি তৈরি করেন।’ কেবলমাত্র তথ্য সংগ্রহ আর তার উপস্থাপনা করলেই মানুষের অতীত জীবনচর্চার সম্পূর্ণ যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। সেই কারণে R.G. Collingwood, মনে করেন, “History is the revival and reenactment of the past experience in the mind of the historian.”

সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ ভারত অভিযান করেন এবং সেই বিজিত রাজ্যগুলিকে ‘গ্রহণ মোক্ষ অনুগ্রহ’ দ্বারা সেই শাসকদের হাতে ফিরিয়ে দেন, অথবা অশোক যুদ্ধনীতি ত্যাগ করে ধর্মনীতি গ্রহণ করেন। এই ঘটনাগুলির তাৎপর্য অনুধাবন করতে হলে কেবলমাত্র তথ্যগুলির বিবরণ দিলেই ইতিহাসের সম্পূর্ণতা প্রকাশ পাবে না। বরং ঐতিহাসিক যদি যুক্তিগ্রাহ্য, নিজ অভিজ্ঞতাপ্রসূত বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই দুটি ঘটনার পাশ্চাতে শাসনতান্ত্রিক সুবিধা বা রাজ্যশাসনের সহায়ক নীতির প্রসঙ্গটি উপস্থাপনা করেন, তবে বিষয়টি অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হবে।

১.২.৪.৩ : উপসংহার

তবে এক্ষেত্রেও বলা উচিত যে ঐতিহাসিকের প্রতি গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে Subjective History-র অবতারণার অর্থ এই হওয়া উচিত নয় যে ঐতিহাসিক যাই উপস্থাপনা করবেন তাই ইতিহাস। ঐতিহাসিক সত্য প্রতিষ্ঠায় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ভূমিকা অপরিহার্য। বিভিন্ন ব্যাখ্যা ইতিহাসের ক্ষেত্রে জীবনীশক্তির ন্যায় কাজ করে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিককে যেমন তথ্যের যথার্থতার দিকে নজর রাখতে হবে, তেমনি যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেটিকে উপস্থাপিত করতে হবে। তবেই ইতিহাস রচনা সফল হবে।

১.২.৪.৪ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

- ১। What is History? — E.H. Carr
- ২। কাকে বলে ইতিহাস?—ই. এইচ কার
- ৩। ইতিহাস তত্ত্ব—এম দিলওয়ার হোসেন।
- ৪। ইতিহাস ও সাহিত্য—অশীন দাশগুপ্ত।

১.২.৪.৫ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

- ১। নৈব্যক্তিক ইতিহাসচর্চার মূল বিষয়বস্তু কি?
- ২। Objective ও Subjective ইতিহাসচর্চার মধ্যে কোনটি বেশি যুক্তিগ্রাহ্য?

একক - ৫

Natural Sciences, Applied Sciences and Literature

বিন্যাসক্রম :

- ১.২.৫.০ : উদ্দেশ্য
- ১.২.৫.১ : ইতিহাস ও সাহিত্য
- ১.২.৫.২ : ইতিহাস ও বিজ্ঞান
- ১.২.৫.৩ : উপসংহার
- ১.২.৫.৪ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী
- ১.২.৫.৫ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১.২.৫.০ : উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন :

- (১) ইতিহাস ও সাহিত্যের মধ্যে সম্পর্ক
- (২) ইতিহাস ও বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক
 - (ক) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিজ্ঞান
 - (খ) ইতিহাস ও বিজ্ঞানের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য
- (৩) ইতিহাস ও বিজ্ঞানের সম্পর্কের গুরুত্ব।

১.২.৫.১ : ইতিহাস ও সাহিত্য

ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক এই দুই ধরনের মানুষই ঘটনার দর্শক। তবে ঐতিহাসিক বাইরে থেকে ঘটনার বর্ণনা দেন আর সাহিত্যিক ঘটনার ভিতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করেন এবং এই অধিকার তার আছে। জীবনের অভ্যন্তরীণ সত্য উপলব্ধি করার চেষ্টা একমাত্র সাহিত্যেই সম্ভব। তবে ঐতিহাসিকদের তাদের কাজে সাহিত্যকে দরকার। ঐতিহাসিক সাহিত্যকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করতে পারেন না। আবার সাহিত্যিকের ঐতিহাসিক ঘটনার মাল-মশলা পাওয়ার জন্য ইতিহাসের দ্বারপ্রান্তে আসতে হয়। অনেক প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্বীকার করেছেন যে ইতিহাসচর্চায় মানসিকতা (Mentality) ও মেজাজের বিশ্লেষণ একটি প্রধান চেষ্টা। মানুষের মন ঠিকমত বুঝতে না পারলে ঘটনাকে ঠিকমত বোঝা যায় না। ইতিহাস যে বিজ্ঞান এই মত যেমন সুবিদিত ও সমাদৃত, ঠিক তেমনি

ইতিহাস যে সাহিত্যও বটে এ বিজ্ঞব্যাকেও উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। এই দুই বোধই বর্তমানের ইতিহাসচর্চায় লক্ষ্য করা যায়। তাই ঐতিহাসিকদের চেষ্টা ও সাহিত্যিকের সাধনার কোথায় সাদৃশ্য এবং কোথায় বৈসাদৃশ্য সেই সমস্যাটি উপলব্ধি করার বিশেষ দরকার আছে।

ইতিহাসের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক যে দিন দিন নিবিড় হচ্ছে তা সকলেরই প্রায় জানা। ইতিহাস নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে গেলেও ঐতিহাসিককে দার্শনিক হতে হবে। ইতিহাস আবার বৃহদিন ধরেই সাহিত্যের একটি অংশ হিসেবে চলে আসছে। সেজন্য ইতিহাসের ছাত্র, গবেষক ও ঐতিহাসিককে জ্ঞানের এই সব শাখার সঙ্গে নিজের কাজ তুলনা করে দেখতে হয়। তবেই একদিন ইতিহাসচর্চা যেমন সুস্পষ্ট হবে, ঐতিহাসিকও তার কাজে সার্থক হবেন।

এখন প্রশ্ন হল, ইতিহাস কী? বা ইতিহাস কাকে বলে? সমাজবদ্ধ মানুষের অতীত আশ্রয়ী ও তথ্যনিষ্ঠ জীবনব্যাপ্যই ইতিহাস। অর্থাৎ একক মানুষকে নিয়ে ইতিহাস মাথা ঘামায় না। একক মানুষের অস্তিত্ব থাকলেও যেহেতু ইতিহাসের কারবার সমাজবদ্ধ মানুষকে নিয়ে সেহেতু মানুষ সামাজিক হলেই কেবল ইতিহাস তার কথা ভাবে। আবার সামাজিক মানুষ যখন জীবনে একেবারে নিঃসঙ্গ তখন সে ইতিহাসের বাইরে থাকে। রিচার্ড কব (Richard Cobb) বলেছেন, ইতিহাস বিশেষ মানুষকে নিয়ে; তুলনায় বড়ো কাঠামো, বিশাল আন্দোলন এগুলি অনেকটাই মনগড়া কথা। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্ত তাঁর 'ইতিহাস ও সাহিত্য' গ্রন্থে মন্তব্য করেন, ঐতিহাসিকের বক্তব্য যদি বিশেষ মানুষকে ছাড়িয়ে না ওঠে তাহলে সে বক্তব্য ইতিহাস হয় না। অবশ্য কোনো ঐতিহাসিকের পক্ষেই কাঠামো বস্তুটাকে এড়ানো সম্ভব নয়। বিশেষ মানুষগুলি স্থান ও কালের কাঠামোতেই ধরা থাকে। ঐতিহাসিক পরিবর্তনের দিশারী। বিশিষ্ট চরিত্রগুলি সাধারণ পরিবর্তনের স্রোতে কেমন করে পাল্টে যায় সেটা লক্ষ্য করা তাঁর কাজ। একদিকে জনসমষ্টির উপর জোর দিয়ে, বিশেষ মানুষগুলিকে বাদ দিয়ে সমাজবিজ্ঞান ইতিহাসকে নৈর্ব্যক্তিক সত্যের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, আবার অন্যদিকে ইতিহাসের মধ্যেই সাহিত্যের বিশাল আকর্ষণ ঐতিহাসিককে শুধু যে মানবচর্চায় ধরে রাখছে তাই নয়, বিশেষ মানুষ, একলা মানুষের খোঁজে কিছুটা বিপথেও টানছে। তবে ইতিহাস কখনই একলা মানুষের জন্য নয়, সমাজবদ্ধ মানুষের জন্য।

আবার ইতিহাস ও সাহিত্য উভয়েরই কাজ-কারবার মানুষকে নিয়ে। কিন্তু একক মানুষের জন্য ইতিহাস নেই। কিন্তু এই একলা মানুষটির হয়ে কথা বলার জন্য আছে সাহিত্য, ব্যক্তিমানুষের মূল্য থাকলেও ইতিহাস কিন্তু নেই। একজন ঐতিহাসিক একজন মানুষের মানসপ্রতিমা তৈরি করতে পারেন না। ঐতিহাসিকের পক্ষে এই না পারাটা অক্ষমতা বা অন্যায্য নয়। আসলে এ কাজ ইতিহাস পরিপন্থী। এ কাজ হল সাহিত্যিকের। একজন সাহিত্যিক একজন ব্যক্তির মানবপ্রতিমা নির্মাণ করতে পারেন। তার মধ্য দিয়ে অতীতকে অতিক্রম করে বর্তমান হয়ে ভবিষ্যতের সঙ্গে সেতু তৈরি করতে পারেন। কিন্তু ঐতিহাসিকের পক্ষে এই না পারাটা অক্ষমতা বা অন্যায্য নয়।

ইতিহাস অতীত নিয়ে কারবার করলেও ইতিহাসের অতীত কী বস্তু সে সম্পর্কে সদাসর্বদা ঐতিহাসিককে সতর্ক থাকতে হবে। সাহিত্যিক অতীতের যে কোনো ঘটনাকে তার সাহিত্যের বিষয়বস্তু বা লেখার বস্তু করতে পারেন। কিন্তু অতীত ও ইতিহাসের অতীত এক নয়। ইতিহাসের অতীত সভ্য ও সমাজবদ্ধ মানুষের অতীত। সেজন্য অতীতের সে সামান্য অংশ। অন্যদিকে সাধারণ অতীত প্রতি মুহূর্তের সৃষ্টি। গতকালও এখন অতীত, বিগত

মুহূর্তও এই মুহূর্তে অতীত। অবশ্য ঐতিহাসিক অতীতের এই দিককার সীমা কোথায় টানবেন তা নিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যেই বিতর্ক রয়েছে। তবে ইতিহাস রচনায় ঐতিহাসিককে হতে হয় নির্মোহ বিচারক। ইতিহাসের বিচার নিরপেক্ষ ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

তবে অতীতকে অগ্রাহ্য করে কি সাহিত্যিক, কি দার্শনিক তাদের কাজ করতে পারেন। কিন্তু ঐতিহাসিকের সেই স্বাধীনতা নেই। তবে অতীত-আশ্রয়ী ইতিহাস কেমন করে ঐতিহাসিক অনুসন্ধান করবেন এ ব্যাপারে কিন্তু তিনি স্বাধীন। ইতিহাস তথ্যনিষ্ঠ বলেই ঐতিহাসিক বর্তমানের কোন প্রশ্ন মনে রেখে অতীতকে খোঁজ করতে পারেন। কিন্তু সেই প্রশ্নেই উত্তর কী হবে সে ব্যাপারে ঐতিহাসিকের কোন স্বাধীনতা প্রায় নেই বললেই চলে। এখানেই ইতিহাসের সবচাইতে বড় জোর যে ইতিহাস তথ্যনিষ্ঠ। তথ্যের বাইরে এক্তিয়ার ঐতিহাসিকের নেই। কিন্তু তথ্য আবিষ্কার ও তথ্য নির্বাচন করেই ইতিহাস ফুরিয়ে যায় না। তথ্য উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক সমাজবদ্ধ মানুষের জীবন ব্যাখ্যা করেন। এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মধ্যে দুটি দিক থাকে। একটি যুক্তির দিক, অন্যটি কল্পনার। দৃঢ় যুক্তির মধ্যে ঐতিহাসিক যখন নির্বাচিত তথ্যগুলিকে সাজান, তখন তিনি মেজাজে বৈজ্ঞানিক। কিন্তু যেহেতু তাঁর তথ্য সামান্য এবং জীবন ব্যাখ্যা দুঃসাধ্য কাজ সেজন্য নিজস্ব সহানুভূতিতে কিছুটা কল্পনা ঐতিহাসিক করে থাকেন। সেখানে ঐতিহাসিক হলেন সাহিত্যিক। কিন্তু সে কল্পনা সীমিত। কারণ মহৎ ঐতিহাসিকের কল্পনার অনুমানের কোন স্থান বা অধিকার নেই।

ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক এই দুই ধরনের মানুষই ঘটনার দর্শন। ঐতিহাসিক বাইরে থেকে ঘটনার বর্ণনা দেন আর সাহিত্যিক ঘটনার ভিতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করেন। ঐতিহাসিক সমাজবদ্ধ মানুষের জীবন দুটি যুক্তি থেকে ব্যাখ্যা করেন—একটি যুক্তির দিক, অন্যটি কল্পনার। যুক্তির মধ্যে দিয়ে তথ্যগুলির সাজালে তিনি বৈজ্ঞানিক। কিন্তু যেহেতু তাঁর তথ্য সামান্য এবং জীবন ব্যাখ্যা দুঃসাধ্য কাজ সেজন্য নিজস্ব সহানুভূতির কিছুটা কল্পনা ঐতিহাসিক করে থাকেন। সেখানে ঐতিহাসিক হলেন সাহিত্যিক। ইদানীং ইতিহাসে সাহিত্যের প্রভাব বাড়ছে। কিছুদিন হল ঐতিহাসিকের প্রশ্ন ইতিহাসকে মানুষের মন ও অনুভূতির দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। সময় সচেতনতা ও পরিবর্তনের ব্যাখ্যা ইতিহাসের উপজীব্য। সাহিত্য অন্য এক অনন্ত জীবনের আভাস আনতে সক্ষম ইতিহাস সেই জীবনে আবাস্তর।

এটি একমাত্র কবি বা সাহিত্যিকেরই আছে। তবে হেরোডোটাস থেকে ঐতিহাসিক পরম্পরায় কল্পনার বা অনুমানভিত্তিক ইতিহাস রচনার প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে গর্জে উঠেছিলেন উনিশ শতকের প্রথমে করা গেছে। এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে গর্জে উঠেছিলেন উনিশ শতকের প্রথমে প্রবাদপ্রতিম জার্মান ঐতিহাসিক র্যাঙ্কে। এর ফলেই কল্পনাশ্রিত বা অনুমানভিত্তিক ইতিহাসের পরিবর্তে ক্রমে নির্ভরযোগ্য ও বিজ্ঞানধর্মী ইতিহাসের আবির্ভাব ঘটেছিল। তবুও ইতিহাসের তথ্যে যে অসঙ্গতি আছে এ কথা আজ স্বীকৃত। ঐতিহাসিকের জীবন ব্যাখ্যার যে কল্পনা কাজ করে এই বক্তব্যও অনস্বীকার্য। শুধু ইতিহাসের কল্পনা এবং সাহিত্যের কল্পনা একজাতীয় নয়। ইতিহাস শেষপর্যন্ত ঘটনার মধ্যে থাকে। ঐতিহাসিক শেষ বিচারে দর্শক। কিন্তু সাহিত্য জীবনের অভ্যন্তরীণ সত্য তুলে ধরে। এ কারণেই সাহিত্যিক স্রষ্টা। ঈশ্বরের মতই অদৃশ্য হওয়ার ক্ষমতা তাঁর আছে।

ইতিহাস উনিশ শতকে বেশি করে বিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকে ছিল, কিন্তু ইদানিং ইতিহাসে সাহিত্যের প্রভাব বাড়ছে কিছুদিন হল ঐতিহাসিকের প্রশ্ন ইতিহাসকে মানুষের মন ও অনুভূতির দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। এর আভাস পাওয়া যায় প্রখ্যাত ঐতিহাসিক থিওডোর জেলডিনের ফরাসী দেশের উপর লিখিত বিশাল ইতিহাস। দুখণ্ডে রচিত গ্রন্থের শিরোনামে লেখা আছে : ‘উচ্চাশা, ভালোবাসা ও রাজনীতি’ এবং ‘বোধ, রুচি ও উৎকর্ষা’।

তবে একথা মনে রাখা প্রয়োজন, সাহিত্যের যে সত্যের প্রকাশ, ঐতিহাসিকের সে সত্য প্রকাশের ক্ষমতা বা অধিকার নেই। সাহিত্যিকের মত অবাধ বিচরণ ঐতিহাসিকের নেই। তবে ইদানীং ঐতিহাসিক যখন মানসিকতার সন্ধান করেছেন তখন সাহিত্যের সঙ্গে ইতিহাসের কোথায় মিল এবং কোনখানে পার্থক্য তাও ভাবা দরকার।

সাহিত্যিক যখন স্থির করেন যে তিনি ইতিহাসের পটভূমিকায় উপন্যাস রচনা করবেন তখন তাঁকে ইতিহাসের সাহায্য নিতে হয় এবং ইতিহাস বিশদভাবে পড়তে হয়। ঐতিহাসিক তথ্যের বিন্দুমাত্র অপলাপ না করে তিনি উপন্যাস রচনা করেন। অধিকাংশ সময়ে সেই কাহিনী হয় অপ্রাকৃত, নয় আধুনিক। ইতিহাসের তথ্যগুলি অলঙ্কার রূপেই থাকে। সেই তথ্য ঠিক না ভুল সেই নিয়ে আলোচনা চললেই সাহিত্যিকের লেখা ঐতিহাসিক উপন্যাসের তার বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্যে যে মেজাজ সাহিত্যিক তৈরি করেন, সে বস্তু উদ্ভট, নয় সাহিত্যিকেরই সমসাময়ি। তা সত্ত্বেও কিন্তু উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচিত হতে পারে। এ ধরনের ঐতিহাসিক উপন্যাস ইতিহাসের সার্থক কাহিনী বলেই স্বীকৃতি লাভ করে এবং অভিনন্দিত হয়। কারণ এই সব উপন্যাসে কাহিনীটিই পাঠককে ধরে রাখে, অতীতের তথ্যগুলি মঞ্চসজ্জা। জর্জ লুকাচ বা ই. এইচ-কারের মতো ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব এই ধরনের রচনাকে ঐতিহাসিক বলে স্বীকার করবেন না। লুকাচের মতে, বিগত যুগের পরিবেশ যখন উপন্যাসের বিশেষ চরিত্রগুলিকে তৈরি করে তখনই উপন্যাস ঐতিহাসিক উপন্যাস হয়ে ওঠে। এ ব্যাপারে অবশ্য একাধিক অসুবিধা আছে। যুগের পরিবেশ ব্যক্তিকে তৈরি করলেও অনেক সময় যুগের পরিবেশ ছাপিয়েও বিশেষ ব্যক্তির অস্তিত্ব থাকে। মনে রাখা দরকার, সমাজে, একই শ্রেণীতে, একই পরিবারে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের মানুষ থাকারই স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিক ঘটনাটির মর্মোদ্ধার সাহিত্য যেমনভাবে করতে পারে, ইতিহাস তা একেবারেই পারে না। অবশ্য একারণে ঐতিহাসিক ইতিহাসের কাঠামোকে অবহেলা করতে পারেন না।

ঐতিহাসিক মানসিকতার পরিবর্তন স্বীকার করেন, কিন্তু যেহেতু মানুষের মনের মধ্যে প্রবেশের অধিকার তাঁর নেই সেহেতু ঘটনার বর্ণনার মতন করে মানসিকতার পরিবর্তন ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা করতে পারেন, তার বেশি তিনি করতে পারেন না। এ কাজ একমাত্র করতে পারেন সাহিত্যিক। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, সব সাবেকী সমাজের মৃত্যু চিন্তা বস্তুটা জোরালো। কিন্তু মৃত্যুভয় বস্তুটা কী, মৃত্যুচিন্তায় পীড়িত সমাজে মানুষ ঠিক কী ভাবে, এই কথা বলার বা কল্পনার অধিকার ঐতিহাসিকের নেই। ইতিহাসকে অবলম্বন করে এবং সৃজনী কল্পনার সাহায্যে সেই কাজ করেন সাহিত্যিক। মানসিকতার পার্থক্য সার্থকভাবে বর্ণনা করতে পারলে সাহিত্যে ইতিহাসের ধর্ম আছে। সাহিত্য যখনই অন্য মানসিকতার সন্ধান এনেছে তখনই সাহিত্য ইতিহাসের পরিপূরক। সে হিসেবে উইলিয়াম গোলডিং এর লেখা বই ‘দি ইনহেরিটরস্’ অন্য মানুষকতার এক সার্থক সৃষ্টি এবং ইতিহাসধর্মী। এই রচনা একটি অসাধারণ ঐতিহাসিক আলোচ্য। এই রচনাটিতে সৃষ্ট জগৎ সম্পূর্ণ নূতন। আদিম পৃথিবীকে আমরা এখানে আদিম চোখ দিয়েও দেখতে পাই।

আবার যদি কোন বিরল সাহিত্যিক অন্যযুগের মনকে তাঁর রচনায় ধরতে পারেন, পাঠক যদি সেই মনকে পৃথক বলে চেনেন, কিন্তু স্বাভাবিক বলে মনে তাহলে সেই সাহিত্য নিঃসন্দেহে ইতিহাসধর্মী। তবে এটুকুই শুধু সাহিত্যে ইতিহাসের ধর্ম নয়। অন্যভাবেও সাহিত্যে ইতিহাস আসে।

সময় সচেতনতা ও পরিবর্তনের ব্যাখ্যা ইতিহাসের উপজীব্য। সাহিত্য অন্য এক অনন্ত জীবনের আভাস আনতে সক্ষম। ইতিহাস সেই জীবনে অবাস্তর। কিন্তু ইতিহাস ও সাহিত্যের সম্পর্ক অন্য একটি সূত্রেও ভাবা

প্রয়োজন। সতীনাথ ভাদুড়ীর দুটি অনবদ্য রচনা— ‘জাগরী’ ও ‘ঢোঁড়াইচরিতমানস’ একত্রে ভেবে নিলে উপরি উক্ত বক্তব্য বোঝা যাবে। সাহিত্যিকের একটা ক্ষমতা আছে তিনি ঘটনার মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন এবং ‘জাগরী’ উপন্যাসের সেই ক্ষমতার ব্যবহার স্পষ্ট। জাগরীর কাহিনীটির স্রষ্টা সতীনাথ ভাদুড়ী স্বয়ং, তিনি এই জীবনের ঈশ্বর। এই উপন্যাসের চারজন মানুষ— বাবা, মা ও দুই ছেলে চূড়ান্ত সংকটের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজেদের জীবনের তীব্র ঘটনাগুলিকে ব্যাকুল মনে ভেবে দেখছে। রাত ভোর হলে বড় আদরের বড় ছেলের ফাঁসি হবে তাঁরাও অপেক্ষা করছেন। এই রাত্রির প্রতীক্ষার কোনো ইতিহাস নেই, কোনো ইতিহাস থাকতে পারে না। সতীনাথ এই কাহিনীর স্রষ্টা। মনের গভীরে সকলেই আমরা এই রাতটিকে সত্য বলে মানি। কিন্তু এই সত্যের অধিকার সাহিত্যের, ইতিহাসের নয়। ‘ঢোঁড়াইচরিতমানস’ ইতিহাস, সতীনাথ ভাদুড়ী ইতিহাস বলেই লিখেছেন। ‘রামচরিতমানস’ যেমন রামচন্দ্রের জীবন-বর্ণনা, হিন্দুমানসের প্রথম ইতিহাস, ‘ঢোঁড়াই-এর কাহিনীও সেই গোত্রের রচনা। উত্তর বিহারের গ্রামাঞ্চল ও নিম্নবর্গের মানুষকে নিয়ে কাহিনী। এই কাহিনীতে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের কথা বলা হলেও এই গল্পের জোর অন্যত্র। এখানে নিম্নজাতির মানুষদের জীবনযাত্রাই কাহিনীর প্রধান উপজীব্য। সতীনাথের সাবলীল রচনা সাহিত্যে দুর্লভ। ‘ঢোঁড়াই’ এর কাহিনীতে বর্ণনা স্বচ্ছন্দ, কারণ স্রষ্টা এখানে দর্শক। ঐতিহাসিকও ঠিক এইরকম উপাখ্যানই লিখতে চান। মালমশলা থাকলে লিখতেও পারেন। অন্যদিকে সতীনাথ ঢোঁড়াই ও রামিয়ার সম্পর্ক যেমন করে গল্পের একটি এবলম্বন হিসেবে তৈরি করেছেন, ঐতিহাসিকের আবার সেই অধিকার নেই। ঐতিহাসিক দর্শক মাত্র, স্রষ্টা নন। কিন্তু সাহিত্যিক যখন ঈশ্বরে ভূমিকা পরিত্যাগ করে দর্শকের ভূমিকাতে নেমে আসেন তখন সাহিত্য ও ইতিহাসের বিশেষ এক সাযুজ্য চোখে পড়ে। সেভাবে ভেবে দেখলে ‘ঢোঁড়াইচরিতমানস’ ইতিহাসধর্মী সাহিত্য।

যেহেতু ঐতিহাসিক চিরকালের বাইরের লোক, সেজন্য ইতিহাস সাধারণতঃ বড় সময়ের চৌহদ্দিতেই থাকে। ছোট সময়ে নেমে আসার চেষ্টা অবশ্য ইদানীংকালে ইতিহাস রচনায় বেশ স্পষ্ট হয়েছে। তবে এক্ষেত্রেও সাহিত্য ও সাহিত্যিকই ঐতিহাসিকের চেয়ে অনেক বেশি স্বাধীন। যত্রতত্র তাঁর অবাধ চলাফেরা। বড় সময়, বিশেষ মানুষের ছোট সময় ছেড়েও সাহিত্যিক একজন মানুষের ব্যক্তিগত সময়ে নেমে আসতে পারেন। টলস্টয়ের ‘ওয়ার এণ্ড পীস’ পড়লে মনে হয় দুই ভিন্ন ভিন্ন বই পড়ছি। তার কারণ ইতিহাসের মঞ্চসজ্জা নয়, তার কারণ, একই রচনায় দু-রকম সময়ের চমকপ্রদ ব্যবহার। টলস্টয় নেপোলিয়নের মস্কো অধিকারের কথা বলছেন, এক নিঃশ্বাসে প্রিন্স আন্দ্রের মৃত্যু বর্ণনা করছেন। দুটি ঘটনা দু রকম সময় দিয়ে তৈরি। ইতিহাসের যে অঞ্চল সময় টলস্টয় তৈরি করা চেষ্টা করেছেন, সেই সময় দিয়েও কিন্তু ঐতিহাসিক সব হিসাবে মেলাতে পারবেন না। আন্দ্রের মৃত্যুতে উত্তরণ, নাট্যশার বড় হওয়া, পিয়েরের শেষ স্থিতি ইত্যাদি ঘটনা ইতিহাসের বাইরেই থাকে। তাই এখানে কাছে এলেও ইতিহাস কিন্তু সাহিত্য থেকে পৃথক থাকে।

সবশেষে বলা যায়, কিছু কিছু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ইতিহাস ও সাহিত্যের সম্পর্কটা নিকট এবং ইদানীংকার ঐতিহাসিক রচনায় সেই নৈকট্য ঘোষিত হচ্ছে। তবে ইতিহাস দিয়ে জীবনের সবটুকু ব্যাখ্যা করা চলে না। মানুষের জীবনের বড় ধারা, ছোট ধারা এবং ব্যক্তিজীবন সব কিছুই সাহিত্য দেখায়। ইতিহাস সব কিছু দেখায় না। এখানেই ইতিহাসের থেকে সাহিত্যের বাস্তবতা অনেক বড় ও বেশি।

প্রশ্ন

১। সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকের মধ্যে প্রধান পার্থক্য কি?

১.২.৫.২ : ইতিহাস ও বিজ্ঞান

অধ্যাপক বিউরী (Bury) ১৯০৩ সালে কেম্ব্রিজের এক বক্তৃতায় বলেন, ইতিহাস ‘একটি বিজ্ঞান, তার বেশিও নয়, কমও নয়।’ (History is a science, no less and no more), এর অনেক আগে ফরাসী দার্শনিক ভলতেয়ার ইতিহাস যে বিজ্ঞান একথা বলে গেছেন। সব ইউরোপীয় ভাষাতেই ‘বিজ্ঞান’ এর সমার্থক শব্দের মধ্যে ইতিহাসকে বিনা দ্বিধায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আঠারো শতকের শেষে, জগৎ সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান ও তার নিজস্ব শারীরিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জ্ঞান— এই দুই ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় যখন প্রচুর বিষয় জানা যাচ্ছিল, তখন থেকেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে যে বিজ্ঞান মানুষের সমাজ সম্বন্ধে জ্ঞানকে আরও এগিয়ে দিতে পারে কিনা। গোটা উনিশ শতক জুড়ে আস্তে আস্তে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে ধারণা গড়ে উঠতে থাকে। ইতিহাসও ছিল তার একটি।

ইতিহাস যে বিজ্ঞান এই মত আজ উপেক্ষণীয় নয়। এবং ইতিহাসকে বিভিন্ন কারণে বিজ্ঞানের সাথে তুলনা করা হয়। বিজ্ঞানের মত ইতিহাসও প্রশ্ন করে কী? কেন? এবং কীভাবে এবং এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করে। তাই আমাদের আলোচনা করা দরকার যে ইতিহাস কী ধরনের বিজ্ঞান এবং কতটুকু বিজ্ঞান? বিজ্ঞানের সঙ্গে তার মিল কোথায়, আবার পার্থক্যই বা কোথায়। এধরনের আলোচনার পটভূমি হিসেবে বিজ্ঞান বলতে ব্যাপক অর্থে কী বুঝায় সংক্ষেপে তা তুলে ধরা দরকার। প্রথমতঃ বিজ্ঞান বলতে সাধারণভাবে আমরা বুঝি ‘বিশেষ জ্ঞান’ যা নিয়মনিষ্ঠ ভাবে অর্জন করা যায় এবং যা নিয়মানুভাবে সংশ্লিষ্ট। এটা কতকগুলো সত্যভিত্তিক বা কতক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয়তঃ এই সত্য আমাদের সফল ভবিষ্যদ্বাণী করতে সাহায্য করে এবং দ্বারা ভবিষ্যৎ কর্মধারা অনেকটা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। তৃতীয়তঃ এটা নিবন্ধিক। যেকোন সংস্কারমুক্ত ব্যক্তি বৈজ্ঞানিক সত্যকে সত্য বলতে গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে। অতএব ইতিহাস বিজ্ঞান কী বিজ্ঞান নয় তা নির্ধারণ করার প্রয়াসে এই সব উপরিউক্ত চিন্তা চেতনা মনে জাগ্রত রাখা উচিত।

যেসব পদ্ধতিতে বিজ্ঞান প্রাকৃতিক জগৎকে অনুধাবন করে তা প্রয়োগ কার হয়েছিল নানান মানসিক বিষয়ের অনুধাবনে। এইপর্যায়ের প্রথম দিকে বজায় ছিল নিউটনীয় ঐতিহ্য। প্রাকৃতিক জগতের মতো সমাজকেও ভাবা হয়েছিল একটি যান্ত্রিক ব্যাপারে। ১৮৫১ এ প্রকাশিত হার্বার্ট স্পেন্সরের এর একটি বই, ‘সামাজিক স্থিতিবিদ্যা’ (সোসাল স্ট্যাটিক্স) কে এখনও মনে রাখা হয়। এরপর আর-একটি বৈজ্ঞানিক বিপ্লব আনলেন ডারউইন। আর সমাজবিজ্ঞানীরা জীববিদ্যা থেকে তাঁদের সূত্র নিয়ে সমাজকেও সপ্রাণ বলে ভাবেত শুরু করলেন। কিন্তু ডারউইনীয় বিপ্লবের প্রকৃত গুরুত্ব হোল তিনি বিজ্ঞানের মধ্যে নিয়ে এলেন ইতিহাস। এবার থেকে গতিহীন ও সময়হীন কোন ব্যাপারে নয়, বরঞ্চ বিজ্ঞানের বিবেচ্য বিষয় হলো পরিবর্তন ও বিকাশের প্রক্রিয়া। ইতিহাস প্রগতিকে সুনিশ্চিত ও পরিপূরণ করল বিজ্ঞানে বিবর্তন।

ইতিহাসচর্চা ক্ষেত্রে অনুসৃত পদ্ধতি হল প্রথমে তথ্য জোগাড় করা, তারপর সেগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। বিজ্ঞানের পদ্ধতিও ঠিক এইরকমই। বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরিতে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন তার যন্ত্ররাতি, নানা সরঞ্জাম নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান এবং অবশেষে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর তিনি সিদ্ধান্ত উপনীত হন। এদিক দিয়ে ইতিহাসচর্চাও যে নিজস্ব পদ্ধতিতে ও কলাকৌশলের মাধ্যমে এগিয়ে যায় তাকে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ও বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান বলা খুবই যুক্তিসঙ্গত। ঐতিহাসিক মানুষের অতীত কর্মকাণ্ডকে গবেষণার একমাত্র বিষয়বস্তুরূপে নির্বাচিত করে বিভিন্ন প্রক্রিয়া, পরীক্ষা নিরীক্ষা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করে।

অবশ্য সাধারণের চোখে ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকের কর্মকাণ্ডের মধ্যে বিরাট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাদের যুক্তিতে কোন প্রকার পেশাগত অনুশীলন ছাড়াই ঐতিহাসিকের কাজ সাধারণের বোধগম্য হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের কাজকর্ম জটিল এবং নানা কলাকৌশল ও কারিগরী জ্ঞানে ভরপুর। এটা সাধারণের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। একমাত্র যারা বিশেষজ্ঞ তারাই কেবল বুঝতে পারে। কিন্তু এ সঠিক নয়। সকলেই ইতিহাস লিখতে, পড়তে ও বুঝতে পারে না। জ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রের মত এখানেও পেশাদার ঐতিহাসিক ও অপেশাদার পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, কোন সাধারণ পাঠককে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উৎপত্তি ও ঘটনাপ্রবাহের উপর ইতিহাস লিখতে দিলে তিনি বিপদে পড়বেন। কারণ তথ্য জোগাড়, তথ্য গ্রহণ ও বর্জনের ক্ষেত্রে তিনি হিমসিম খেয়ে যাবেন। কোনটি ঐতিহাসিক তথ্য, কোনটি নয় তা বোঝার জন্য তাকে পেশাদার গবেষক বা ঐতিহাসিক হতে হবে। শুধুমাত্র একজন পেশাদার ঐতিহাসিকই কাজটি সঠিক ও সফলতার সঙ্গে সমাপ্ত করতে পারবেন। অতএব দেখা যায় ইতিহাস পঠন-পাঠন ও লিখনে বিষয়টির নিজস্ব নিয়মকানুন ও পদ্ধতি বর্তমান। ঐতিহাসিক হতে হলে এবং ইতিহাস বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জনে আগ্রহী ব্যক্তিদেরকে এগুলো অবশ্যই রপ্ত করতে হবে। এই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ইতিহাসকে বিজ্ঞান বলা সমীচীন হবে।

তথ্য অনুসন্ধানের প্রক্রিয়ায় ঐতিহাসিকেরা যেসব প্রকল্প ব্যবহার করেন তাদের অবস্থানের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক ব্যবহৃত প্রকল্পের অবস্থানের লক্ষণীয় মিল আছে। উদাহরণ হিসেবে মার্কস্ ভেবর-এর প্রটেক্ট্যান্টবাদ ও পুঁজিবাদের মধ্যে সম্পর্কের বিখ্যাত লক্ষণ নির্ণয়টির কথা ভাবা যেতে পারে। আজ এটিকে সূত্র বলা কারোর পক্ষেই উচিত নয়। যদিও আগের কোন যুগে এটিকে বোধহয় সূত্র হিসেবেই স্বাগত জানানো হত। এটি একটি প্রকল্প। ঐতিহাসিকদের অনুসন্ধান এটি অনুপ্রেরণা এনেছে এবং অনুসন্ধানের প্রক্রিয়ায় প্রকল্পটি খানিকটা পরিমার্জিত হলেও এর মাধ্যমে এই দুই আন্দোলন সম্পর্কেই আমাদের বোধ, ধারণা আরও প্রসারিত হয়েছে। ঠিক তেমনি মার্কসের বিবৃতি উদ্ধৃতি করে উপরিউক্ত যুক্তি দেখানো যায়। মার্কস বলেন, “হাতে চালানো কল এনে দেয় সামন্তপ্রভু সমেত এক সমাজ : বাষ্পচালিত কারখানা এনে দেয় শিল্প পুঁজিপতি সমেত এক সমাজ।” আধুনিক পরিভাষায় এটি কোনো সূত্র নয়, যদিও মার্কস হয়তো তেমন দাবিই করতেন। কিন্তু এটি একটি ফলদায়ক প্রকল্প যা আরও অনুসন্ধান ও নতুন বোধের পথ দেখায়। এইসব প্রকল্প ভাবনার অপরিহার্য হাতিয়ার। ঠিক তেমনি ইতিহাসকে বিভিন্ন পর্বে ভাগ করাটা কোনো তথ্য নয়, বরং একটি প্রয়োজনীয় প্রকল্প বা চিন্তার হাতিয়ার। ঐতিহাসিক যে প্রকল্প গ্রহণ করেন তাই দিয়ে তাঁর পক্ষপাত বিচার করা যায়।

ইদানীংকালে বিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকেরা আশা পোষণ করেন যে, তাঁরা একটি টুকরো প্রকল্প থেকে ক্রমেই আর একটির দিকে এগিয়ে যাবেন, তাঁদের ব্যাখ্যানের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্যকে আলাদা করবেন ও তাঁদের ব্যাখ্যানকে

যাচাই করবেনতথ্য দিয়ে। তাঁরা উভয়ে যেভাবে কাজ করেন তার মধ্যে মূলগত কোন তফাত নেই। একজন ঐতিহাসিক ও একজন পদার্থবিদ পরস্পর নিঃসম্পর্কিতভাবে একই সমস্যাকে প্রায় ঠিকই একসঙ্গে সূত্রবদ্ধ করবেন তা সত্যিই মনে দাগ কাটার মত।

তবে গাণিতিক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বা এইসব পর্যায়ের নানান বিজ্ঞানের মধ্যে যেমন বিরাট পার্থক্য আছে, তেমনি বিজ্ঞান ও ইতিহাসের মধ্যে একটি মৌলিক প্রভেদ আছে। এই পার্থক্যই ইতিহাসকে ও অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান আখ্যা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। ইতিহাসকে বিজ্ঞান বলার ক্ষেত্রে যে সব আপত্তি তোলা হয় তা হলো : (১) ইতিহাস একান্তভাবেই অনন্য নিয়ে চর্চা করে, আর বিজ্ঞান চর্চা করে সাধারণ নিয়ে। (২) ইতিহাস কোন শিক্ষা দেয় না, কিন্তু বিজ্ঞান সাধারণকে অনেক শিক্ষা দেয়। (৩) ইতিহাস ভবিষ্যদবাণী করতে পারে না। (৪) ইতিহাস মূলতঃ বিষয়নিষ্ঠ, কারণ মানুষ নিজেকেই পর্যবেক্ষণ করছে। (৫) ইতিহাসের মধ্যে ধর্ম ও নৈতিকতা সংক্রান্ত নানান ব্যাপার জড়িয়ে থাকে, বিজ্ঞানে তা নেই। এখন ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই অভিযোগগুলি কতখানি সত্য তা পরীক্ষা করা যাক।

প্রথম অভিযোগটি হল ইতিহাস অনন্য ও বিশেষ নিয়ে চর্চা করে আর বিজ্ঞান চর্চা করে সাধারণ ও নির্বিশেষ নিয়ে। অ্যারিস্টটল থেকে শুরু করে কলিংউড এবং আরও কেউ কেউ বিজ্ঞান ও ইতিহাসের মধ্যে এই একই

ইতিহাস যে বিজ্ঞান এই মত আজ উপেক্ষণীয় নয়। এবং বিভিন্ন কারণে ইতিহাসকে বিজ্ঞানের সাথে তুলনা করা হয়। বিজ্ঞানের মত ইতিহাসও প্রশ্ন করে কী? কেন? শুধু তাই নয়, ইতিহাস চর্চার ন্যায় বিজ্ঞানের পদ্ধতিও ঠিক একরকম। বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরিতে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান ঠিক একই রকমভাবে ঐতিহাসিকও নিজস্ব পদ্ধতি ও কলাকৌশলের মাধ্যমে বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস রচনার জন্য এগিয়ে চলে। কিন্তু ঐতিহাসিকরা কখনও ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা হতে পারে না। তবে তাঁরা ভবিষ্যৎ গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে ভাল দিক নির্দেশনা দিতে পারে।

পার্থক্যের কথা বলেছেন। ঐতিহাসিক E.H. Carr-এর মতে, এই ধারণা একটি ভুল বোঝাবুঝির উপর দাঁড়িয়ে আছে। হবস্-এর বিখ্যাত প্রবচনটি এখনও প্রয়োজন। ‘নাম ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছুই নির্বেশেষ নয়, কারণ যেসব জিনিসের নাম দেওয়া হয়েছে সেগুলোর প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ও একক।’ প্রকৃতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এটি নিঃসন্দেহে সত্য, কোনো দুটি ভৌগোলিক গড়ন, একই প্রজাতির কোনো দুটি প্রাণী, দুটি পরমাণুও অভিন্ন নয়। তেমনি দুটি ঐতিহাসিক ঘটনাও অভিন্ন নয়। ঐতিহাসিক যে ভাষা ব্যবহার করছেন এই ব্যাপারটি তাঁকে, বিজ্ঞানীর মতোই,

সাধারণীকরণের প্রতি দায়বদ্ধ করে দেয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, পেলোপনেসিয়ার যুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল খুবই আলাদা ধরনের এবং দুটোই ছিল অনন্য। কিন্তু ঐতিহাসিকেরা দুটোকেই যুদ্ধ বলেন। এখানে দুটি অনন্য ঘটনার সাধারণীকরণ করা হয়েছে। ঐতিহাসিক আসলে অনন্যের প্রতি আগ্রহী নন, বরং সাধারণের মধ্যে যা অনন্য তাতেই তাঁর আগ্রহ। বিশ শতকের পরিস্থিতিতে যুদ্ধের নানান কারণ নিয়ে সাধারণীকরণের ব্যাপারটি ঐতিহাসিকদের মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে। ইতিহাসের পাঠক ও ঐতিহাসিক সাধারণীকরণ করে চলেছেন। ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণকে তিনি তাঁর পরিচিত অন্যান্য ঐতিহাসিক প্রসঙ্গে প্রয়োগ করেন—বা হয়তো তাঁর নিজের যুগেই। অতএব ইতিহাসের সাধারণীকরণের কোন সামঞ্জস্য নেই এটা বলা ঠিক হবে না। সাধারণীকরণেই ইতিহাসের সমৃদ্ধি ঘটে। ‘কেম্ব্রিজ আধুনিক ইতিহাস’ (Cambridge Modern History)-এর একটি খণ্ডে Elton (এলটন) বলেছেন, ‘ঐতিহাসিক তথ্যের সংগ্রাহকের থেকে ঐতিহাসিককে যা আলাদা করে দেয় তা হলো সাধারণীকরণ’।

অনন্য ও সাধারণের মধ্যে সম্পর্কই ইতিহাসের আলোচ্য। ঐতিহাসিক হিসেবে কেউ যেমন তথ্য ও ব্যাখ্যানকে আলাদা করতে পারেন না, তেমনি আলাদা করতে পারেন না অনন্য ও সাধারণকে, বা এর কোনোটিকে অন্যটির তুলনায় অগ্রাধিকারও দিতে পারেন না।

দ্বিতীয়ত, ইতিহাসের শিক্ষা কী? এই প্রশ্নটি সাধারণীকরণের প্রশ্নটির সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। সাধারণীকরণের আসল কথা হলো, এর মাধ্যমে আমরা ইতিহাস থেকে শেখার চেষ্টা করি, একসারি ঘটনা থেকে সংগৃহীত শিক্ষা প্রয়োগ করি অন্য একসারি ঘটনাতে। সাধারণীকরণের সময় সচেতন বা অচেতনভাবে এই কাজটিই করার চেষ্টা হয়।

মানুষ ইতিহাস থেকে যথেষ্ট শিক্ষালাভ করে। প্রচুর পর্যবেক্ষণযোগ্য তথ্য দিয়ে তা প্রমাণ করাও কঠিন নয়। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে যোগদানকারী সব প্রতিনিধিরা একশ বছর আগের ভিয়েনা কংগ্রেসের শান্তি সম্মেলন থেকে নানা শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। ইতিহাসের ঐ সব শিক্ষাকে ধুব সত্য বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। ফরাসী বিপ্লবের, ১৮৪৮-এর বিপ্লবের, ১৮৭১-এর প্যারী কমিউনের নানান শিক্ষা রুশ বিপ্লবের নায়কদের মনে গভীরভাবে ছাপ ফেলেছিল। এরকম দৃষ্টান্ত ইতিহাসে ভুরি ভুরি রয়েছে। তবে ইতিহাস থেকে শিক্ষালাভ কখনোই একতরফা প্রক্রিয়া নয়। অতীতের আলোয় বর্তমানকে শেখা মানে একইসঙ্গে বর্তমানের আলোয় অতীতকে দেখা। অতীত ও বর্তমানের পারস্পরিক সম্পর্কে মধ্য দিয়ে দুটির মধ্যে সম্পর্কের আরও গভীর এক বোধ সঞ্চারিত করাই ইতিহাসের শিক্ষা ও কাজ।

ইতিহাসের বিরুদ্ধে আরও একটি অভিযোগ : ইতিহাস থেকে কোন শিক্ষাই পাওয়া যায় না, কারণ ইতিহাস বিজ্ঞানের মত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারে না। তবে এক্ষেত্রেও প্রশ্নটি গভীরভাবে তলিয়ে দেখা প্রয়োজন। আগের মত ইদানীংকালে বিজ্ঞানীরা প্রকৃতির বিভিন্ন সূত্র নিয়ে কথা বলতে উৎসুক নন। বিজ্ঞানের যে সব সূত্র রয়েছে এবং যে সব সূত্র আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করে সেগুলো আসলে প্রবণতা সংক্রান্ত বিবৃতি, অন্যান্য অবস্থা একইরকম থাকলে বা পরীক্ষাগারের পরিবেশে কী হবে সেই সম্পর্কে বিবৃতি। বিভিন্ন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কী হবে সেই নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করার দাবি বৈজ্ঞানিক করেন না। মাধ্যাকর্ষণ সূত্র দিয়ে প্রমাণ হয় না যে ঐ বিশেষ অ্যাপেলটি মাটিতে পড়বে, কেউ হয়তো সেটিকে বুড়িতে ধরে ফেলতে পারে। আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। যেমন— আলো সরলরেখায় চলে—আলোকবিদ্যার এই সূত্রটি প্রমাণ করে না যে, একটি বিশেষ আলোকরশ্মি মধ্যবর্তী কোন বস্তুর মাধ্যমে প্রতিসারিত বা বিচ্ছুরিত হতে পারে না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, এইসব সূত্র মূল্যহীন বা নীতিগতভাবে বৈধ নয়। আজকের দিনে বিজ্ঞান এটা মনে রাখার বেশি পক্ষপাতী যে আরোহ শুধু যুক্তির দিকে দিয়ে নানারকম সম্ভাব্যতা বা যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্বাসের দিকে নিয়ে যেতে পারে, এবং বিজ্ঞান তার নানান ঘোষণাকে সাধারণ নীতি বা নির্দেশক—যাদের বৈধতা শুধু কোনো নির্দিষ্ট ক্রিয়াতে যাচাই করা যায়—সেই হিসেবে গণ্য করতে বেশি আগ্রহী। কোঁত যেমন বলেছিলেন, ‘জ্ঞান থেকে আসে দূরদৃষ্টি, দূরদৃষ্টি থেকে কর্ম।’ সাধারণ ও বিশেষ, সর্বজনীন ও অনন্যের ভেতর এই পার্থক্যের মধ্যেই ইতিহাসে ভবিষ্যদ্বাণীর সূত্রটি নিহিত আছে। ইতিপূর্ব আলোচনায় বলা হয়েছে, ঐতিহাসিক সাধারণীকরণ করতে বাধ্য; এবং তা করতে গিয়েই তিনি ভবিষ্যৎ কার্যকলাপের জন্য বিভিন্ন নির্দেশকের যোগান দেন। এইসব নির্দেশক নির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী না হলেও একইসঙ্গে বৈধ ও উপযোগী।

তবে একথাও সত্যি যে, ঐতিহাসিক বিভিন্ন নির্দিষ্ট ঘটনা সম্পর্কে ভবিষ্যদবাণী করতে পারেন না, কারণ নির্দিষ্ট মানে অনন্য এবং তার মধ্যে আকস্মিকতার উপাদান এসে পড়ে। কারণ ঐতিহাসিকেরা ভবিষ্যদবাণী অতীত অভিজ্ঞতা থেকে তৈরি একটি সাধারণীকরণের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং কর্মের ক্ষেত্রে একটি বৈধ ও উপযোগী নির্দেশক। ঐতিহাসিকেরা ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা (Prophet) নয়। তিনি কেবল কোনো ঘটনা বা সংগ্রামের ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে ভাল দিকনির্দেশনা দিতে পারেন।

তবে একইসঙ্গে ইতিহাস ও বিজ্ঞানের মধ্যে যে বাহ্যিক পার্থক্য রয়েছে তা মেনে নেওয়া প্রয়োজন। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, বৈজ্ঞানিক মূলতঃ সাধারণ সত্য উদ্ঘাটনে নিয়োজিত থাকে এবং ভবিষ্যদবাণী করাও তার কাজের মধ্যে পড়ে। কিন্তু ঐতিহাসিক কোন ঘটনার ভবিষ্যদবাণী করতে পারেন না। কারণ তিনি পৃথক পৃথক ঘটনা নিয়ে ব্যাপ্ত থাকেন এবং তাঁর কাজকর্মের পত্রিয়ায় কদাচিৎ সর্বজনীন সিদ্ধান্ত প্রকাশ পায়। একাকী সংঘটিত বিষয়াদির ওপর মনোযোগ নিবন্ধ থাকার জন্যই ঐতিহাসিক ভবিষ্যদবাণী করতে ব্যর্থ হয়। তবে একথাও ঠিক, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক তাঁদের দুজনের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি মূলতঃ আলাদা নয়।

ইতিহাসসহ বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানে আলোচক ও আলোচ্য একই পর্যায়ভুক্ত থাকে এবং একে অপরের ওপর পারস্পরিকভাবে ক্রিয়াশীল। মানবিক আচরণের মধ্যে যে ইচ্ছে ক্রিয়াশীল থাকে সেই আচরণের বিভিন্ন রূপভেদ করার প্রয়োজন হয় সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ বা ঐতিহাসিকের, যাতে তিনি ঠিক ধরতে পারেন তাঁর অনুধাবনের বিষয়বস্তু যে মানুষ সে যখন সক্রিয় হয়েছে তখন তার কেন সক্রিয় হওয়ার ইচ্ছে হয়েছে। এতে পর্যবেক্ষক ও পর্যবেক্ষিত—অর্থাৎ বিষয়ী ও বিষয়—এই দুই এর মধ্যে একটা সম্পর্ক তৈরি হয় যেটা একান্তই ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের ব্যাপার। ঐতিহাসিক যা পর্যবেক্ষণ করেন তার প্রত্যেকটির মধ্যে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্যটি অনিবার্যভাবে ঢুকে পড়ে; ইতিহাস আগাগোড়াই আপেক্ষিকতায় ভরা। ইতিহাস সচেতন লোকেদের মধ্যে ইতিহাস কেন কদাচিৎ নিজের পুনরাবৃত্তি করে তার একটা কারণ এই যে, নাটকের কুশীলবরা দ্বিতীয়বার অভিনয়ের সময়ে প্রথমবারের পরিণতি সম্বন্ধে সজাগ থাকে এবং তাদের কার্যকলাপ প্রভাবিত হয় ঐ জ্ঞানের মাধ্যমে। পর্যবেক্ষক ও পর্যবেক্ষিতের মধ্যে এবং ঐতিহাসিক ও তাঁর তথ্যের মধ্যে যে পারস্পরিক ক্রিয়া তা অবিচ্ছিন্ন ও অবিরতই পরিবর্তনশীল এবং এটাই ইতিহাসসহ বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানের বিশিষ্ট লক্ষণ বলে মনে হয়।

বিশ শতকের মাঝামাঝি কয়েকজন পদার্থবিজ্ঞানী তাঁদের বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে ভাষায় কথা বলেছেন তাতে বস্তুজগৎ ও ঐতিহাসিকের জগতের মধ্যে আরও বেশি লক্ষ্য করার মতো মিল পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিকদের মতে, তাঁদের গবেষণার ফলাফলের মধ্যে নাকি একটি অনিশ্চয়তা বা অনির্ণেয়তার নীতি জড়িয়ে আছে। এর মধ্যে আমাদের ঐতিহাসিক ভবিষ্যদবাণী করার ক্ষমতা সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে দেশ ও কালের দূরত্ব ও অতিক্রান্তির যে পরিমাপ, তা ‘পর্যবেক্ষকের’ গতির ওপর নির্ভরশীল। অতএব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ইতিহাসের ন্যায় ‘পর্যবেক্ষক’ ও পর্যবেক্ষকের বিষয়টি এসে পড়ে। তবে তা সত্ত্বেও এটা বলতে হবে যে কতকগুলি পার্থক্যের দরুন ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি ও বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। সমাজবিজ্ঞানী বা ঐতিহাসিকের পক্ষে তাঁদের চর্চার বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ব্যাপারটা ভৌতবিজ্ঞানীর তাঁর বিষয়ে যুক্ত হওয়ার থেকে অন্য ধরণের।

ধর্ম ও নৈতিকতা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের সঙ্গে নিবিড় ভাবে যুক্ত হওয়ার ফলে ইতিহাস সাধারণভাবে বিজ্ঞান থেকে আলাদা বলা হয়ে থাকে। কোনো অতি ঐতিহাসিক শক্তি তা যাই হোক না কেন, তার উপর ইতিহাসের অর্থ ও তাৎপর্য নির্ভরশীল—এই বিশ্বাস ভুল। এতে ইতিহাস পূর্ণতা লাভ করে না। নৈতিকতার প্রশ্নে বলা যায়—ঐতিহাসিকের পক্ষে তাঁর গল্পের চরিত্রদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে নৈতিক রায় ঘোষণা করার দায়িত্ব নেই। ঐতিহাসিক ও নীতিবাদের দৃষ্টিভঙ্গী এক নয়। নৈতিক চরিত্র দিয়ে যদি ইতিহাসের ঘটনা বিচার করা হত তবে ইতিহাসে ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম হেনরী বা রাশিয়ার স্টালিনের মূল্যায়ন অন্যভাবে করা হতো। ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে নৈতিক রায়দান ঐতিহাসিকের কাজ নয়, বরং তাঁর এক্ষেত্রে অন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য কাজ রয়েছে। তবে ইতিহাসের এই নৈতিক রায়দানের ক্ষেত্রে যে বিচ্যুতি ঘটেনি তা নয়, ঐতিহাসিক অনেক সময়ই নৈতিক রায় সংক্রান্ত সমস্যার মধ্যে জড়িয়ে পড়েন। অতি-ঐতিহাসিক মূল্যায়নের কাণ্ডে অনুগত্য স্বীকার করেন। তখন ইতিহাস তাঁর বিজ্ঞানসম্মত বৈশিষ্ট্যটি হারিয়ে ফেলে।

প্রশ্ন

- ১। ইতিহাস ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে মিল আছে।
- ২। কোন্ কোন্ দিক দিয়ে ইতিহাসের সঙ্গে বিভাজনের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়?

১.২.৫.৩ : উপসংহার

সবশেষে বলা যায়, বিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকের মধ্যে লক্ষ্য, পদ্ধতি নিয়ে যত বোঝাপড়া গড়ে উঠবে তত ইতিহাস ও বিজ্ঞানের মধ্যে যে সব ব্যবধান ও দূরত্ব রয়েছে তার অবসান হবে। বিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিক—এঁরা সবাই একই চর্চার বিভিন্ন শাখায় নিযুক্ত, মানুষ ও তার পরিবেশ, পরিবেশের উপর মানুষের এবং মানুষের উপর পরিবেশের প্রভাব। চর্চার উদ্দেশ্যটি একইরকম; পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের বোঝাপড়া ও পরিবেশের উপর তার প্রভুত্ব বাড়ানো। খুঁটিনাটির ক্ষেত্রে পদার্থবিজ্ঞানী, ভূতাত্ত্বিক, মনোবিদ ও ঐতিহাসিকের মধ্যে পূর্বানুমান ও পদ্ধতিতে ব্যাপত পার্থক্য আছে। ব্যাখ্যা করতে চাওয়ার যে মূল উদ্দেশ্য, এবং প্রশ্ন ও উত্তরের যে মূল কার্যপদ্ধতি—তাতে ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞানী দুজনেই একজোট। অন্য যে কোন বিজ্ঞানীর মতোই ঐতিহাসিকও একজন ব্যক্তি যিনি সারাক্ষণই ‘কেন?’ এই প্রশ্নটি করে চলেন এবং তার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেন।

১.২.৫.৪ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

- ১। ইতিহাস ও সাহিত্য—অশীন দাশগুপ্ত।
- ২। ইতিহাস ও ঐতিহাসিক—অমলেশ ত্রিপাঠী।
- ৩। ইতিহাস চর্চা—নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়।
- ৪। কাকে বলে ইতিহাস—ই. এইচ. কার।
- ৫। ইতিহাস ও ঐতিহাসিক—মমতাজুর রহমান তরফদার।
- ৬। ইতিহাস তত্ত্ব—এম. দেলওয়ার হোসেন।

১.২.৫.৪ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

- ১। ইতিহাস ও সাহিত্যের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করো।
 - ২। ইতিহাস ও সাহিত্যের কোথায় কোথায় মিল আছে?
 - ৩। ইতিহাস ও সাহিত্যের মধ্যে পার্থক্য কোথায় কোথায়?
 - ৪। ইতিহাস কী বিজ্ঞান?
 - ৫। ইতিহাস ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে মিল আছে?
 - ৬। কোন্ কোন্ দিক দিকে ইতিহাস ও বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়?
-

একক ৬

History and other Disciplines

বিন্যাস ক্রম :

- ১.২.৬.০ : উদ্দেশ্য
- ১.২.৬.১ : সূচনা
- ১.২.৬.২ : ইতিহাস ও অর্থনীতি
- ১.২.৬.৩ : ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান
- ১.২.৬.৪ : ইতিহাস ও ভূগোল
- ১.২.৬.৫ : ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব
- ১.২.৬.৬ : ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব
- ১.২.৬.৭ : ইতিহাস ও নৃতত্ত্ববিদ্যা
- ১.২.৬.৮ : ইতিহাস ও ভাষাবিদ্যা
- ১.২.৬.৯ : ইতিহাস ও দর্শন
- ১.২.৬.১০ : ইতিহাস ও গ্রন্থপঞ্জী
- ১.২.৬.১১ : সহায়ক প্রশ্নাবলী

১.২.৬.০ : উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন :

- (১) ইতিহাস ও অন্যান্য নানা বিষয়ের সম্পর্ক
- (২) ইতিহাসের উপর অর্থনীতির প্রভাব?
- (৩) ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক
- (৪) ইতিহাসের উপর ভূগোলের প্রভাব
- (৫) ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক
- (৬) ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের মধ্যে সম্পর্ক
- (৭) ইতিহাস ও নৃতত্ত্ববিদ্যার মধ্যে সম্পর্ক
- (৮) ইতিহাস ও নৃতত্ত্ববিদ্যার মধ্যে সম্পর্ক
- (৯) ইতিহাস ও দর্শনের সম্পর্ক

১.২.৬.১ : সূচনা

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নানা প্রয়োজনে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে এবং যত দিন যাচ্ছে এই নির্ভরশীলতা বেড়েই চলেছে। ঠিক তেমনি জ্ঞান বিজ্ঞানের ভাঙরের অফুরন্ত প্রসারের ফলে জ্ঞানের স্বীকৃত শাখা হিসেবে ইতিহাস, সংস্কৃতি, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞানের নানা শাখাগুলির সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে জোরকদমে এগিয়ে চলেছে।

জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা একে অপরের পরিপূরক বা অনুপূরকের কাজ করছে। বর্তমানে জ্ঞানের কোন শাখাই স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে দাবী করতে পারে না। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সংযোগের ফলে প্রত্যেকটি শাখাই পরিপুষ্ট হয়ে উঠছে। বর্তমানে ‘inter-disciplinary’ শব্দটি ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক, ঐতিহাসিক সকলের কাছেই সুপরিচিত। বিভিন্ন শাখার মধ্যে আদান প্রদানের মাধ্যমে আধুনিককালের জ্ঞানচর্চার গতি প্রসারলাভ করছে এবং সম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। জ্ঞানের স্বীকৃত শাখা হিসেবে ইতিহাসও অন্যান্য জ্ঞানের শাখাগুলির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছে। ইতিহাস তাই আজকে অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সংস্কৃতি, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা জ্ঞানের নানা শাখাগুলির সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে জোরকদমে এগিয়ে চলেছে। আজ ইতিহাস বলতে বোঝায় রাজা-রাজাদের কাহিনী নয়। মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করে যে সমাজ, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, দর্শন আবর্তিত হচ্ছে তা সবই ইতিহাসের অংশবিশেষ। আজ তাই ছাত্ররা ‘total history’ বা সামগ্রিক ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে।

প্রশ্ন

১। জ্ঞানের প্রতিটি শাখাই কেন পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে?

১.২.৬.২ : ইতিহাস ও অর্থনীতি

অর্থনীতির আলোচনাকে বাদ দিয়ে আজ গবেষক ও ঐতিহাসিকের দল ইতিহাসিকের দল ইতিহাসকে ভাবতে পারেন না। সাধারণভাবে সম্পদ সংগ্রহ, সম্পদ বিতরণ ও সম্পদ ভেআগ করায় যে প্রক্রিয়া রয়েছে তাকেই অর্থনীতি বলে অভিহিত করা যায়। ইতিহাসের যে বিরাট কর্মফল তা কখনও মানবজীবনকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। এই মানুষের জীবনধারণের জন্য একান্ত পয়োজন অর্থ। তাই মানুষের কর্মকাণ্ডের সিংহভাগই বহুমুখী পয়োজন মেটাবার জন্য ধন-সম্পদ সংগ্রহে নিয়োজিত থাকে। আবার ইতিহাস গবেষণার একটা দিক হল মানুষের অতীত কর্মকাণ্ড নিয়ে অনুসন্ধান চালানো। এ কারণে প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত মানুষের আর্থিক চাহিদার প্রকৃতি বুঝতে পারলে একজন ঐতিহাসিকের পক্ষে মানবীয় কর্মকাণ্ডের সঠিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন সহজতর হবে। একমাত্র অর্থনৈতিক নিমিত্তবাদ দ্বারাই ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সম্ভব। ইতিহাস অর্থনীতির ক্ষেত্রে নিয়োজিত গবেষকদের অতি প্রয়োজনীয় আর্থিক বিষয় সরবরাহ করে থাকে।

শুরু করে আজ পর্যন্ত মানুষের আর্থিক চাহিদার প্রকৃতি বুঝতে পারলে একজন ঐতিহাসিকের পক্ষে মানবীয় কর্মকাণ্ডের সঠিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন সহজতর হবে। একমাত্র অর্থনৈতিক নিমিত্তবাদ (Economic determinism) দ্বারাই ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সম্ভব। এ তত্ত্বের উদগাতা স্বয়ং কার্ল মার্কস। তবে সকলে হয়তো

বা এ তত্ত্বের সঙ্গে একমত হবে না এবং আধুনিককালের নানা ঐতিহাসিকের মধ্যে এ নিয়ে মতবিরোধও সুস্পষ্ট। তবে এ কথাও সত্য যে, ইতিহাসচর্চার বা দর্শনের ক্ষেত্রে কোনোভাবেই অর্থনৈতিক বিষয়াদিকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা সম্ভব নয়, বরং এই সব বিষয়াদি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত বলে মনে হয়। প্রাচীনকালের ইতিহাস থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যে কোন রাষ্ট্রের অর্থনীতিতে উৎপাদনব্যবস্থা, উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষজন উৎপাদিত দ্রব্য ও তার বিলিব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়গুলি মুখ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

কোনো কোনো যুগে, বিশেষ করে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে এই অর্থনৈতিক বিষয়াদি মানুষের কর্মকামেড চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রক ও নির্ধারকের ভূমিকা পালন করে আসছে। কিছু কিছু আকর্ষনী উপাদান বাদ পড়লেও, শুধু অর্থনীতির নিরিখে আধুনিক ও সমসাময়িক সমাজের উদ্ভব ব্যাখ্যা করলে প্রায় চূড়ান্ত সত্যের কাছাকাছি পৌঁছানো সম্ভব। তা ছাড়া ইতিহাসের এমন কোনো যুগ নেই— কি প্রাচীন, কি মধ্য, কি আধুনিক, যখন মানব সমাজের উপর অর্থনৈতিক উপাদানের প্রভাবকে অস্বীকার করা সম্ভব হত। এ কারণেই গবেষক এবং ঐতিহাসিককে মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের উপর অধিকতর জোর দিতে হয়। আর ও কাজে মুঙ্গিয়ানা দেখাবার জন্য ঐতিহাসিকদের সম্পদ তৈরি ও ব্যবহার প্রক্রিয়ার সাথে ভালভাবে পরিচিত হতে হয়। অর্থনীতি সম্পর্কে তার ভাল জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যিনি এই কাজে যত দক্ষতা দেখান, তিনি একজন দক্ষ অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকের খ্যাতি অর্জন করেন। জটিল আধুনিক দগতে ঐতিহাসিকের জন্য অনুরূপ দক্ষতা অর্জন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

প্রশ্ন

১। কিসের দ্বারা ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সম্ভব?

অবশ্য ইতিহাস এবং ঐতিহাসিকও একজন অর্থনীতির ছাত্র, গবেষকের কার্যক্রম সহজ করতে অনেক অবদান রাখতে পারে। সুদূর অতীত থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা ও চালিকা শক্তির ধরণ একমাত্র ইতিহাসই ব্যক্ত করতে পারে এবং অর্থনীতিবিদদের নাগালের মধ্যে নিয়ে এসে তাদের কাজকে সহজতর করে তুলতে পারে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের লোকদের অর্থনৈতিক সংগ্রামের প্রেক্ষাপট পর্যািপ্তভাবে রপ্ত করা ছাড়া বর্তমান মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। এর ফলে সে ইতিহাস অসম্পূর্ণ হতে বাধা। ইতিহাসই অর্থনীতির ক্ষেত্রে নিয়োজিত গবেষকদের অতি প্রয়োজনীয় আর্থিক বিষয় সরবরাহ করতে পারে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, প্রাচীন ভারতের সিন্ধুসভ্যতা বা বৈদিক সভ্যতার মানুষের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা বা মধ্যযুগের ভারতের মানুষের অর্থনৈতিক ইতিহাস, আধুনিককালে অর্থনীতির গবেষকদের নানা সুবিধা করে দেয়। তাছাড়া ইতিহাস অনেক ব্যাখ্যার সাহায্যে প্রমাণাদির সাহায্যে অর্থনীতি ও অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের মধ্যে বিরাজমান সম্পর্কের স্বরূপ অর্থনীতিবিদদের সামনে তুলি ধরে। মোটের উপর বলা যায়, জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে ইতিহাস ও অর্থনীতি এই বিষয় দুটি একে অপরের উপর নির্ভরশীল। আজ তাই ‘অর্থনীতির’ বহু বিয় ইতিহাসের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং অন্যদিকে ইতিহাসের অনেক কিছু অর্থনীতির ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ার জন্য পাঠক্রমে ঢোকানো হয়েছে।

১.২.৬.৩ : ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান

ইতিহাসকে মূল ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে তার ফসল বলে অভিহিত করা যায়। (History is the root, political Science is the fruit) এই কথাটি ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বোঝানোর জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন ও এই সঙ্গে যুক্তিযুক্তও। আবার অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের তুলনায় ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরস্পরের

দীর্ঘকাল ধরে বেশির ভাগ ঐতিহাসিক রাষ্ট্রীয় কাঠামো, রাজনৈতিক বিষয়াদি ইত্যাদি ইতিহাস গবেষণার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছে। রাজনৈতিক সংগঠনের মূল কাঠামো সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান না থাকলে সেই বিষয়ে ইতিহাস রচনা খুবই নিম্নমানের ও অস্পষ্ট হবে। এজন্য ইতিহাসকে মূল ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে তার ফসল বলা হয়।

সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। ঐতিহাসিক মাত্রই স্বীকার করেন যে, ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ‘রাষ্ট্রবিজ্ঞান’ বিষয়টি তার নিজের লেখার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান ও অপরিহার্য।

‘রাষ্ট্রবিজ্ঞান’ বলতে কি বোঝায়? যে কোন রাষ্ট্র বিষয়ে জ্ঞান বা বিদ্যা হল ‘রাষ্ট্রবিজ্ঞান’ সম্পর্কে জানা। দীর্ঘকাল ধরে বেশিরভাগ ঐতিহাসিক রাষ্ট্রীয় কাঠামো, রাজনৈতিক বিষয়াদি ইত্যাদি ইতিহাস গবেষণার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছে। অথচ কমসংখ্যক ঐতিহাসিকেরই

‘রাষ্ট্রবিজ্ঞান’ সম্পর্কে নিয়মানুযায়ী ধারণা আছে। অবশ্য আইনসংক্রান্ত প্রশাসনিক ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ধারণাযুক্ত ইতিহাস গণেতাগণ রাজনৈতির প্রেক্ষাপটের মূল উদঘাটনে তৎপর ছিলেন, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের ইতিহাসে অনেক অসঙ্গতি থাকত। কারণ তারা শুধু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা রাজনীতিবিদদের জীবনের সংগঠিত ঘটনাবলীর বর্ণনা দিয়ে সন্তুষ্ট থাকতেন। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত রাজনৈতিক ঐতিহাসিকের স্বীকার করেন যে, রাজনৈতিক তত্ত্বের প্রকৃতি বিচার বা রাজনৈতিক সংগঠনের মূল কাঠামো সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান না থাকলে সেই বিষয়ে ইতিহাস রচনা খুবই নিম্নমানের ও অস্পষ্ট হবে। এ কারণে সার্থক ইতিহাসচর্চার জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জ্ঞান একান্ত দরকার।

প্রশ্ন

১। রাষ্ট্র বিজ্ঞান কাকে বলে?

২। History is the root, political Science is the fruit-এই কথাটি কেন ব্যবহার করা হয়?

অন্যদিকে ঐতিহাসিকেরা ইতিহাস লেখার সময়ে অনেক রাজনৈতিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এর মধ্যে দিয়ে ঐতিহাসিকরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা কাছে ব্যাপক মৌলিক উপাদান ও প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে পারেন। আর এ সব তথ্যের আলোকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ তথ্যগণ ও তত্ত্বগত আলোচনা জোরদার করতে পারেন। এর ফলে রাজনৈতিক ইতিহাস পরস্পরের সাহায্যে পরিপুষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে।

১.২.৬.৪ : ইতিহাস ও ভূগোল

ইতিহাস ও ভূগোলের মধ্যে সম্পর্ক খুবই প্রাচীন। সূর্য এবং চাঁদের মধ্যে যে সম্পর্ক, এই বিষয় দুটির সম্পর্ক ঠিক একই বললে অতিশয়োক্তি হবে না। উচ্চমানের ইতিহাস রচনার জন্য, বিশেষভাবে সামরিক ও কূটনৈতিক ইতিহাস রচনার জন্য মোটামুটি ভাবে ভৌগোলিক জ্ঞান এবং মানচিত্রের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান থাকা একান্ত

প্রয়োজন। এমনকি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও একটি উপযুক্ত ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে তা আলোচনা করা প্রয়োজন।

এই ভাবাদর্শ থেকেই ইতিহাসের জনক গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস সর্বপ্রথম মানুষের কর্মকাণ্ডের সাথে ভূগোল ও পরিবেশের নিবিড় সংযোগের কথা বেশ জোর দিয়ে বলেন। ‘গ্রীক-পার্সিয়ান যুদ্ধের ইতিহাস’ শীর্ষক গ্রন্থে মিশরের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি নীলনদের প্লাবন, পলিমাটি বেষ্টিত ভূমির কথা এবং এদের প্রবাবের কথা জোড় দিয়ে বর্ণনা করেন। বিখ্যাত ফরাসী ঐতিহাসিক মিশেলের মতে, ইতিহাস বিশ্লেষণ

উচ্চমানের ইতিহাস রচনার জন্য ভৌগোলিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ফরাসী ঐতিহাসিক মিশেলের মতে, ইতিহাস বিশ্লেষণ মুখ্যতঃ ভৌগোলিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আবার ইতিহাসের বর্ণনা ও নানা ঘটনা থেকে ভূগোলবিদরা সংশ্লিষ্ট দেশ ও এলাকার ভৌগোলিক বিবরণ জানতে পারেন এবং তা নিয়ে তাদের চিন্তাধারা পুনর্গঠনের সুযোগ পান।

মুখ্যতঃ ভৌগোলিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিষয়টির উপর আরও জোর দিয়ে তিনি বলেন যে, ভৌগোলিক ভিত্তি ছাড়া ইতিহাসের মানুষের কর্মকাণ্ডের বর্ণনা নিরর্থক। এতে বাস্তবতার কোন স্পর্শ থাকে না। নিদ্রিষ্ট ভৌগোলিক পরিবেশে মানুষের কর্মকাণ্ড সংগঠিত হয়ে থাকে। ভূমির গঠন, উর্বরতা, উৎপন্ন দ্রব্য, জলবায়ু, প্রকৃতি নানাভাবে মানুষের কার্যক্রমের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এই দৃষ্টিভঙ্গি এখন সাধারণ রূপ নিয়েছে। ভারত ও ভারতবর্ষের লোকদের উপর প্রকৃতি, জলবায়ু, আবহাওয়া, পরিবেশের যে বিপুল প্রভাব রয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সুদূর অতীত থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস ও ভারতীয়দের জীবনযাত্রা ভূগোল ও পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। ভারত উপমহাদেশ ও বাংলার ইতিহাসে ভৌগোলিক প্রভাব কার না জানা।

অন্যদিকে ইতিহাসের বর্ণনা ও নানা ঘটনা থেকে ভূগোলবিদেরা সংশ্লিষ্ট দেশ ও এলাকার ভৌগোলিক বিবরণ যেমন জানতে পারেন তেমনি তা নিয়ে তাদের চিন্তাধারা পুনর্গঠনেরও সুযোগ পান। তাই ইতিহাস ও ভূগোল পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে।

প্রশ্ন

১। কোন ঐতিহাসিক সর্বপ্রথম মানুষের কর্মকাণ্ডের সাথে ভূগোল ও পরিবেশের নিবিড় সংযোগের কথা বেশ জোর দিয়ে বলেছিলেন?

১.২.৬.৫ : ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান

ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীরা উভয়ের মধ্যে বিষয়গত সম্পর্কের উপর জোর দিয়েছেন। আগষ্ট কৌতকে সমাজবিজ্ঞানের জনক বলা হয়। আবার তিনি ইতিহাসচর্চার বিকাশের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। অতএব কৌত ছিলেন একাধারে সমাজবিজ্ঞানী ও ইতিহাস গবেষক। ঠিক একই কথা ভালভাবে প্রযোজ্য কার্ল মার্কসের ক্ষেত্রে। মার্কস ছিলেন একজন মহান সমাজবিজ্ঞানী, আবার ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর অমূল্য অবদান রেখে গেছেন। অতএব সে দিক দিয়ে বিচার করলে তিনি একজন মহান ঐতিহাসিকও ছিলেন।

সমাজ বিজ্ঞানের জনক আগষ্ট কৌত ইতিহাস চর্চার বিকাশের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান সামাজিক প্রেক্ষাপটে মানুষের কর্মকাণ্ড নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে। জ্ঞান অনুশীলনের ক্ষেত্রে এই দুটি শাখার মধ্যে বিরামহীন ও ফলদায়ক লেনদেন অব্যাহত।

ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান এই উভয় বিষয়টি সামাজিক প্রেক্ষাপটে মানুষের কর্মকাণ্ড নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে থাকে। এক্ষেত্রে বিষয় দুটির মধ্যে পার্থক্য হল শুধু পদ্ধতিগত ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে বিভিন্নতা। অবশ্য জ্ঞান অনুশীলনের ক্ষেত্রে এই দুই শাখার মধ্যে বিরামহীন ও ফলদায়ক লেনদেন অব্যাহত আছে।

অবশ্য অধুনা ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য নজরে পড়ছে। সমাজবিজ্ঞানীগণ দু ধরনের কাজে নিয়োজিত আছেন। কাজকর্মের প্রথম ধাপে তারা মানুষের কর্মকাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ এলাকাগুলো ধরে একটা ব্যাপক ও বৃহত্তর প্রেক্ষাপট তৈরি করেন। এ কাজে তারা ইতিহাস থেকে মাল-মশলা ও তথ্যাদি সংগ্রহ করে থাকেন। সমাজবিজ্ঞানের এই যে পদ্ধতি অর্থাৎ ইতিহাসের উরপর নির্ভরশীলতা— এই কথা সমাজবিজ্ঞানীরা অস্বীকার করেন না। অবশ্য প্রত্যুত্তরে ইতিহাসও সমাজবিজ্ঞানীদের কাছ থেকে সুবিধা নেয়। যেমন সমাজবিজ্ঞানীদের প্রদত্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে তারা অনেক কিছু গ্রহণ করে থাকেন। সমাজবিজ্ঞানীগণ তাদের কার্যক্রমের দ্বিতীয় ধাপে অধুনা মানুষের সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কার্যকলাপ ও তৎপরতা নিয়ে বিশদ ও বিস্তারিত গবেষণায় ব্যস্ত আছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই এই ধরনের প্রক্রিয়ার উদ্ভট ঘটে। অনুরূপ জ্ঞানচর্চায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রাধান্যলাভ করে ও ফলপ্রসূ হয়। বিশেষ করে জমি জরিপ কৌশল ও প্রশ্নমালা পদ্ধতির মধে এ প্রক্রিয়ার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই পদ্ধতি অনুসরণ করে ইতিহাস চর্চাকেও আরও অনেক বেশি বিজ্ঞানসম্মত করা যেতে পারে।

প্রশ্ন

১। সমাজ বিজ্ঞানের জনক কে?

১.২.৬.৬ : ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব

ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের মধ্যে সম্পর্ক নিবিড়। ইতিহাস লেখার সময়ে ঐতিহাসিক যে সব উপাদান ব্যবহার করে থাকেন তাকে সাহিত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক এই দুই প্রধান শ্রেণীতে চিহ্নিত করা যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের

প্রত্নতত্ত্ব আবিষ্কারের ফলে ইতিহাস হয়ে উঠল যুক্তিভিত্তিক বিজ্ঞান সম্মত ও নিরপেক্ষ। ঐতিহাসিকেরা নির্মোহ ও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাসের মালমশলা প্রত্নতত্ত্ব থেকে সংগ্রহ করেন। প্রত্নতত্ত্বের আবিষ্কারের ফলেই পৃথিবীর অনেক দেশের ইতিহাসের প্রাচীন অতীত ঐতিহ্য জানা সম্ভব হয়েছে। এজন্য বলা যেতে পারে, “Archaeology is the backbone of history”.

আবার প্রকারভেদ আছে যথা লিপিতত্ত্ব বা লেখমালা, হস্তলিপি বিজ্ঞান, মুদ্রা, স্মৃতি-সৌধাদির চিহ্ন বা ধ্বংসাবশেষ। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান থেকে যে সব তথ্য পাওয়া যায় তা অত্যন্ত প্রামাণ্য ও গ্রাহযোগ্য। সাহিত্যিক উপাদানে অনেক সময় অতিশয়োক্তি থাকে বা নানা দোষ ত্রুটি থাকে। সে দিন দিয়ে তুলনামূলকভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান অনেক বেশি নির্ভরশীল। ইতিহাস রচনায় প্রত্নতত্ত্বের বিশেষ ভূমিকা ও গুরুত্ব রয়েছে। পৃথিবীর বহু দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও নানা চিহ্নাদি প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে জানা সম্ভব হয়েছে। ভারতবর্ষের হরপ্পা সভ্যতার আবিষ্কার প্রত্নতত্ত্বের বিরাট সাফল্যে সম্ভব হয়েছে। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এশিয়াটিক

সোসাইটি অফ বেঙ্গলের প্রচেষ্টায় এশীয় পুরতত্ত্ব, লিপিতত্ত্ব, নানা দেশ থেকে জ্ঞানসম্পদ ও প্রত্নসংগ্রহের কাজ ত্বরান্বিত হয়েছিল। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সরকারের জদ্যোগে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের সংগঠনে ফলে

সরকারি অনুদানে লুপ্ত বা বিস্মৃত প্রায় ইতিহাসের নানা স্মৃতির সন্ধান শুরু হয়েছিল। তাই ইউরোপীয় পণ্ডিত সমাদের উদ্যোগে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পুনরুদ্ধারের কাজ শুরু হয়েছিল। এই প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে ইতিহাস রচনার সময় ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটল। এর পূর্বে ঐতিহাসিকরা প্রধানতঃ আদর্শবাদী, কল্পনাপ্রবণ সাহিত্য, পুরোহিত সমাজের ধর্মীয় পুঁথিপত্র, পুরাণ, ধর্ম কথার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হতো। তাই প্রত্নতত্ত্বের আবিষ্কার ইতিহাসকে যুক্তিভিত্তিক ও বিজ্ঞানসম্মত পর্যায়ে নিয়ে এল। ইতিহাস হয়ে উঠল অনেক বেশি পরীক্ষিত সত্য, নিরপেক্ষ। ঐতিহাসিকেরা নির্মোহ ও নৈব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাসের মালমশলা প্রত্নতত্ত্ব থেকে সংগ্রহ করতে পারলেন। অতএব প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে প্রায় মিথিকেল ইমেজ বা কল্পনা প্রসূত আবছারূপের পরিবর্তন ঘটল। নিঃসন্দেহে পুরাতাত্ত্বিক এই ক্রিয়াকর্ম প্রত্ন আবিষ্কারের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। লক্ষণীয়, জাতীয় চেতনার উন্মেষের লগ্নে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা ও জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা অতীত ভারতীয় জীবনের গৌরবময় চিত্রটা যেন লুফে নিয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য ও সভ্যতা-সংস্কৃতির গর্বিত রূপটি ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে মধ্যবিত্তদের অনুপ্রাণিত করেছিল।

প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারে ফলে আমাদের ইতিহাসের রচনায় জনতত্ত্ব এবং সমাজতাত্ত্বিক রীতিপদ্ধতি অনুযায়ী বিশ্লেষণের প্রসার ঘটে।

তবে প্রত্নতাত্ত্বিক মাল মশলাগুলি ইতিহাস নয়, ইতিহাসের উপাদানমাত্র। তারা ইতিহাসে ব্যবহারের জন্য নির্বাচনের অপেক্ষায় থাকে। যতক্ষণ না পর্যন্ত ঐতিহাসিক ঐ উপাদানগুলিকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসে পরিণত করেছেন ততক্ষণ পর্যন্ত সে সব তথ্য মৃত, অর্থহীন। নির্বাচন তথ্য যখন ঐতিহাসিকের অতীত সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার স্পর্শ পায় এবং ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিশেষ মূল্য ও ঘটনার সম্পর্কের ভিত্তিতে বিন্যস্ত হয়, তখনই তার ইতিহাস রূপে অভিহিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। মৌর্য সম্রাট অশোকের রাজত্বকালের ইতিহাস আমরা প্রধানত জানতে পারি বিভিন্ন ধরনের লিপিতত্ত্ব থেকে। এই সব লিপি ব্রাহ্মী ও ঘরোয়া ভাঙা লেখা ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ভাষাতত্ত্ববিদগণ তাদের পাঠোদ্ধার করে ইতিহাস পুনরুদ্ধার করতে পেরেছেন। ইতিহাসের অনেক মাল-মশলা আমাদের হাতে এসেছে। মৌর্য পরবর্তী যুগ থেকে শুরু করে কুষাণ যুগ পর্যন্ত অনেক ইতিহাস আমরা মুদ্রা থেকে উদ্ধার করতে পারি। এক্ষেত্রে সাহিত্যিক উপাদান প্রায় নেই বললেই চলে। গুপ্তযুগের রাজাদের কাহিনীও আমরা লিপি ও মুদ্রা উদ্ধার করতে পারি। প্রাচীন বাংলার সভ্যতা সংস্কৃতির ইতিহাসের প্রধান উপাদানগুলি প্রত্ন আবিষ্কারের ফলেই পাওয়া গেছে।

তবে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলিও সম্পূর্ণ ক্রটিমুক্ত নয়। তাই এই উপাদানগুলিও ঐতিহাসিকদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সময় অন্য সূত্র থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। লিপি বা মুদ্রার পাঠোদ্ধার করে প্রথম যিনি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন, তাঁর প্রবণতা, সমসাময়িককালের মূল্যবোধ ও মানসিক গঠন এবং বর্তমানে দাঁড়িয়ে যে ঐতিহাসিক ঐ ঘটনাকে কাজে লাগাচ্ছেন, তাঁর মন ও পরিবেশ বিভিন্ন পর্যায়ের। সময়সীমার দুই প্রান্তে অবস্থিত এই দুই ব্যক্তির মানসিকতা কিছুতেই এক হতে পারে না। প্রথমে যিনি ঘটনাকে স্তম্ভে বা পাথরের উৎকীর্ণ করেছেন, তিনি হয়তো ঐ কাজটি করেছেন হয়তো বা বিশেষ কোনো তাগিদে, হয়তো প্রচারের উদ্দেশ্যে। অনেক সময় রাজ-রাজদারা তাদের মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে লিপি বা মুদ্রার তাদের কীর্তিকলাপের কাহিনী অতিরঞ্জিত করতেন। অনেক সময় সভাকবিরাও তাদের প্রভুকে তোষণ করার জন্য প্রশস্তিমূলক লিপি বা পাথর উৎকীর্ণ

করতেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে সমুদ্রগুপ্তের হরিষেণের ‘এলাহাবাদ প্রশস্তির’ কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে তা সত্ত্বেও একথাও সত্য যে এগুলি আমাদের মূল্যবান উপাদান। প্রত্নতত্ত্ব থেকেই প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এই সব প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণগুলির সংশোধন ও পরিমার্জন সম্ভব নির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যাত ও গৃহীত কোনো তুলনামূলক আলোচনার মানদণ্ডের সাহায্যে। বিশেষ ধরনের কতকগুলি তথ্যের বিকৃতিথবা ঘটনার আদর্শচয়নও এড়াতে পারা যায় সামালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমেই।

সবশেষে বলা যায়, প্রত্ন আবিষ্কারই ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে, অনেক দেশ—নগর, সভ্যতা, সংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের অজানাকে করেছে জানা। প্রত্নতত্ত্বের আবিষ্কারের ফলেই পৃথিবীর অনেক দেশের ইতিহাসের প্রাচীন অতীত ঐতিহ্য জানা সম্ভব হয়েছে। প্রত্নতত্ত্বের সাহায্য না পেলে ঐতিহাসিক ও তার তথ্য অনেকটাই পিছিয়ে থাকত। বলা যেতে পারে ‘প্রত্নতত্ত্ব ইতিহাসের মেরুদণ্ড’ (Archaeology is the backbone of history).

প্রশ্ন

১। কত সালে এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল প্রতিষ্ঠিত হয়?

১.২.৬.৭ : ইতিহাস ও নৃতত্ত্ববিদ্যা

নৃতত্ত্ববিদ্যা নানা দিক দিয়ে ইতিহাস লিখনে ও পাঠে সাহায্য করতে পারে। অনেক অজানা বিষয় নৃতত্ত্ববিদ্যা ঐতিহাসিকদের কাছে পরিচিত করে তুলতে পারে। এর ভিত্তিতে গবেষক ও ঐতিহাসিকরা নতুন আলোকে ইতিহাস রচনা করতে পারেন। নৃতত্ত্ববিদরা তাদের কাজকর্মের মধ্য দিয়ে সমাজের এক ব্যাপক অংশের মানুষের নানা ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে পরিচিত হন। সমাজের নানা মানুষের জীবনযাত্রা, খাদ্যদ্রব্য, অর্থনৈতিক ও সামাজিক

নৃতত্ত্ববিদরা তাদের কাজকর্মের মধ্য দিয়ে সমাজের নানা মানুষের জীবনযাত্রা, খাদ্যদ্রব্য, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপ জানতে পারেন। এই সমস্ত বিষয় জানা ঐতিহাসিকদের কাছেও একান্ত প্রয়োজনীয়। ঐতিহাসিককে এই কাজে সাহায্য করে থাকেন নৃতত্ত্ববিদগণ। নৃতত্ত্ববিদদের দেওয়া তথ্য থেকেই আমরা জানতে পারি যে মানুষ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে কিভাবে মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় তারা পরিশ্রম করে এবং নানা মানুষের সান্নিধ্যে এসে জানতে পারেন। আবার সামাজিক মানুষের এই সমস্ত বিষয় জানা ঐতিহাসিকদের কাছেও একান্ত প্রয়োজনীয়। ঐতিহাসিককে এই কাজে সাহায্য করেন নৃতত্ত্ববিদগণ। প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের ধারণা ও ইতিহাসের মাল-মশলা সংগ্রহের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছেন নৃতত্ত্ববিদরা। এরফলে ইতিহাসের ধারার কোন একটি সময়ে যে ধারণা ছিল যে আর্যদের ভারত আগমনের

সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষের ইতিহাস শুরু হয়েছে, তা আজ ভ্রান্ত ধারণা হিসেবে প্রমাণিত। নৃতত্ত্ববিদার প্রাচীন প্রস্তরযুগ, মধ্য প্রস্তর যুগ ও নব্য প্রস্তর যুগের মানুষদের সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের অনেক উপকরণ দিয়ে সাহায্য করেছেন। পরস্পরের আদান-প্রদানের ফলে ইতিহাস সমৃদ্ধ হয়েছে। আদিম ভারতীয় জনসমাজের নানা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে, বিভিন্ন আদিবাসী উপজাতিদের জীবনের নানা দিক সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালিয়ে নৃতত্ত্ববিদরা ঐতিহাসিকদের কাছে নানা তথ্য উপস্থাপিত করতে সক্ষম হয়েছেন। আর এইসব নানা তথ্য আজ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান লাভ করেছে। ঐতিহাসিকগণ এইসব তথ্যকে নানা দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করেছেন।

আদিবাসী-উপজাতিদের ইতিহাস আজ ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর ইতিহাসের মূল্যবান বিষয়বস্তু। নৃতত্ত্ববিদরা বনভূমির সঙ্গে আদিম অধিবাসীদের কিভাবে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এবং বনভূমিতে তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের ধারা কোন গতিতে এবং ছন্দে চলেছিল তার উপর নানাভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে গেছেন। তাদের দেওয়া তথ্য থেকেই আমরা জানতে পারি যে মানুষ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্য কিভাবে মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। প্রাকৃতিক ও বনজ সম্পদের ব্যবহার ও সুপ্রচলিত ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণালাভের ক্ষেত্রে নৃতত্ত্ববিদরা যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। আজ এর ফলেই ঐতিহাসিকগণ প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ এবং ব্রিটিশদের আগমনের পর এর যথেষ্ট ব্যবহার সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ ঔপনিবেশিক বাতাবরণে করবার চেষ্টা করছেন। বনভূমিকে অগ্নিদগ্ধ করবার পর সেই জমিতে যে অস্থায়ী চাষাবাদ হত তার বিবর্তন সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন নৃতত্ত্ববিদরা। এই ধরনের গবেষণা আজ ঐতিহাসিকদের নানাভাবে সাহায্য করছে। এইসব নানা দিক বিচার করে বলা যায় যে, 'Anthropology is living history'.

প্রশ্ন

১। নৃতত্ত্ববিদ্যা কিভাবে ইতিহাসকে সাহায্য করেছে?

১.২.৬.৮ : ইতিহাস ও ভাষাবিদ্যা

যথার্থ ইতিহাস লেখার জন্য ভাষাবিদ্যা আয়ত্ত করা একান্ত প্রয়োজন। ঐতিহাসিককে ইতিহাস লেখার জন্য নানা ভাষা শিখতে হয়। আবার এ কাজে ইতিহাসবিদ ও গবেষকদের সাহায্য করতে পারেন ভাষাবিদগণ। বিভিন্ন ভাষায় লেখা নানা উৎসবের, লিপির পাঠোদ্ধার করা ভাষাবিদগণের পক্ষেই সম্ভব।

ইতিহাস লেখার পদ্ধতির মধ্যে প্রধান হল প্রাথমিক উৎসের বা উপকরণের সন্ধান, এইসব উৎস নানাভাষায় লেখা। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় যে, প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে লিপি বা লেখ একান্ত অপরিহার্য উপাদান। কিন্তু এইসব লিপি তামিল, তেলেগু, পালি, সংস্কৃত ও আরও নানাভাষায় লেখা রয়েছে। অনেক সময় স্থানীয় ভাষায়ও অনেক উৎস রচিত হয়েছে। এইসব গুরুত্বপূর্ণ লিপির পাঠোদ্ধার করার জন্য সেইসব লিপির ভাষা জানা আবশ্যিক। এ কাজে ঐতিহাসিককে সাহায্য করেন ভাষাবিদগণ।

ইতিহাস লেখার পদ্ধতির মধ্যে প্রধান হল প্রাথমিক উৎসের বা উপকরণের সন্ধান, এইসব উৎস নানা ভাষায় লেখা। একাজে ঐতিহাসিককে সাহায্য করেন ভাষাবিদগণ।

আবার যখন কোন ঐতিহাসিক মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস রচনার কাজে ব্যস্ত থাকেন তখন তাকে সুলতানিযুগে প্রচলিত ভাষাসমূহ এবং মোগলযুগে প্রচলিত ভাষাসমূহ জানতে হবে। নচেৎ তিনি মূল উপাদানগুলির অধিকাংশ যা আরবি, ফারসি, উর্দু এবং আরও নানা আঞ্চলিক ভাষায় লেখা রয়েছে তার পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হবে না। আর এগুলির পাঠোদ্ধার না করে যিনিই ইতিহাস লেখেন তার ইতিহাস মোটেই বিজ্ঞানসম্মত, প্রকৃত ইতিহাসের মর্যাদালাভ করতে পারবে না। অতীতে যে সব প্রথিতযশা ঐতিহাসিকগণ মারাঠা, মোগল ও সুলতানি যুগের উপর কাজ করেছেন তাঁরা বৈজ্ঞানিক ইতিহাস লিখতে গিয়ে পদ্ধতিগতভাবে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষালাভ করেছেন। যদুনাথ সরকার বা সুরেন্দ্রনাথ সেনের মত অতীতের প্রথিতযশা ঐতিহাসিকেরা নানাভাষায় পারদর্শী ছিলেন এবং এর

ফলেই তাঁদের ইতিহাস অনেক বৈজ্ঞানিক ইতিহাসসম্মত হয়েছে। আধুনিককালের প্রথিতযশা ঐতিহাসিকেরাও একই পদ্ধতি অবলম্বন করে নানা ভাষা আয়ত্ত করে প্রাচীন, মধ্যযুগ ও আধুনিকযুগের ভারতের ইতিহাসের নানাদিক বিচার বিশ্লেষণ করে চলেছেন। এটা শুরু ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ নয়, সারা বিশ্বের প্রথিতযশা ঐতিহাসিকদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং পশ্চিমের দেশগুলি ঐতিহাসিকেরা ভাষাজ্ঞানের গুরুত্বের কথা প্রথম তাদের ইতিহাস রচনায় তুলে ধরেছেন। অতএব এই দুর্দহ কাজে ঐতিহাসিককে অবশ্যই সাহায্য করতে পারেন নানা ভাষায় দক্ষ ভাষাবিদগণ। অতএব ইতিহাসের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক বর্ধীর, একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যারা ভাষাবিদ্যা অর্জন না করে ইতিহাস রচনায় লিপ্ত হন তাদের প্রধানতঃ দ্বিতীয় সারির উপাদানগুলির ওপর নির্ভর করতে হয়। এর ফলে ইতিহাসের তথ্য ও বিশ্লেষণ সঠিক হওয়া সম্ভব নয়। সেরকম ইতিহাস যতার্থ ইতিহাসের পরিপন্থী।

প্রশ্ন

১। ভাষাবিদ্যা অর্জন না করে ইতিহাস রচনায় লিপ্ত হলে ঐতিহাসিকদের কিসের উপর নির্ভর করতে হয়?

১.২.৬.৯ : ইতিহাস ও দর্শন

ইতিহাস ও দর্শনের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। চিন্তা ও মননের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ইতিহাসের গতি-প্রকৃতির ক্ষেত্রেও নানা বরিবর্তন নিয়ে আসে। অনেক সময় দর্শনের প্রভাবে বা দার্শনিকদের তত্ত্বের প্রভাবে রাজনীতি, সামাজ্য, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটেছে বা ঘটবার ব্যাপক সম্ভাবনা দেখা গেছে। বেশ কিছুকাল ধরেই ইতিহাসের অবশ্য পাঠ্য বিষয় সূচীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ইতিহাসের দর্শন। ঐতিহাসিককে যেমন দার্শনিকদের মতাদর্শের শরণাপন্ন হতে হয়, তেমনি দার্শনিকদেরও তাদের মতাদর্শের প্রচার, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও সার্থকতার জন্য ঐতিহাসিকদের দ্বারা উপনীত হতে হয়। একে অপরের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। ইতিহাসকে দেখা বা চর্চার জন্য একটা দর্শন রয়েছে এবং সেই প্রকৃত দর্শনের ফলেই ইতিহাসচর্চা (Historiography) সার্থকরূপ লাভ করতে পারে।

পৃথিবীর ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে ঐতিহাসিকরা, দুধরেনর উপকরণের সাহায্যে তাদের ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুকে যুক্তিবহ করে তোলেন। এক, দর্শনত্ব এবং দুই, ঐতিহাসিক তথ্য বা বিষয় সমূহ। প্রথমটির জন্য ঐতিহাসিকের দরকার দার্শনিকের। দ্বিতীয়টির জন্য দার্শনিকের একান্ত প্রয়োজন ঐতিহাসিকের। কারন একজন ঐতিহাসিকই কেবলমাত্র পারে দার্শনিকের তত্ত্ব বা মতবাদকে ইতিহাসগতভাবে বিচার করতে বা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সাজাতে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যেতে পারে। অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে চিন্তা ও মননের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের ঢেউ প্রবলমান ছিল। এই পরিবর্তন আলোকিত যুগের সূচনা করেছিল। এই নতুন চিন্তার বিশেষত্ব ছিল, দার্শনিকরা পূর্বের ভ্রান্ত দর্শন থেকে সরে এসে জনগণকে নতুন দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানদীপ্তির যুগে মন্টেস্কু, ভলটেয়ার, রুশো ও ফিজিওক্রাটরা এমন এক যুক্তিবাদী মতবাদ নিয়ে এসেছিলেন যা মানুষকে পৌঁছে দেয় পূর্ণতায়। আগেকার দর্শন-চিন্তার মূলসূত্র ছিল মানুষ

স্বভাবত অপূর্ণ (imperfect). পূর্ণতায় পৌঁছতে হলে তাঁর ঈশ্বরের করুণার প্রয়োজন আছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের দার্শনিকরা তাদের লেখার প্রচার করলেন যে পূর্ণতায় পৌঁছতে হলে মানবসমাজের প্রয়োজন যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ এবং ধর্মসম্পর্ক সংশয়াবাদ। নতুন দর্শন প্রতিষ্ঠিত করল এই সভ্য যে, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। অর্থনীতি ও সমাজ আবর্তিত হল যুক্তিবাদী দর্শনের প্রভাবে। ইতিহাসের কোন ঘটনার আগমনে বা বৈপ্লবিক পরিস্থিতি রচনায় দার্শনিকদের দর্শনতত্ত্ব মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করলো। এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হল ইউরোপের ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব। ইতিহাসের অনেক শাসকের শাসনকার্যের অনুপ্রেরণার পশ্চাতে দার্শনিকদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

পৃথিবীর ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে ঐতিহাসিকরা দুখরনের উপকরণের সাহায্যে তাদের ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুকে যুক্তিবহ করে তোলেন। এক, দর্শনতত্ত্ব এবং দুই, ঐতিহাসিক তথ্য বা বিষয়সমূহ। প্রথমটির জন্য ঐতিহাসিকের দরকার দার্শনিকের। দ্বিতীয়টির জন্য দার্শনিকের একান্ত প্রয়োজন ঐতিহাসিকের।

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিকের সংস্কারমূলক কার্যাদি তাঁর গুরু বেস্তামের উপযোগিতাবাদ তত্ত্বের বা দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। কার্ল মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বাস্তববাদ তত্ত্ব অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সারা বিশ্বে এক যুগান্তকারী আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ধনতান্ত্রিক সমাজে পুঁজিবাদী ও শ্রমিক এই দুই শ্রেণীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংঘর্ষ কার্ল মার্কসের তত্ত্বের মূল কথা ছিল। অতএব যুগে যুগে দেখা গেছে যে দর্শন বা দার্শনিক তত্ত্বসমূহ ইতিহাসের নিয়ন্ত্রী হিসেবে কাজ করেছে। তাই দর্শন ও ইতিহাস একে অপরের পরিপূরক হিসেবে সব সময়েই কাজ করে চলেছে। ইতিহাসের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে দর্শনের বা দার্শনিকদের ভূমিকা নিঃসন্দেহে উল্লেখের দাবী রাখে।

প্রশ্ন

১। ইতিহাস ও দর্শনের মধ্যে সম্পর্ক কি?

১.২.৬.১০ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

- ১। ইতিহাস অনুসন্ধান ৪ (গৌতম চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদিত)
ইতিহাস রচনায় প্রত্নতত্ত্বের ভূমিকা— অমিতা রায়।
- ২। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস— সুনীল চট্টোপাধ্যায় (প্রথম খণ্ড)
- ৩। ইতিহাস চর্চা— নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়।
- ৪। কাকে বলে ইতিহাস—ই. এইচ. কার।
- ৫। ইতিহাসতত্ত্ব— এম. দেলওয়ার হোসেন।
- ৬। ইতিহাস ও ঐতিহাসিক — মমতাজুর রহমান তরফদার।

১.২.৬.১১ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

- ১। ইতিহাসের সঙ্গে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সম্পর্ক আলোচনা কর।
- ২। ইতিহাসের সঙ্গে অর্থনীতির সম্পর্ক আলোচনা কর।
- ৩। ইতিহাসের সঙ্গে রাষ্ট্রনীতির সম্পর্ক আলোচনা কর।
- ৪। ইতিহাস ও দর্শন পরস্পরকে কিভাবে সমৃদ্ধ করেছে?
- ৫। ‘প্রত্নতত্ত্ব ইতিহাসের মেরুদণ্ড’—তুমি কি এই মত সমর্থন কর।
- ৬। ইতিহাসের সঙ্গে প্রত্নতত্ত্বের সম্পর্ক কেন নিবিড়?
- ৭। ইতিহাসের সঙ্গে নৃতত্ত্ববিদ্যার সম্পর্ক আলোচনা কর। নৃতত্ত্ববিদ্যা কিভাবে ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে?
- ৮। ইতিহাস লেখার জন্য ভাষাবিদ্যা আয়ত্ত করা কেন প্রয়োজন?
- ৯। ইতিহাস ও দর্শনের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর।
- ১০। ইতিহাস ও দর্শন পরস্পরকে কিভাবে সমৃদ্ধ করেছে?

পর্যায় গ্রন্থ - ৩

একক ৭

Orientalist, Imperialist, Nationalist, Theological

বিন্যাস ক্রম :

- ১.৩.৭.০ : উদ্দেশ্য (Objective)
- ১.৩.৭.১ : প্রাচ্যবাদ (Orientalism)
- ১.৩.৭.২ : সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসচর্চা (Imperialist Historiography)
- ১.৩.৭.৩ : জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চা (Theological Historiography)
- ১.৩.৭.৪ : ধর্মতত্ত্ব বা দিব্যতন্ত্র ইতিহাস চর্চা (Theological Historiography)
- ১.৩.৭.৫ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী (Suggested Readings)
- ১.৩.৭.৬ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Assignment)

১.৩.৭.০ : উদ্দেশ্য (Objective)

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন :

- (১) প্রাচ্যবাদ বলতে কি বোঝায়
- (২) প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার উদ্দেশ্য
- (৩) এই চর্চার ফলাফল
- (৪) এই চর্চর উদ্দেশ্য ও ফলাফল নিয়ে ঐতিহাসিক বিতর্ক
- (৫) সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাস বলতে কি বোঝায়
- (৬) সাম্রাজ্যবাদের বিভিন্ন পর্ব
- (৭) সাম্রাজ্যবাদের উত্তান ও পতনের কারণ—ঐতিহাসিক বিতর্ক
- (৮) জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
- (৯) এই ইতিহাসচর্চার ধারা
- (১০) এই ইতিহাসচর্চার ঐতিহাসিকদের নানা দৃষ্টিভঙ্গি এবং এই ইতিহাসচর্চার প্রসার।

১.৩.৭.১ : প্রাচ্যবাদ (Orientalism)

আঠারো শতকের অস্তিমপর্বে প্রাচ্যবিদ্যা কথাটি পণ্ডিত ও গবেষক মহলে পরিচিত লাভ করে। যারা এশিয়ার মানুষ ও সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা ও আলোচনা করতেন প্রধানত তাঁদেরই প্রাচ্যতত্ত্ববিদ বলে মনে করা হত। প্রাচ্য সম্বন্ধে এই অনুসন্ধানের ভিত্তি স্থাপন করেন কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম জোস্ফ ও বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার। এঁরা এশিয়ার সাহিত্য, ধর্ম, সংস্কৃতি ও দর্শন সম্বন্ধে অনুসন্ধানে ব্রতী হন। তাঁরা স্থানীয় ভাষা ও প্রাচ্যের পুরানো পবিত্র গ্রন্থগুলি ব্যবহার করেন। জ্ঞানদীপ্ত যুগের পৃথিবী সম্পর্কে আগ্রহের চিন্তাধারা তাদের অনুপ্রাণিত করেছিল। এছাড়া ব্যক্তিগত ভাবেও এশিয়ার সংস্কৃতি সম্পর্কে তাদের দুর্বলতা ছিল। প্রাচ্য সম্পর্কে তাতে দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুসন্ধানের পদ্ধতি ইতিহাস, সাহিত্য, নৃত্য, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে প্রভাবিত করেছিল। এর ফলে লণ্ডন, অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, প্যারিস, ব্রাসেলস, হাইডেলবার্গ, আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যবিদ্যায় পড়াশোনা ও গবেষণা করার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

কিন্তু ১৯৭৮ সালে এডওয়ার্ড সাইদ (Edward Said)-এর Orientalist বইটি প্রকাশিত হবার পর প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার উদ্দেশ্য ও ফলাফল সম্পর্কে বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে। তাঁর বক্তব্য হল গবেষক, ঐতিহাসিক ও পণ্ডিততেরা যেন প্রাচ্য বা Orient সম্পর্কে কতটা জানে ও তা কেমন করে জেনেছিল শুধু তার পুনঃপরীক্ষা করবে তাই নয়,

আঠারো শতকের অস্তিম পর্বে যারা এশিয়ার মানুষ ও সমস্কৃতি নিয়ে গবেষণা ও আলোচনা করতেন প্রধানত তাঁদেরই প্রাচ্যতত্ত্ববিদ বলে মনে করা হত। Edward Said এর 'Orientalism' বইটি প্রকাশিত হবার পর প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার উদ্দেশ্য ও ফলাফল সম্পর্কে বিতর্কের নতুন সূত্রপাত ঘটে। Edward Said তার 'Culture and Imperialism' গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, গত শতাব্দী জুড়ে সাম্রাজ্যবাহ পশ্চিমী সভ্যতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। রোনাল্ড ইনডেন, গৌরী বিশ্বনাথন, সারা সুলেরি, জাভেদ মজিদ, জ্ঞান প্রকাশ এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক যারা নিম্নবর্গীয় ইতিহাসচর্চার সঙ্গে জড়িত তারা দেখাতে চেয়েছেন কিভাবে ব্রিটিশ রাজ উত্থানের পথ প্রস্তুত করেছিল। আফ্রিকা, চীন, জাপান, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির ঐতিহাসিকরা ও post Orientalism ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

কেন তারা জানতে চেয়েছিল সে সম্পর্কে ও চিন্তা করবে। সঈচ প্রাচ্যতত্ত্বের মাধ্যমে পশ্চিমী উৎকর্ষতা ও আধিপত্য প্রকাশের ধারণাকে উন্মোচিত করেন। বিদ্যাচর্চার এই মাধ্যমে এশিয়া, আফ্রিকা ও মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলির উপর ইউরোপের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তার সম্পর্কে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। প্রাচ্য সম্পর্কে জ্ঞানচর্চা হয়ে উঠেছিল প্রাচ্যের উপর শক্তির প্রকাশ। কারণ এই চর্চার মাধ্যমে জানা যায় অ-পশ্চিমী মানুষদের কীভাবে অবদমিত করা হয়েছিল। এদেশের বিভিন্ন ভ্রামণকাহিনী, ঐতিহাসিকগ্রন্থ ও অন্যান্য রচনা ব্যবহৃত ও হয়েছিল। সাম্রাজ্য শেষ হবার পরও নয়। উপনিবেশবাদের মধ্য দিয়ে তথ্যের উপর আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। ইউরোপীয় পদ্ধতি, তত্ত্ব এবং শব্দ ব্যবহৃত হয়। ইউরোপীয় ও বিজিতদের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন Progress

vs Stagnation, adulthood vs childhood এবং reason vs superstition এই পার্থক্যগুলির মধ্য দিয়েই উপনিবেশিক শাসনের যৌক্তিকতা প্রামাণ্য করার চেষ্টা করা হয়। সঙ্গদের বক্তব্যে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেকে এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন। এই গবেষকরা বিস্তারিত ভাবে দেখানোর চেষ্টা করতে থাকেন যে Orientalism

কীভাবে ইউরোপীয় সভ্যতা গঠনে সাহায্য করেছিল এবং প্রাচ্যের জ্ঞান সেখানকার আদর্শে মূল্যবোধকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল। ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত Culture and Imperialism গ্রন্থে সঙ্গদ পুরানো বিতর্কে আবার ফিরে আসেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে গত দুই শতাব্দী জুড়ে সাম্রাজ্যবাদ পশ্চিমী সভ্যতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল।

পশ্চিমী পণ্ডিত মহলে সঙ্গদের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। যে সব ধারণার উপর ভিত্তি করে তাঁরা প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা করেছিলেন সেগুলি পুনঃপরীক্ষা ও পুনঃবিবেচনা করা হতে থাকে। এই ধরনের চিন্তাভাবনা ও চর্চাকে কেউ কেউ Post-Orientalism বলে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। তবে এই শব্দটি এখনও সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি। তবে Post-Orientalism ধারণাটিকে Post-structuralism এবং new historicism প্রভৃতি সমালোচনামূলক তত্ত্বের সঙ্গে একীকরণ করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। হোমি ভাবা, সারা সুলেরি, মেরী লুই প্র্যাট্ এবং গায়ত্রী স্পিভাক্ প্রমুখ গবেষকরা প্রাচ্যতত্ত্বের নতুন পরিপ্রেক্ষিত, বিশেষত্ব ও ফলশ্রুতি সম্পর্কে নতুন আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। এ সম্পর্কে ব্রিটেনের থেকেও আমেরিকায় আগ্রহ বেশি লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিমী ইতিহাসচর্চার মধ্য থেকেই Post-Orientalism এর বিরোধিতা এসেছে। জন ম্যাক্‌জি, ডেভিড কফ, বার্নার্ড লুইস্ প্রমুখ গবেষকরা মনে করেন কতকগুলি পছন্দের বিষয় নিয়ে তাদের সঙ্গমেলাতে চেয়েছেন, যেগুলি বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে মেলে না। ডেভিড ওয়াসব্রুক্ এবং রোজালিন্দ ও হনলন্ Post-Orientalism মতকে সমর্থন করে না। কারণ তাঁদের মতে, ক্ষমতার ভিত্তি বস্তুগত বাস্তবতাকে অস্বীকার করেছিল।

ম্যাক্‌জি মনে করেন সঙ্গদের Orientalism এবং Culture and Imperialism বই দুটি ঐতিহাসিকদের প্রভাবিত করেনি। ম্যাক্‌জির এই বক্তব্য অনেকেই সমর্থন করেননি। ১৯৮০ সালে annales-এর একটি বিশেষ সংখ্যায় ফরাসী ঐতিহাসিকদের Orientalism সম্পর্কে আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। রোনাল্ড ইনডেন, গৌরী বিশ্বনাথন, সারা সুলেরি, জাভেদ মজিদ, জ্ঞান প্রকাশ এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক যঁারা নিম্নবর্ণীয় ইতিহাসচর্চার সঙ্গে জড়িত তাদের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসচর্চার নিঃসন্দেহে প্রভাবিত হয়েছে। এরা দেখাতে চেয়েছেন কী ভাবে ব্রিটিশরা ভারতকে জানতে এবং তা কীভাবে ব্রিটিশ রাজ উত্থানেরপও প্রস্তুত করেছিল। আফ্রিকা, চীন, জাপান, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির ঐতিহাসিকরাও Post Orientalism ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ভি. ওয়াই. মুদিস্বের লেখা এবং জ্ঞান প্রকাশ সম্পর্কিত After Colonialism (১৯৯৫) গ্রন্থটি প্রাচ্যতত্ত্ব সম্পর্কে আরও গবেষণার যৌক্তিকতা প্রমাণ করে। সঙ্গদের বক্তব্যের সঙ্গে হয়তো অনেকেই একমত হবেন না, তবুও তিনি প্রাচ্যতত্ত্ব সম্পর্কে যে বিতর্কের সূচনা করেছেন তার ফলে এশিয়ার ইতিহাসচর্চা নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ হবে।

প্রশ্ন

- ১। কাদের প্রাচ্যতত্ত্ববিদ বলে মনে করা হত?
- ২। Edward Said ওর লেখা দুটি বইয়ের নাম কী কী?
- ৩। নিম্নবর্ণীয় ইতিহাস চর্চার সঙ্গে জড়িত কয়েকজনের নাম উল্লেখ কর।

১.৩.৭.২ : সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসচর্চা (Imperialist Historiography)

সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসকে প্রকৃত অর্থে ব্যাখ্যা করা কঠিন। এর কারণ হল দুটি। প্রথমতঃ জাতীয় ইতিহাসের মত সাম্রাজ্যীয় ইতিহাসকে কোন সঠিক ভৌগোলিক বা ক্রমকাল অনুযায়ী চিহ্নিত করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ

সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাস সাধারণত সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে গবেষণা ও চিন্তাভাবনা করে। সাম্রাজ্যবাদ বলতে বোঝায় একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রকর্তৃক একটি দুর্বল রাষ্ট্রের উপর নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব বিস্তার করা। 'Economic History Review' পত্রিকায় প্রকাশিত 'The Imperialism of Free Trade' প্রবন্ধে রোল্যান্ড রবিনসন ও জন গ্যালাহার মনে করেন উনিশশতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কেবলমাত্র আপাত কিছু পরিবর্তন হয়েছিল। কারণ ব্রিটেন তাহ স্বার্থ পরোক্ষ উপায়ে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিল এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী রাজ্য দখলও অব্যাহত রেখেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদের শেষ পর্ব বে-উপনিবেশীকরণ পর্বের সূচনা হয়।

সাম্রাজ্যীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি, পদ্ধতি ও কাঠামোগত কোন মিল নেই। কেবলমাত্র একটি ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে মিল দেখা যায়। সেটি হল যে তাঁরা সবাই সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে গবেষণা ও চিন্তাভাবনা করেন। কিন্তু সাম্রাজ্য বলতে কী বোঝায়? ধ্রুপদী ঐতিহাসিকেরা রোমান সাম্রাজ্যের কথা বলেন। যেখানে একজন সম্রাট যার হাতে ক্ষমতা থাকত এমন একটি রাজনৈতিক প্রথা। রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারত, চীন ও আমেরিকার রাষ্ট্র গঠনের মধ্যে কিছু মিল পাওয়া যায়। সাধারণ ব্যাখ্যা অনুযায়ী সাম্রাজ্য বলতে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের উপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণকে বোঝায়। কিন্তু এই ব্যাখ্যারও সমস্যা আছে। কারণ দেখা যায় একটি রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের উপর সার্বভৌমত্ব অধিকার না করেই তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। একে অঘোষিত সাম্রাজ্যবাদ বা সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ বলা যায়। ওয়াল্টার রডনি এবং আন্তোণ্ডোর ফ্রান্স এবং অন্যান্যরা একে নয়া উপনিবেশবাদ বা স্বাধীন রাষ্ট্রের উপর সাম্রাজ্যিক প্রভাব বিস্তার বলে বর্ণনা করেছেন। এজন্য সাম্রাজ্যবাদ বলতে বোঝায়

একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রকর্তৃক একটি দুর্বল রাষ্ট্রের উপর নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব বিস্তার করা। ওকে সাম্রাজ্যবাদের একটি শিথিল ব্যাখ্যা বলে মনে করা যায়।

১৫০০ সালের পর থেকে সাম্রাজ্যবাদের কয়েকটি পর্ব চিহ্নিত করা যায়। ভৌগোলিক আবিষ্কার এবং তাকে কেন্দ্র করে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে পর্তুগাল ও স্পেনের, এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকায় আধিপত্য বিস্তারকে সাম্রাজ্যবাদের প্রথম পর্ব বলা যায়। এর পরের পর্বে হল্যান্ডে, ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি বাণিজ্যিক অগ্রগণ্য দেশগুলি আধিপত্য বিস্তার করে। সূত্রপাত ঘটে মার্কেন্টাইলিজম যুগের। ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। একচেটিয়া কারবারের মাধ্যমে তারা বিপুল সম্পদ তৈরী করে। ১৫০০ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে দেখা যায় উপনিবেশ স্থাপন। ১৮৮০ সালের পরে সাম্রাজ্যবাদের আর একটি পর্ব শুরু হয়। একে বলা হয় নয়া সাম্রাজ্যবাদ। উইরোপের শক্তিশালী দেশগুলি আফ্রিকা ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে এই উপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মতো পুরনো সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সঙ্গে যুক্ত হয় জার্মানি, ইতালি, বেলজিয়ামের মত নতুন রাষ্ট্রগুলি। এমনকি স্পেন ও পর্তুগালেরও পুনরাবির্ভাব ঘটে। এই ঘটনাকে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের নতুন পর্ব হিসাবে ঐতিহাসিকরা চিহ্নিত করেছেন। উনিশ শতকের প্রথমভাগের মার্কেন্টাইল সাম্রাজ্য এবং ১৮৮০ দশকে নয়া সাম্রাজ্যবাদ যুগের মাঝখানে একটি অস্পষ্ট পর্বের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। এই সময়ে আবাধ বানিজ্য প্রভাবে এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অভ্যন্তরীণ সমস্যার ফলে সাম্যবাদের কঠোরতা হ্রাস পায়।

তাহলে কী এই সনয়ে সাম্রাজ্যবাদ পশ্চাদ অপসারণ করেছিল? তা সত্য নয়। কারণ উত্তর আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকাকে ইংল্যান্ড autonomy দিলেও এশিয়াতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সীমানা ক্রমশ বৃদ্ধিপেতে থাকে। অভ্যন্তরীণ সমস্যা সত্ত্বেও ফ্রান্স আলজিরিয়া দখল করে।

১৯৫৩ সালে 'Economic History Review' পত্রিকায় রোল্যান্ড রবিনসন ও জন গ্যালাহারের লেখা 'The Imperialism of Free Trade' প্রবন্ধটি সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাস চর্চার একটি নতুন পথ নির্দেশ করে। এঁরা মনে করেন, উনিশ শতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কেবলমাত্র আপাত কিছু পরিবর্তন হয়েছিল। কারণ ব্রিটেন তার স্বার্থ পরোক্ষ উপায়ে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিল এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী রাজ্য দখলও অব্যাহত রেখেছিল। উইলিয়াম রজার লুই সম্পাদিত 'Imperialism' গ্রন্থে রবিনসন ও গ্যালাহারের বিতর্ক সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন।

সাম্রাজ্যবাদের শেষ পর্ব হল বি-উপনিবেশীকরণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরই এই পর্বের সূচনা হয়েছিল। দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে স্থাপিত ইউরোপীয় উপনিবেশগুলিকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়। এরপর বি উপনিবেশীকরণ শুরু হয় আফ্রিকায়। ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে জিম্বাবোয়ে, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং পর্তুগীজ শাসি, মোজাম্বিক ও অ্যাঙ্গোলা ছাড়া আফ্রিকার অধিকাংশ উপনিবেশ স্বাধীন হয়ে যায়। বি-উপনিবেশীকরণের ইতিহাস যদিও খুব পুরানো নয়, তবুও ঐতিহাসিকরা এর নানা ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন। রবার্ট হল্যান্ড, পিটার কেইন, এ্যান্টনি হপকিনস মনে করেন, ইউরোপের পরিবর্তিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সূত্রপাত-রে ফলেই বিউপনিবেশীকরণ সম্ভব হয়েছিল।

অধিকাংশ ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক বিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদরা সাম্রাজ্যবাদের উত্থান সম্পর্কে এই মত পোষণ করেন যে ১৮৮০ সালের পর সাম্রাজ্যবাদের উত্থান হয়েছিল এবং তৎকালীন ইউরোপের অর্থনৈতিক চাপই এর প্রধান কারণ।

অন্যদিকে ডি.এ.লো.কে.ডি. হারগিবস এবং জন ডারউইন-এর বক্তব্য হল উপনিবেশিক দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের তীব্রতার ফলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি তাদের ক্ষমতা ধরে রাখতে পারছিল না।

ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক বিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদরা সাম্রাজ্যের উত্থান, ভিত্তি সৃষ্টিকরণ ও পতনের বিভিন্ন কারণ অনুসন্ধান করেছেন। তাঁদের অধিকাংশই মত হল ১৮৮০ সালের পর সাম্রাজ্যবাদের উত্থান হয়েছিল এবং তৎকালীন ইউরোপের অর্থনৈতিক চাপই এর প্রধান কারণ। বিংশ শতকের গোড়ায় জে.এ হবসন যুক্তি দেখান যে, ধনতন্ত্রীদের প্রয়োজনেই সাম্রাজ্যবাদের উত্থান হয়েছিল। কারণ তারা বিদেশে বিনিয়োগের সুযোগ খুঁজছিল। তারা তাদের নিজস্ব দেশের সরকারের কাছে রাজনৈতিক ও সামরিক সমর্থন চেয়েছিল। হবসনের বক্তব্যকে নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করেন লেনিন ১৯১৬ সালে লেনিন তাঁর বিখ্যাত বক্তব্য বলেছিলেন 'Imperialism is the highest stage of capitalism.' তিনি একথাও জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, কাঁচামাল ও বাজার দখল করার জন্য ধনতন্ত্রীদের সাম্রাজ্য গঠনের প্রয়োজন ছিল।

সব ঐতিহাসিকই মনে করেন না যে সাম্রাজ্যবাদের উত্থানের কেবলমাত্র অর্থনৈতিক কারণই ছিল। উনিশ শতকের কিছু চিন্তাবিদ মনে করেছিলেন যে সাম্রাজ্যবাদের পিছনে মানবহিতৈষী কারণও ছিল। তাদের মতে, দাস প্রথা বন্ধ করা ও নিম্নশ্রেণীর মানুষদের শিক্ষিত ও উন্নত করার প্রয়োজনেও সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজন ছিল। আবার অনেকে মনে করেন, মানবহিতৈষী হল সাম্রাজ্যবাদীদের একটা মুখোশ মাত্র।

আলফ্রেড ক্রস্‌বি, ফিলিপ কাটেন, ড্যানিয়েল হেডারিক প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা সাম্রাজ্যবাদের উত্থানের পরিবেশগত ও কারিগরী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অনেকে তাদের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছেন।

সাম্রাজ্যবাদের উত্থান ও বিকাশের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও কৌশলগত কারণের কথাও অনেকে বলেছেন। রবিনসন ও গ্যালহার তদের *Africa and the Victorians* (1961) গ্রন্থে আফ্রিকার ব্যবচ্ছেদে ইংল্যান্ডের অংশগ্রহণের কারণ অনুসন্ধান করেছেন এবং এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে ভারতের Strategic route গুলিকে রক্ষা করার জন্যই ব্রিটেনকে এই কাজ করতে হয়েছিল। অন্যদিকে বিখ্যাত ফরাসী ঐতিহাসিক হেনরী ব্রান্স্কউইগ (Henri Brunschwig) ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের পিছনে অর্থনৈতিক কারণের ব্যাখ্যা যারা দিয়েছেন তাদের কড়া সমালোচনা করেছেন। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের মূল কারণ অর্থনৈতিক নয়, দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দলাদলি। তাছাড়া ফ্রান্সে প্রশিয়ান যুদ্ধের পারজয়ের অপমান ঢাকা দিতে ফ্রান্সকে সাম্রাজ্যবাদের পথ গ্রহণ করতে হয়েছিল। জার্মানী অবশ্য অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যেই আফ্রিকা ব্যবচ্ছেদে অংশ নিয়েছিল।

লেনিন যথার্থই বলেছিলেন, *'Imperialism was the highest stage of capitalism'*. আবার উনিশ শতকের কিছু চিন্তাবিদ মনে করেন যে দাসপ্রথা বন্ধ করা ও নিম্নশ্রেণীর মানুষদের শিক্ষিত উন্নিত করার প্রয়োজনেও সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজন ছিল। অনেক ঐতিহাসিক সাম্রাজ্যবাদের উত্থানের ও বিকাশের ক্ষেত্রে পরিবেশগত ও কারিগরী ছাড়াও রাজনৈতিক ও কৌশলগত *Safety value* কারণের ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। সাম্রাজ্যবাদের উত্থানের এত ব্যাখ্যা থাকা সত্ত্বেও বেশির ভাগ ঐতিহাসিক অর্থনৈতিক কারণের উপরেই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অনেক ঐতিহাসিক দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, সাম্রাজ্যবাদ কেবলমাত্র ইউরোপের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক *elite*-দের প্রভাবিত করেছিল। ম্যাক্‌কঞ্জি মনে করেন সাম্রাজ্যবাদ উনিশ ও বিশ শতকের ইউরোপের উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছিল।

অনেক ঐতিহাসিক সাম্রাজ্যবাদের উত্থানের পিছনে *safety-value* তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। যেমন শ্রমিক শ্রেণীর তাৎক্ষণিক অভিযোগ প্রশমিত করার জন্য তাদের সাম্রাজ্যবাদ বনাম জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করার প্রবণতা। ক্রিস্টাল প্যালেসে ডিজরেলীর বিখ্যাত বক্তৃতা এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।

ঐতিহাসিক জোসেফ স্কম্পিটার সাম্রাজ্যবাদের সামাজিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, ইউরোপের জাতিগত ও জেন্ড্রি শ্রেণি পৃথিবী ব্যাপী শিল্প ও বাণিজ্যের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চিন্তিত হয়ে পড়েছিড় এবং সাম্রাজ্যবাদের মাধ্যমে তাদের মান মর্যাদা এবং সামাজিক স্থান বজায় রাখতে চেয়েছিল।

সাম্রাজ্যবাদের উত্থানের সামাজিক, রাজনৈতিক, কৌশলগত ও মানবিক ব্যাখ্যা সত্ত্বেও অধিকাংশ ঐতিহাসিক মনে করেন যে অর্থনৈতিক কারণের গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি। ইমানুয়েল ওয়ালার স্টেইন পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদের উত্থান ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন, ইউরোপ থেকে উদ্ভূত ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কীভাবে সমগ্র পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব কায়ম করেছে। ডেভিড ফিল্ডহাউস এবং ডব্লিউ. জি. হাইনস্ এই মত জোরালোভাবে সমর্থন করেছেন। সাম্প্রতিককালে পিটার কেইন ও এ্যান্টনি হপকিনস্ তাঁদের দু খণ্ডে লেখা গ্রন্থে সপ্তদশ শতাব্দী থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে ধনতন্ত্রের মধ্যেই সাম্রাজ্যবাদের বীজ নিহিত ছিল।

এ ছাড়া অনেক ঐতিহাসিক আছেন যারা আদৌ পূর্বোক্ত ব্যাখ্যাগুলি মানেন না। যেমন, জে.সি.ভ্যান.লুইর কথা বলা যায়। এই ডাচ ঐতিহাসিক দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ইউরোপীয় বণিকদের কার্যকলাপ নিয়ে কাজ করেছেন। তা ছাড়া আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা ও এশিয়ায় ইতিহাসের এলাকাভিত্তিক গবেষণা প্রকল্পগুলি থেকে জানা যায় যে, সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটেছিল স্থানীয় এলাকার intermediaries' এর সহযোগিতার ফলে। এরা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের স্থানীয় পরামর্শ ও মূলধন দিয়ে সাহায্য করেছিল। এই মধ্যসত্ত্বভোগীদের উপর বিদেশী বণিকদের নির্ভর করতে হয়েছিল। সি,এ, বেইলী তাঁর Imperial Meridian (1989) গ্রন্থে আঠারো ও উনিশ শতকে আফ্রিকা ও এশিয়ায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গঠনে এই স্থানীয় সহযোগিতার কথা বলেছেন।

সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভবের ব্যাখ্যা নিয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে। কিন্তু এর ফলশ্রুতি হিসাবে উত্তর-ওপনিবেশিক ও উত্তর-প্রাচ্যবাদী গবেষণার ক্ষেত্রে কতগুলি ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। ফ্রান্স ফ্যানন (Frantz Fanon) মনে করেন, সাম্রাজ্যবাদের ক্ষেত্রে শুধু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শোষণই হয়নি, নতুন প্রভুদের কাছে স্থানীয় মানুষদের identity ও সংকটের মুখে পড়েছিল। এর থেকে আর একটি প্রশ্ন উঠে আসে যে, অধীনস্থ মানুষদের সম্পর্কে পদ্ধতিগত জ্ঞান অর্জন করার মাধ্যমে কী সাম্রাজ্যবাদকে আরো শক্তিশালী করা হয়েছিল? এ প্রসঙ্গে, 'health, gender, law and nature' এর ক্ষেত্রে কীভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিস্তৃতি ঘটেছিল এবং তা ওপনিবেশিক শক্তির কার্যক্রমকে কতটা প্রভাবিত করেছিল সে সম্পর্কে ডেভিড আর্নল্ড, রিচার্ড গ্রোভ, মার্ক হ্যারিসন, রামচন্দ্র গুহ প্রমুখ ঐতিহাসিকরা তাঁদের গ্রন্থে আলোচনা করেছেন।

অনেক ঐতিহাসিক দেখানোর চেষ্টা করেছেন, সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে ইউরোপীয় সমাজের প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল? ব্যুর যুদ্ধ ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সম্পর্কে শ্রমিক শ্রেণি ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির আগ্রহ ছিল না। সাম্রাজ্যবাদ কেবলমাত্র ইউরোপের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক elite-দের প্রভাবিত করেছিল। অন্যদিকে এডওয়ার্ড সাইদ ও জন ম্যাককোঞ্জি মনে করেন সাম্রাজ্যবাদ উনিশ ও বিশ শতকের ইউরোপের উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণির সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছিল। মার্গারেট স্ট্রাবেল, মৃণালিনী সিংহ, গ্রাহাম ডসন, রোনাল্ড হায়াম, ফিলিপ্পালোভিন, জে,এম, ম্যাককোঞ্জি প্রমুখ ঐতিহাসিকরা সাম্রাজ্যবাদের ও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির সঙ্গে সম্পর্ক এবং নাগরিকত্ব ও জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছেন। এর ফলে সাম্রাজ্যবাদ ইতিহাসচর্চা এক নতুন ও আকর্ষণীয় এলাকায় প্রবেশ করেছে।

প্রশ্ন

- ১। সাম্রাজ্যবাদ কি?
- ২। নয়া উপনিবেশবাদ বলতে কি বোঝায়?

১.৩.৭.৩ : জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চা (Nationalist Historiography)

ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্র মনে করেন, ভারতের ইতিহাসের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা বলতে বোঝায় সেই সব রচনা যা জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রসারে এবং ধর্মীয়, জাতিগত ও ভাষাগত বিভেদ সত্ত্বেও ভারতীয় জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছিল। তবে তাঁর মতে, ঐতিহাসিক বা লেখকরা এই ধরনের কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে না লিখলেও তা ভারতের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারাকে পরিপুষ্ট করেছিল।

প্রাথমিকভাবে, উনিশ শতকের ভারতীয় ঐতিহাসিকরা ঔপনিবেশিক ইতিহাসচর্চার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিল। তাঁরা ইতিহাসকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে তথ্য অনুসন্ধান বলে মনে করতেন। ঔপনিবেশিক ইতিহাসচর্চা রাজনৈতিক

ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিক কর্তৃক ভারতীয় জনগণের অবমাননা ও অমর্যাদার প্রত্যুত্তরে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা ভারতীয়দের মনে জাতীয় আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার কাজে নিয়োজিত হন। ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকরা মনে করেন ঔপনিবেশিক শাসনই ভারতে এনেছে শান্তি শৃঙ্খলা, আইনের শাসন, আইনের চোখে সাম্য, অর্থনৈতিক উন্নতি এবং সামাজিক সমতার আদর্শের উপর ভিত্তি করে ভারতীয় সমাজের আধুনিকীকরণ। ভারতীয় ঐতিহাসিকরা আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে ভারতের গৌরবজনক ট্রাডিশনকে পশ্চিমী সভ্যতার থেকে মহৎ ও উৎকৃষ্টতর বলে মনে করেছিল। জাতীয়তাবাদী ইতিহাস চর্চার মূল বিষয় ছিল, পশ্চিমী সভ্যতার ও শাসনতন্ত্রে যা কিছু ভাল তা সবই ভারতে ছিল। ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকরা বলেন ভারতীয়দের মধ্যে কোন দেশাত্মবোধ বা জাতীয় ঐক্য ছিল না কিন্তু জাতীয়তাবাদ ঐতিহাসিকরা বলেন যে ভারতীয়দের মধ্যেও 'sense of Indian nationhood' ছিল।

ইতিহাস এবং বিশেষ করে শাসক বংশের ইতিহাসের উপর জোর দিয়েছিল। ঔপনিবেশিক লেখক ও ঐতিহাসিকরা আঠারো শতকের শেষ ও উনিশ শতকের প্রথমদিকে ভারতের ইতিহাস লিখতে শুরু করেন। তাঁরা যেমন সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য স্থাপনের কথা ভেবেছিলেন, তেমনি ইতিহাসের ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় ইতিহাস রচনায় প্রয়াসী হন। ঔপনিবেশিক শাসক ও ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকরা একই উদ্দেশ্য নিয়ে একই সময়ে পাশাপাশি চলেছিলেন। ঔপনিবেশিক শাসকরা আঞ্চলিক ও ধর্মীয় বিভেদের উপর ভিত্তি করে 'বিভাজন ও শাসন' (divide and rule) করার রাজনৈতিক নীতি অনুসরণ করেছিলেন। ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকরাও ভারতীয়দের ধর্মীয় ও অঞ্চলিক বিভেদের উপর ভিত্তি করে ভারতের ইতিহাস রচনা করেছিলেন। জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরাও সমগ্র ভারতের ইতিহাস লিখেছিলেন অথবা শাসকদের সম্পর্কে লিখেছিলেন যারা ভারতের বিভিন্ন অংশ শাসন করত। তবে তাঁরা ভারতীয়দের ধর্ম, জাতি এবং ভাষাগত সম্বন্ধের উপর জোর দিয়েছিলেন।

কিন্তু যেহেতু ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকরা ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনকে যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেছিলেন এবং ভারতের রাজনৈতির ও সামাজিক অগ্রগতিকে নঞর্থকভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন, এর বিরুদ্ধে ভারতীয় ঐতিহাসিকদের প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকরা ক্রমাগত দিনের পর দিন একটি বাঁধা-ধরা ঔপনিবেশিক ছকে ইতিহাস রচনা করতে থাকেন। এই ধরনের দুটি প্রাথমিক পাঠ্য বই হল জেমস মিলের প্রাচীন ভারত এবং ইলিয়ট ও ডসনের মধ্যযুগের ভারত। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে ভারতের জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা ও পাল্টা প্রজ্ঞাবাদী ছক তৈরী করেন। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যেমন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরোধিতা করেছিল, তেমনি ভারতের জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চা ও ঔপনিবেশিক ইতিহাসচর্চার বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিক কর্তৃক ভারতীয় জনগণের অবমাননা ও অমর্যাদার প্রত্যুত্তরে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা ভারতীয়দের মনে জাতীয় আত্মমর্যাদা বোধ জাগ্রত করার কাজে নিয়োজিত হন। দু পক্ষই দিনের পর দিন তাদের বক্তব্য ও লেখার ইতিহাসের দ্বারস্থ হয়। এমনকি কোন অস্পষ্ট ঐতিহাসিক বিষয় সম্পর্কে লেখার জন্য ভারতীয় ঐতিহাসিকরা প্রায়ই প্রথম দিকের ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করতেন।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অনেক ঔপনিবেশিক লেখক ও প্রশাসক এই ধারণা পোষণ করতেন যে ইতিহাসের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের জনগণ স্বায়ত্তশাসন, গণতন্ত্র, জাতীয় ঐক্য, জাতি-গঠন, আধুনিক অর্থনৈতিক উন্নতি এবং বিদেশী আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। ঔপনিবেশিক শাসন তাদের এই

সবদিকে উপযুক্ত করে তোলার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছিল। উপরন্তু তারা মনে করতেন, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আধুনিকতার পথে ভারতের উন্নতির জন্য ঔপনিবেশিক শাসন ও শাসকদের স্থায়ী উপস্থিতি প্রয়োজনীয় ছিল। ইউটিলিটারিয়ান ও মিশনারীরা যখন ভারতীয় সংস্কৃতির নিন্দা করছিলেন, তখন প্রাচ্যবাদীরা ভারতকে দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক মানুষদের জাতি হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। ভারতীয়দের সম্পর্কে এ ধরনের প্রশংসাসূচক কথা বললেও তাঁরা মনে করতেন, ইতিহাসগতভাবে ভারতীয়দের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক যোগ্যতা ছিল না। সেজন্য ভারতীয়রা তাদের আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ ঘটাক ওবিস্বকে প্রভাবিত করুক এবং অন্যদিকে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষার বিষয়গুলি ব্রিটিশদের হাতে ছেলে দিক। বস্তুতপক্ষে তাঁরা মনে করতেন, বিদেশী শাসনের অনুপস্থিতিতে ভারতে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নৈরাজ্য দেখা দেবে। উদাহরণ স্বরূপ তাঁরা বলেন যে, আঠারো ও উনিশ শতকের অরাজকতা থেকে ব্রিটিশরাই ভারতকে রক্ষা করেছিল। ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিক ও প্রশাসকরা মনে করতেন যে ভারতীয়দের ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনই তাদের নৈতিক অধঃপতনের কারণ।

অনেক ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিক এই মতও পোষণ করতেন যে প্রাচ্যের অন্যান্য দেশের মত ভারতও প্রকৃতিগতভাবে স্বৈরাচারী বা স্বৈচ্ছাচারী শাসকদের দ্বারা শাসিত হবার যোগ্য। এজন্যই ভারতে স্বৈরাচারী ব্রিটিশ শাসনের পত্তন হয়েছে। এই অভিমত 'প্রাচ্যের স্বৈরতন্ত্রের তত্ত্ব বা 'Theory of Oriental Despotism' নামে সর্বত্র পরিচিত। এইসব ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকরা আরও যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ভারত কোন শাসক শাসিতদের জন্য জনকল্যাণমূলক নীতি গ্রহণ করেনি। বস্তুতপক্ষে ভারতে প্রচলিত রাজনৈতিক সাম্রাজ্যগুলি প্রকৃতিগতভাবে ছিল 'monstrously cruel' সেইদিক থেকে বিচার করলে তুলনামূলকভাবে ব্রিটিশরা স্বৈরতান্ত্রিক হলেও তাদের শাসন ছিল যুক্তিসম্মত ও জনকল্যাণমুখী। ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকরা মনে করতেন, 'In contrast, with the cruel Oriental Despotism of the past, British rule was benevolent though autocratic.'

ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকরা আরও মনে করতেন যে ইউরোপীয়দের তুলনায় ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা ও জাতীয় ঐক্যের অভাব ছিল। ভারতীয়রা সব সময়ই বিভক্ত। ভারতীয়দের মধ্যে গণতান্ত্রিক ট্রাডিশন অনুপস্থিত। যখন ইউরোপীয়রা প্রাচীন গ্রীস ও রোমের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহন করে, তখন ভারতীয় ও প্রাচ্যের জনগণ বহন করে স্বৈরতন্ত্রের ঐতিহ্য। তাছাড়া ভারতীয়দের মধ্যে সৃষ্টিশীলতা ও নতুনত্বের পরিবর্তনমুখীতার গুণ অনুপস্থিত। এর ফলশ্রুতি হিসাবে দেখা যায়, প্রতিষ্ঠান, প্রথা, শিল্প ও কারিগরী কৌশল প্রভৃতি ভাল বিষয়গুলি বাইরে থেকে ভারতে এসেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ঔপনিবেশিক শাসনই ভারতে এনেছে শাস্তি শৃঙ্খলা, আইনের শাসন, আইনের চোখে সবাই সমান, অর্থনৈতিক উন্নতি এবং সামাজিক সমতার আদর্শের উপর ভিত্তি করে ভারতীয় সমাজের আধুনিকীকরণ।

ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকদের এইসব ধারণা ও বক্তব্য ভারতীয় ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিজীবীদের সম্মানে আঘাত করেছিল। এইসব মতামতের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকরা বোঝাতে চেয়েছিলেন যে ভারতীয় শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী মানুষদের স্বায়ত্ত্বশাসন, গণতন্ত্র, আইনগত সংস্কার প্রভৃতির দাবী ভারতের অতীত ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে অবাস্তব চিন্তা। প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের প্রকৃতি অনুযায়ী গণতন্ত্রের ধারণা ভারতে বিদেশী এবং সেজন্য তা ভারতীয়দের পক্ষে সুপ্রযুক্ত নয়।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে জাতীয়তাবোধের উদ্ভূত অনেক ভারতীয় এবং কিছু ইউরোপীয় লেখক ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকদের এইসব বক্তব্যকে চ্যালেঞ্জ করেন। বিস্তারিত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণার মাধ্যমে তাঁরা এই কাজ করেন। এর ফলে ভারতীয় ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে এক নতুন দিক উন্মোচিত হয়। কারণ ভারতীয় ঐতিহাসিকরা বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের কাজে মন দেয় ও প্রাথমিক উপাদানের উপর নির্ভর করতে শেখে। ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকদের ধারণাগুলি যে বুল তা প্রমাণ করার জন্য ভারতীয় ঐতিহাসিকরা একদিকে যেমন প্রচলিত ঐতিহাসিক উপাদানের উপর নির্ভর করেছিল, তেমনি অন্যদিকে নতুন নতুন তথ্যের খোঁজ করেছিল। ভারতের জাতীয় সম্মানে আঘাতের বেদনা তাঁদের নতুন গবেষণায় প্ররোচিত করেছিল। অর্থনীতিবিদরা করলেও পেশাদারী ঐতিহাসিকরা আধুনিক যুগ সম্পর্কে আলোচনা করতে চাননি। কারণ, যেহেতু তাঁদের অধিকাংশই সরকারী স্কুল ও কলেজে চাকরী করতেন সেজন্য তাঁদের ভয় ছিল উপনিবেশবাদের সমালোচনা করলে তাঁদের চাকুরী-জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাছাড়া তাঁরা সমসাময়িক বৃটিশ ঐতিহাসিক ধারণা গ্রহণ করেছিলেন যাতে বলা হয়েছিল বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস কখনই সাম্প্রতিক ও সমকালীন যুগ সম্পর্কে চর্চা করবে না।

ভারতীয় ঐতিহাসিকরা আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে ভারতের গৌরবজনক ট্রাডিশনকে পশ্চিমী সভ্যতার থেকে মহৎ ও উৎকৃষ্টতর বলে মনে করেছিল। বিশেষ করে তাঁরা পশ্চিমী সভ্যতার ‘বস্তুগত’ চরিত্রের সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার ‘নৈতিক গুণাবলী’র (moral values) তুলনা করেছিল। একই সঙ্গে তাঁরা কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেই ভারতীয়রা গুণসম্পন্ন এই ধারণাকে অস্বীকার করেন। তাঁরা ভারতীয়দের প্রশাসনিক দক্ষতা, সাম্রাজ্যগঠন, কূটনীতি, কর কাঠামো, সামরিক সংগঠন, যুদ্ধবিদ্যা, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যিক উন্নতি প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অনেক ঐতিহাসিক ভারতের অতীত কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সমকালীন ইউরোপের এই সব প্রতিষ্ঠানগুলির তুলনা করেন। প্রাচীন ভারতীয়রা রাষ্ট্র পরিচালনার অযোগ্য ছিল— ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকদের এই ধারণার তাঁরা তীব্র পরিবাদ করেন। এক্ষেত্রে তাঁরা বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আবিষ্কৃত ‘কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র’ গ্রন্থটি তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে তুলে ধরেন। এই গ্রন্থ প্রমাণ করেছিল যে ভারতীয়রা আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সঙ্গে শাসন ব্যবস্থা, কূটনীতি ও রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিল। অনেকেই কৌটিল্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তাঁকে ম্যাকিয়াভেলী ও বিসমার্কের সঙ্গে তুলনা করেন। তাঁর এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেন যে প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্র ছিল স্বেচ্ছাচারী ও স্বৈরতন্ত্রমূলক। তাঁরা বলেছিলেন, প্রাচীন ভারতের রাজারা সকলের জন্যই সুবিচারের বন্দোবস্ত করেছিলেন। অনেক ভারতীয় ঐতিহাসিক এই ধারণা নাকচ করে দেন যে ভারতীয় শাসকরা মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করেননি। অনেকে প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে আধুনিক গণতন্ত্রের সাযুজ্য লক্ষ্য করেছিলেন। জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা এই যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে প্রাচীন ভারতে সরকার কখনই দায়িত্বহীন ও খামখেয়ালী ছিল না। শাসনব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের পথ ছিল যদের মধ্য দিয়ে জনমত কার্যকরী হতে পারত। অনেক জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ভারতীয় রাজতন্ত্র ছিল নিয়ন্ত্রিত বা সীমাবদ্ধ এবং অনেকটাই সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের মত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কৌটিল্য বর্ণিত মন্ত্রি পরিষদকে ব্রিটেনের প্রিভি কাউন্সিলের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। সর্বোপরি, প্রাচীন ভারতে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েতের অস্তিত্ব ছিল। অনেক লেখক চন্দ্রগুপ্ত, আকবর ও শিবাজীর আমলে ‘assembly, parliament and cabinet system’-এর অস্তিত্বের কথা বলেছেন। এমনকি

যুদ্ধের সময় শাসকরা 'আন্তর্জাতিক আইন' মেনে চলতেন। এঁরা রাজাদের জোর করে কর আদায় করার বক্তব্যেরও বিরোধিতা করেছেন। ১৯১৫সালে প্রকাশিত Hindu polity গ্রন্থে ঐতিহাসিক কে.পি. জয়সোয়াল যুক্তি দেখিয়েছেন যে 'The ancient Indian political system was either republican or that of constitutional monarchy'.

জাতীয়তাবাদের ইতিহাসচর্চার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল : পশ্চিমী সভ্যতায় ও শাসনতন্ত্রে যা কিছু ভাল, তা সবই ভারতে ছিল। এজন্য ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার তাঁর 'Corporate life in Ancient India' গ্রন্থে লিখেছেন, 'Institutions which we are accustomed to look upto as of western growth had also flourished in India long ago.'

ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকরা বলেছেন যে ভারতীয়রা ধর্ম, আঞ্চলিকতা, ভাষা ও জাতিগতভাবে বিভাজিত ছিল এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা তাদের ঐক্যবদ্ধ করেছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসন অন্তর্হিত হলেই তাদের ঐক্য আবার বিনষ্ট হবে। এর অর্থ হল ভারতীয়দের কোন দেশাত্মবোধ বা জাতীয় ঐক্য ছিল না। জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন এই দাবি করে যে প্রাক-ঔপনিবেশিক ভারতে সংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঐক্য ছিল। এমনকি 'a sense of Indian nationhood' ও বিরাজ করত। 'কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থে 'জাতীয় রাজা'র প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছিল।

তবে ডঃ বিপান চন্দ্র ভারতীয় ঐতিহাসিকদের বক্তব্যের কিছু সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে ভারতীয় ঐতিহাসিকরা ঐক্যের কথা বললেও ভারতের ইতিহাস লেখার সময় বিভিন্ন সাম্রাজ্যকে আলাদাভাবে দেখানে হয়েছে এবং বিভিন্ন সাম্রাজ্যের পৃথক গুরুত্বের কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া এইসব ঐতিহাসিকদের মতে, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, অশোক, চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য এবং আকবর বিখ্যাত এই কারণে যে তাঁরা বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। ডঃ বিপান চন্দ্র এখানে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করেছেন বিশেষ করে 'গান্ধীযুগ' এর ক্ষেত্রে। একদিকে এইসব ঐতিহাসিকরা অহিংসা নীতির প্রশংসা করেছেন, আবার অন্যদিকে বিরাট সাম্রাজ্য গঠনের ক্ষেত্রে সম্রাটদের সামরিক শক্তির প্রশংসা করেছেন, একদিকে সম্রাট অশোককে তাঁর অহিংস নীতির জন্য প্রশংসা করা হয়েছে, আবার অন্যদিকে এর জন্য তাঁর সাম্রাজ্যের দুর্বলতার কথাও বলা হয়েছে। এ ছাড়া ডঃ বিপান চন্দ্র মনে করেন, এইসব ঐতিহাসিকরা ভারতের সংস্কৃতির কথা বললেও জাতিগত অত্যাচার, নিম্ন শ্রেণীর মানুষদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্গতি এবং পুরুষ প্রাধান্যের কথা উল্লেখ করেননি। এঁরা বিশ্বসভ্যতার ক্ষেত্রে ভারতের অবদানের ভূমিকার কথা বললেও ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে বিদেশের অবদানের কথা উল্লেখ করেননি। যাই হোক, প্রাচীন ভারত সম্পর্কে ইতিহাসচর্চা শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেছিল ১৯৩০-এর দশকে। পরবর্তীকালের লেখাগুলি প্রধানতঃ আগের পর্বের লেখার পুনরাবৃত্তি বলে মনে হয়।

১৯২০-এর দশক ও তার পরবর্তীকালে মধ্যযুগের ভারতের জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চা প্রসার লাভ করে। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ঔপনিবেশিক ও সাম্প্রদায়িক অভিগমনের বিরোধিতা করা। মধ্যযুগের ভারতের জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা প্রাচীন ভারত সম্পর্কে পূর্বসূরী জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রায় সবটাই গ্রহণ করেছিলেন। বিশেষ করে তাঁরা উত্তর ভারতে একটি মিশ্র সংস্কৃতির উদ্ভবের উপর জোর দিয়েছিলেন। এটা সম্ভব হয়েছিল

সাধারণ মানুষ ও উচ্চশ্রেণীর মানুষদের স্তরে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের ফলে। ভারতে স্থিতিশীল হবার পরও মুসলমান শাসকরা বিদেশী ছিল—এই ঔপনিবেশিক সাম্প্রদায়িক বক্তব্যকে অস্বীকার করেন জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা। তাঁরা এই মতেরও বিরোধিতা করেন যে হিন্দু ও মুসলমানরা পারস্পরিক দ্বন্দ্বের

জাতীয়তাবাদী ইতিহাস চর্চার প্রসার ঘটেছিল প্রধানতঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগকে কেন্দ্র করে। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা লাভের পর আধুনিক ভারতে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক গোষ্ঠার আবির্ভাব ঘটে।

মধ্যে বসবাস করত। তবে ঔপনিবেশিক নিন্দার বিরুদ্ধে তাঁরা যদিও ভারতের অতীত ইতিহাসকে গৌরবান্বিত করেছিল ও ভারতীয় সংস্কৃতির স্বপক্ষে কথা বলেছিল, তবুও জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা একটি প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য চেষ্টা করত। প্রশ্নটি হল : কীভাবে একটি ছোট বাণিজ্যিক কোম্পানী হাজার হাজার মাইল দূরের একটি দেশের সাহায্যে

ভারতের মত একটি বিশাল দেশ জয় করেছিল যে দেশের অতীত সভ্যতা ছিল গৌরবজনক। এইখান থেকেই ভারতীয় সভ্যতা ও সামাজিক কাঠামোর সমালোচনা শুরু হয়। একই সঙ্গে সামাজিক ইতিহাস ও বিশেষ করে জাতিভেদ প্রথা ও সমাজে নারীর স্থান বিষয়ে ইতিহাস চর্চার প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। সমসাময়িক জাতীয়তাবাদীদের ঔপনিবেশিকতার সমালোচনার ফলে প্রাক-ঔপনিবেশিক পর্বের অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনায় প্রাথমিক উদ্যোগ শুরু হয়। তাছাড়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যেহেতু একটি গণ আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল, সেজন্য ১৯৩০ এর দশকে ইতিহাসে সাধারণ মানুষের ভূমিকা নিয়ে চর্চা শুরু হয়। তবে ১৯৫০-এর দশকের পর এই ধারা ফলবতী হয়। তবে সীমিত উপাদান এইসব ঐতিহাসিকদের একটি প্রধান দুর্বলতা পূরে দেখা দিয়েছিল। তাঁরা প্রধানতঃ লিখিত উপাদানের উপর নির্ভর করেছিল। যদিও শিলালিপি ও মুদ্রার গুরুত্ব কোন অংশে কম ছিল না। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক চর্চা তখনও তার শৈশব কাটিয়ে ওঠেনি এবং নৃতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞানকে ব্যবহার করা খুবই নগণ্য ছিল। একইভাবে অর্থনীতিবিদ্যাও অর্থনীতিবিদদের কৃষ্ণিগত ছিল।

জাতীয়তাবাদী ইতিহাস চর্চার প্রসার ঘটেছিল প্রধানতঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগকে কেন্দ্র করে। আধুনিক ভারতে-এর অস্তিত্ব খুব কমই ছিল। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা লাভের পর আধুনিক ভারতের জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক গোষ্ঠার আবির্ভাব ঘটে। এর কারণ হল, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যুগ শিক্ষকদের পক্ষে ঔপনিবেশিক অধিকর্তাদের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বক্তব্য পেশ করা সহজসাধ্য ছিল না। স্বভাবতই ১৯৪৭-এর পর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বক্তব্য রাখা অনেকটাই নিরাপদ ছিল। এর ফলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বা ঔপনিবেশিক অর্থনীতির ইতিহাস রচিত হয়নি। এটাও কিন্তু ১৯৪৭ সালের আগে জাতীয়তাবাদী ইতিহাস চর্চার অনুপস্থিতির উপযুক্ত ব্যাখ্যা নয়।

উনিশ শতকের শেষের দিকে ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে একটি বিস্তারিত ও বিজ্ঞানসন্মত সমালোচনার উদ্ভব ঘটে। এই কাজ করেছিলেন শিক্ষা জগতের বাইরের লোকেরা এবং জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবাদরা। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন— দাদাভাই নওরোজী, বিচারপতি রাণাডে, জি.ভি. যোশী, আর.সি.দত্ত, কে.টি. তেলাঙ্গা, জি.কে.গোখেল ও ডি.ই. ওয়াচা। তাছাড়া বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কয়েকজন শিক্ষক অর্থনীতিবিদ এঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। এঁরা হলেন—কে.টি শাহ, ভি.কে.কালে, সি.এন.ভাকিল, ডি.আর.গ্যাড্‌গিল, জ্ঞান চাঁদ, ভি.কে.আর ভি রাও এবং ওয়াডিয়া। তাঁদের সমালোচনা সেই সময়ের ইতিহাস বইতে স্থান পায়নি। অবশ্য ১৯৪৭ রে পরে এবং বিশেষ করে ১৯৬০-এর দশকে ও তারপরে এঁদের লেখার গুরুত্ব স্বীকৃতি লাভ করে। তবে এঁদের বক্তব্য ও সমালোচনা ১৯২০ সালের পর গণ আন্দোলনের যুগের জাতীয়তাবাদী বিক্ষোভের মর্মকেন্দ্র হয়ে ওঠে।

তিলক, গান্ধীজী, জওহরলাল নেহেরু, সর্দার প্যাটেল এবং সুভাষচন্দ্র বসু এঁদের লেখার উপর ভীষণভাবে নির্ভর করেছিলেন। জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে যাঁরা ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখেছিলেন তাঁরা হলেন আর. জি. প্রধান, এ.সি.মজুমদার, জওহরলাল নেহেরু এবং পটুভি সীতারামাইয়া। উত্তর ১৯৪৭ পর্বের ঐতিহাসিকরা জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় আন্দোলনকে ন্যায়সম্মত বলে মেনে নিলেও ঔপনিবেশিকতার অর্থনৈতিক সমালোচনাকে এর ভিত্তি বলে মানতে চাননি। জাতীয় সংগ্রামের অন্যান্য ধারাগুলিকেও তাঁরা প্রায় গুরুত্ব দিতে চাননি।

আধুনিক ঐতিহাসিকরা এক্ষেত্রে দুভাগে বিভক্ত হয়েছেন। তারাচাঁদ প্রমুখ ঐতিহাসিকরা মনে করেন, উনিশ শতক থেকেই ভারত 'Nation-in-the-making' পর্যায়ে পৌঁছেছিল। অন্য একদল ঐতিহাসিক মনে করেন, প্রাচীন যুগ থেকেই ভারত একটি জাতি হিসাবে পরিণতি লাভ করেছিল। তবে একই সঙ্গে এঁরা সবাই ভারতের ভাষা, ধর্ম এবং সংস্কৃতিগত বৈচিত্র্য স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা শ্রেণি ও জাতকে কেন্দ্র করে ভারতীয় সমাজের অভ্যন্তরীণ পরস্পর বিরোধিতা এবং মহিলা ও উপজাতিদের উপর অত্যাচার ও তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের বিষয়গুলি এড়িয়ে গেছেন। তাঁরা শ্রেণি ও জাতিগত পীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলনের বিষয়গুলিকেও ইচ্ছাকৃতভাবে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। তাঁরা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের গভীরতর বিশ্লেষণ করেননি। ডঃ বিপান চন্দ্র বলেছেন, 'They often indulged in its blind glorification.' তাঁর মতে, তাঁরা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে অবহেলা করেছেন।

প্রশ্ন

১। 'প্রাচ্যের স্বৈরতন্ত্রের তত্ত্ব' বা 'Theory of Despotism' কি?

২। আধুনিক ভারতের জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর আবির্ভাব করে ঘটে?

১.৩.৭.৪ : ইতিহাসচর্চায় ধর্মতত্ত্ব বা দিব্যতত্ত্ব (Theological Historiography)

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ইউরোপে চার্চের উচ্চপদস্থ বিশপ, ধর্মযাজক এবং পুরোহিত বা সন্ন্যাসীরা খ্রীষ্টধর্মকে কেন্দ্র করে যে ইতিহাস রচনা করতেন তা ধর্মতাত্ত্বিক বা দিব্যতাত্ত্বিক ইতিহাসচর্চা নামে পরিচিত। এই ধরনের ইতিহাস চর্চায় স্বাভাবিকভাবেই খ্রীষ্টধর্মের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। অ-খ্রীষ্টান ইতিহাস গ্রন্থের পরিবর্তে পুরানো বাইবেলের (Old Testament) অন্তর্ভুক্ত ইহুদিদের পবিত্র লেখকে অত্যধিক মর্যাদা দেওয়া হয়। তবে গুণগত বিচার-বিশ্লেষণে ইতিহাস হিসাবে এগুলি ছিল অনেক নিকৃষ্ট মানের।

ধর্মতাত্ত্বিক বা দিব্যতাত্ত্বিক ইতিহাসচর্চা খ্রীষ্টধর্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়নি। চার্চের ইতিহাসমনস্ক হতে প্রায় তিন শতাব্দী পেরিয়ে গিয়েছিল। প্রধানত পরিস্থিতির চাপে চার্চ ইতিহাস লেখার প্রয়োজন অনুভব করেছিল। কারণ, গ্রীক ও রোমান সমাজ যেখানে ব্যক্তির পরিবর্তে

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ইউরোপে চার্চের উচ্চপদস্থ বিশপ, ধর্মযাজক এবং পুরোহিত বা সন্ন্যাসীরা খ্রীষ্টধর্মকে কেন্দ্র করে যে ইতিহাস রচনা করতেন তা ধর্মতাত্ত্বিক বা দিব্যতাত্ত্বিক ইতিহাসচর্চা নামে পরিচিত। ধর্মনিরপেক্ষ বিষয় বা বস্তুর প্রতি তাঁদের কোন আগ্রহ ছিল না। এই ইতিহাসচর্চার মূল বক্তব্যটি হল মানবজাতির ইতিহাস ঈশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়।

সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বার্থকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছিল, সেখানে খ্রীষ্টধর্ম ব্যক্তিস্বার্থকে অত্যাধিক মূল্য দিতে শুরু করে। আত্মার চিরন্তন মুক্তিতে জীবনের অন্যান্য মুক্তি আপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হতে থাকে। ইহলৌকিক জীবনের চেয়ে পারলৌকিক জীবনের উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। খ্রীষ্টধর্ম নিজেই যে ইতিহাস সৃষ্টি করছিল, তার ঐতিহ্য ও ইতিহাস লিখে রাখার প্রয়োজন দেখা দেয়। চার্চ ঐতিহাসিকরা ইতিহাসকে চার্চের উদ্দেশ্য পূরণের হাতিয়ার হিসাবে পরিণত করে। তাঁদের কাছে ইতিহাস হল এমন অক প্রণালী যাতে ঈশ্বর ও মানুষ উভয়েই অংশগ্রহণ করে।

প্যালেস্টাইনের অন্তর্গত ক্যামেরিয়ার বিশপ ইউসেবিয়াস পেম্পিলাসকে (২৬০-৩৪০) ধর্মতাত্ত্বিক বা চার্চ ইতিহাস চর্চার জনক বলা হয়। তিনি ছিলেন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত বইটির নাম হল The Church History এবং The Chronicle. দ্বিতীয় বইটিতে তিনি খ্রীষ্টান জগতের জন্য বিশ্ব-ইতিহাসের রূপরেখা তৈরী করেন। তাঁর এই গ্রন্থটি থেকে খ্রীষ্ট ধর্মের ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট কালক্রম পাওয়া যায়। তিনি ইহুদি জাতিসংক্রান্ত ঘটনাগুলি ও তারিখকে বেশী গুরুত্ব দেন। তাঁর রচনায় ইহুদি-খ্রীষ্টান ইতিহাস অধিকতর গুরুত্ব পায়। তাঁর The Church History গ্রন্থে খ্রীষ্টধর্মের উৎপত্তি, বিকাশ ও বিজয়ের বিবরণ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে তিনি খ্রীষ্ট ধর্মের অনুকূলে মতামত প্রকাশ করেন। ইতিহাসের প্রত্যেকটি বর্ণনায় তিনি যীশুর দেবত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

তবে চার্চ বা ধর্মতাত্ত্বিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ছিলেন সেন্ট অরেনিয়াস অগস্টাইন (৩৫৪-৪৩০ খ্রীঃ)। তাঁর বিখ্যাত বইটির নাম হল 'The City of God'। বইটি লিখতে তাঁর ১২ বছর সময় লেগেছিল। এই বইটিতে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে ঈশ্বর চার্চ সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং চার্চ হল ঈশ্বর সৃষ্ট নগরী (City of God) ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য বা দিব্যরাজ্য চার্চের মাধ্যমেই গড়ে ওঠে। মানুষের সৃষ্ট নগরী ক্ষণস্থায়ী কিন্তু ঈশ্বর সৃষ্ট নগরী বা চার্চের ক্ষমতা ও ব্যাপ্তি অনেক বেশী। ঈশ্বরসৃষ্ট নগরী মানুষকে সততা, প্রেম, বিনয়, ন্যায়পরায়ণতা ও দয়া প্রদান করে। অগস্টাইন প্রচার করেন যে সপ্তা আগে থেকেই সব কিছু জানেন এবং ইতিহাসের ঘটনা সংঘটিত হবার মূলে সপ্তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা কাজ করে। সুতরাং সপ্তার অধীনে থেকে মানুষের স্বাধীন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহ ঘটে থাকে।

ধর্মতাত্ত্বিক বা দিব্যতাত্ত্বিক ইতিহাসচর্চার আর একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক হলেন পাউলাম অরোমিয়াস (৩৮০- ৪২০খ্রীঃ) তিনি স্পেনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সেন্ট অগস্টাইনের ভক্ত ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত বইটির নাম হল Seven Book of History Against the Pagans. এই বইটিতে তিনি দেখান যে অবিশ্বাসী, ইহুদি ও খ্রীষ্টান সকল সম্রাজ্যের ভাগ্য সপ্তার মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়।

ধর্মতাত্ত্বিক বা চার্চ ইতিহাস চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল যে এই ধরনের ঐতিহাসিকরা মানুষের কাছে ঈশ্বরলাভের উপায়গুলি ব্যাখ্যা করতেই বেশী আগ্রহী ছিল। ধর্মনিরপেক্ষ বিষয় বা বস্তুর প্রতি তাঁদের কোন আগ্রহ ছিল না। এই ইতিহাস চর্চার মূল বক্তব্য হল মানবজাতির ইতিহাস ঈশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়।

প্রশ্ন

১। ধর্মতাত্ত্বিক বা চর্চা ইতিহাস চর্চা কাকে বলে?

২। ধর্মতাত্ত্বিক ইতিহাস চর্চায় সেন্ট অগস্টাইনের অবদান কি ছিল?

১.৪.১.৫ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী (Suggested Readings)

1. A.Aloysius : Nationalism without a Nation in Indis.
 2. B.Anderson : Imagined Communities : Reflections on the Origin and Spread of Nationalism.
 3. David Amold : The India Nation in 1942.
 4. David Kopf : British Orientalism and the Bengal Renaissance.
 5. Ranajit Guha : Historiography of India : A Nineteenth Century Agenda and its implications.
 6. R.G.Collingwood : The Idea of History.
 7. Jamex T. Shotwell : The History of History.
-

১.৩.৭.৬ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Assignment)

1. Discuss the differences between the colonial and nationalist historiography.
 2. What are the specific featurec of nationalist historiography concernin ancient India?
 3. Analyse the signi ficance of Orientalist Recovery of Ancient Indian History.
 4. Discuss the role of William Jones in the Orientalist movement.
 5. Analyse the cheif characteristics of the imperialist historiography
 6. What is called the Theological or the Church Historiography?
 7. What was the contribution of St. Augustine in the Theological Historiography?
 8. Write a note on the Theological Historiography as far as your knowledge is concerned.
-

একক ৮

Subaltern Approach to History

বিন্যাসক্রম :

- ১.৩.৮.০ : উদ্দেশ্য (Objective)
- ১.৩.৮.১ : সূচনা (Introduction)
- ১.৩.৮.২ : নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা কি? (What is Subaltern 'Historiography')
- ১.৩.৮.৩ : নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার প্রকৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গি (Nature and approach of Subaltern Historiography)
- ১.৩.৮.৪ : নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার সীমাবদ্ধতা (Limitation of Subaltern Historiography)
- ১.৩.৮.৫ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী (Suggested Readings)
- ১.৩.৮.৬ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Assignment)

১.৩.৮.০ : উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন :

- (১) নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা বলতে কী বোঝায়।
- (২) এই ইতিহাসচর্চায় কারণ ও বৈশিষ্ট্য।
- (৩) এই ইতিহাসচর্চার প্রকৃতি ও এই গোষ্ঠীর ইতিহাসবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি।
- (৪) এই ইতিহাসচর্চার গুরুত্ব।
- (৫) এই ইতিহাসচর্চার সীমাবদ্ধতা।

১.৩.৮.১ : সূচনা

১৯৮০-র দশক থেকে 'সাবলটার্ণ' শব্দটি ভারতীয় ইতিহাস চিন্তায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিয়েছে। ১৯৮২ সালে 'সাবলটার্ণ স্ট্যাডিজ'-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশ ভারতীয় ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে। ১৯৮৩ সালে সাবলটার্ণ স্ট্যাডিজের মুখ্য প্রবক্তা রণজিৎ গুহার 'Elementary aspects of

'সাবলটার্ণ স্ট্যাডিজ'-এর মুখ্য প্রবক্তা হলেন রণজিৎ গুহ। ১৯৮০ সালের পর থেকে এই 'সাবলটার্ণ স্ট্যাডিজ' ভারত ও এশিয়া সহ বিশ্বের প্রায় সব আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

Peasant Insurgency in Colonial India' গ্রন্থটি প্রকাশিত হল এবং ঐ একই বছরে প্রথম 'সাবলটার্ন স্টাডিজ সন্মেলন এই গোষ্ঠীর ইতিহাসচর্চাকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে গেল। এরপর এই ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর নানা লেখকদের প্রচেষ্টায় ১১টি খণ্ডে এদের নানা সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। এই 'সাবলটার্ন স্টাডিজ' শুধু যে ভারতীয় ইতিহাসচর্চাকেই প্রভাবিত করেছে তা নয়, ভাষা-সাহিত্য, চলচ্চিত্র শিল্প প্রভৃতি অন্যান্য নানা ক্ষেত্রেও তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। শুধু ভারতবর্ষে নয়, লাটিল আমেরিকা, আফ্রিকা, দক্ষিণপূর্ব এশিয়াসহ বিশ্বের প্রায় সব আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেই এই ঐতিহাসিক গোষ্ঠী কম-বেশি উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব পালন করেছে।

প্রশ্ন

১। 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'-র মুখ্য প্রবক্তা কে? তাঁর লেখা একটি বই-এর নাম লেখো।

১.৩.৮.২ : নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা কী?

বাংলায় 'সাবলটার্ন'-এর প্রতিশব্দ করা হয়েছে 'নিম্নবর্গ'। ইংরেজীতে এর প্রতিশব্দ হতে পারে 'সাবর্ডিনেট'। Subaltern (নিম্নবর্গ) ইংরেজী ভাষায় শব্দটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয় সামরিক সংগঠনের ক্ষেত্রে। ক্যাপ্টেনের অধস্তন অফিসারদের 'সাবলটার্ন' বলা হয়। তবে শব্দটির সাধারণ অর্থ হল অধস্তন বা নিম্নস্থিত। মাকসীয়ে আলোচনায় এই শব্দটির ব্যবহার পাওয়া হয় ইতালির কমিউনিস্ট নেতা ও দার্শনিক আন্তোনিও গ্রামশির (১৮৯১-১৯৩৭) বিখ্যাত 'Prison notebooks'-এ। ('কারাগারের নোটবই')। তখন থেকেই শব্দটির ব্যবহার ছিল বহুমুখী। প্রথমে গ্রামশি শব্দটি ব্যবহার করেন ধনতান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক আধিপত্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে।

ক্ষমতা বিন্যাসের যে ধরন শ্রেণীবিভক্ত সমাজের চরিত্র তৈরি করে—তার ফলেই ক্ষমতার অধিকারী 'উচ্চবর্গ' (Elite), যারা হলেন 'Dominant class' আর ক্ষমতাহীন 'সাবলটার্ন' বা নিম্নবর্গ। বহুক্ষেত্রেই অবশ্য গ্রামশি বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব, শাসন এই শব্দগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করেছেন যে এর থেকে বোঝা সম্ভব নয় এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কিনা। এই শব্দগুলিকে তিনি সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। পরে তার আলোচনা যত এগিয়ে চলে তখন দেখা যায় গ্রামশি এক বিশেষ অর্থে 'সাবলটার্ন' শব্দটিকে ব্যবহার করছেন। এখানে

সাবলটার্ন কথাটির সাধারণ অর্থ হল অধস্তন বা নিম্নস্থিত। গ্রামশি শব্দটি ব্যবহার করেন ধনতান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক আধিপত্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে। সামাজিক ক্ষমতার এক বিশেষ ধরনের বিন্যাস ও প্রক্রিয়ার মধ্যে শ্রমিকশ্রেণী শোষিত ও শাসিত হয়। গ্রামশির লেখায় অবশ্য 'সাবলটার্ন' চেতনার এবং ক্ষমতার নানা সীমাবদ্ধতার কথা প্রাধান্য পেয়েছে।

'সাবলটার্ন' শব্দটি 'প্রলেতারিয়েট'-এর প্রতিশব্দ হিসেবে তিনি ব্যবহার করেছেন। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় 'সাবলটার্ন শ্রেণী' হল শ্রমিক শ্রেণী। সামাজিক ক্ষমতার এক বিশেষ ধরনের বিন্যাস ও প্রক্রিয়ার মধ্যে শ্রমিক শ্রেণী শোষিত ও শাসিত হয়। এই বিন্যাসে 'সাবলটার্ন' শ্রমিক শ্রেণীর বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে 'হেগেমনিক' শ্রেণী অর্থাৎ পুঁজিপতি, 'বুর্জোয়াজি'। শ্রমিকশ্রেণী/বুর্জোয়াজি, এই বিশেষ অর্থে সাবলটার্ন/হেগেমনিক শ্রেণীর সামাজিক সম্পর্কের বিষয়ে গ্রামশির বিশ্লেষণ আধুনিক মার্কসবাদী আলোচনায় এক বিশিষ্ট অবদান। এই বিশ্লেষণে গ্রামশি

গুরুত্ব দিয়েছেন সেই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটির উপর যার মাধ্যমে বুর্জোয়াশ্রেণী কেবল শাসনযন্ত্রে তার প্রভুত্বই প্রতিষ্ঠা করে না, তৈরি করে এক সামগ্রিক সামাজিক কর্তৃত্ব বা ‘হেগেমনি’। কেবল রাষ্ট্রীয় শক্তিকে অবলম্বন করে এই সার্বিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের জগতে এক আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে ‘হেগেমনিক’ বুর্জোয়াশ্রেণী তার শাসনের নৈতিক ভিত্তি হিসেবে ‘সাবলটার্ণ’ শ্রমিক শ্রেণীর কাছ থেকে সামাজিক সম্মতিও আদায় করে নেয়। গ্রামশির বিশ্লেষণে তাই গুরুত্ব পেয়েছিল রাষ্ট্রের সঙ্গে বৃহত্তর নাগরিক সমাজের সম্পর্ক, জাতি, জনগণ, বুর্জোয়াশ্রেণী ও অন্যান্য শাসকগোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক, জাতীয় জীবনের একচ্ছত্র প্রতিনিধি হিসেবে জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, বুর্জোয়াশ্রেণীর সার্বিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ইত্যাদি নানা প্রশ্ন। সার্বিক সাংস্কৃতিক বা ভাবাদর্শগত কর্তৃত্ব সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে নিরঙ্কুশ স্বয়ংচালিত (Self-sustaining) করে তোলে। গ্রামশির লেখায় অবশ্য ‘সাবলটার্ণ’ চেতনার এবং ক্ষমতার নানা সীমাবদ্ধতার কথা প্রাধান্য পেয়েছে। তা সত্ত্বেও এই চেতনার স্বতন্ত্র অভিব্যক্তির সম্ভাবনার ইঙ্গিতও তাতে যথেষ্ট পরিমাণেই আছে, এমনকি তাদের আন্দোলন প্রতিরোধের রূপ দিতে পারে তার ইঙ্গিতও রয়েছে। এই জটিল সমস্যা ও সম্ভাবনার আলোচনার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে ভারতীয় ইতিহাসের সাবলটার্ণ তত্ত্ব।

প্রশ্ন

১। নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা (Subaltern Historiography) বলতে কী বোঝ?

১.৩.৮.৩ : নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার প্রকৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গি

গ্রামশির তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে ১৯৮৩-তে রণজিৎ গুহ তাঁর ‘Elementary aspects of Peasant Insurgency in Colonial India’ গ্রন্থে জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চা এবং মার্কসীয় ইতিহাসচর্চার আদিকল্পগুলির বা মডেলের বিরুদ্ধে পাল্টা প্রশ্ন তুলবেন এবং বিকল্প খাড়া করলেন। প্রতিষ্ঠিত আদিকল্পগুলোকে কঠোর সামালোচনা

খুব অপ্রত্যাশিতভাবেই ‘সাবলটার্ণ স্টাডিজ’ এখন তার নিজ চেহারা বদল করে ফেলেছে। কারণ কোনও নির্দিষ্ট বিষয়গত সীমারেখা না রেখে Subaltern Studies-এ সব বিষয় নিয়েই লেখা শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকদের উচিত উচ্চবর্গের অপর হিসেবে নিম্নবর্গকে কীভাবে নির্মাণ করা যায়, তা আজও গভীরতার অনুসন্ধান করা।

করে ‘তলা থেকে ইতিহাস’ দেখার এবং লেখার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করলেন। এলিট নেতৃত্বের গুরুত্ব অস্বীকার করে তাঁরা নিম্নবর্গের সচেতন নেতৃত্ব, (গ্রামশির ‘multiple elements of conscious leadership but no one of them... predominant’) নিম্নবর্গের আন্দোলনের স্বাতন্ত্র্য, তাদের নিজস্ব স্বকীয়তা ও স্বকর্তৃত্বকে (autonomy)-কে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বড়ো করে দেখাতে চাইলেন। বিভিন্ন কৃষক

বিদ্রোহের ও নিম্নবর্গীয় আন্দোলনের গুরুত্ব ও তত্ত্ব বিশ্লেষণের কাজে লেগে গেলেন। Subaltern studies-এর তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকায় রণজিৎ গুহ বলেছেন “We are opposed as much of the prevailing practice in historiography and the social sciences for its failure to acknowledge the Subaltern as the maker of his own destiny”। আর এই তত্ত্ব স্থাপন করতে গেলে ‘elitist paradigm’ বা উচ্চবর্গীয় আদর্শ-এর প্রতিবাদী ইতিহাস লেখা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় Subaltern ঐতিহাসিকগণ

এই ঘোষণা করেন যে তারা সহজ জাতীয়তাবাদী ব্যাখ্যা সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাস ব্যাখ্যার মতই (কারণ উভয়ই ‘one sided and blinkered historiography’) নস্যাৎ করবেন, আবার কেন্দ্রিজ গোষ্ঠীর মত সব আদর্শবাদের ‘রাংতাওলা মোড়ক’ ছিন্ন করবেন। তাদের মতে, জাতীয়তাবাদী ইতিহাস বা মার্কসীয় ইতিহাস— কোনটিতেই জনগণের রাজনীতিকে প্রাপ্ত যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয়নি। বরং জনগণের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা ও সমস্ত প্রতিবাদী আন্দোলনকে বোঝা হয়েছে নেতৃবর্গের রাজনীতির বা উচ্চবর্গের রাজনীতির অংশ হিসেবে। এমনকী, যেসব কৃষক-অভ্যুত্থানের ক্ষেত্রে এই নেতৃ-রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক স্পষ্টতরই প্রায় ছিল না বললেই চলে, পুরোনো ধরনের ইতিহাসে সেগুলিকেও বলা হয়েছে নেহাতই স্বতোৎসারিত, ‘উপ-রাজনৈতিক’ (Pre-political) আন্দোলন হিসেবে। সেখানে সত্যিকারের আধুনিক রাজনীতির কোন বোধ বা লক্ষণ দেখেননি ঐতিহাসিকেরা। রণজিৎ গুহ বললেন—এইসব কৃষক বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থানের মধ্যে অবশ্যই এক নিজস্ব সৃজনশীল ও বিশিষ্ট রাজনৈতিক চেতনা ছিল এবং এই সঙ্গে ছিল উচ্চবর্গের রাজনীতি থেকে সংগ্রহ করা নানা বিক্ষিপ্ত মূল্যবোধও (inherited and uncritically absorbed material of the ruling culture) নিম্নবর্গের ঐতিহাসিক গোষ্ঠী বলতে চাইলেন যে এই দুই বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে নিম্নবর্গের ভাবনাচিন্তায় আর কাজকর্মের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এল এক সম্পূর্ণ অধরা সামাজিক ইতিহাস। এর ফলেই তৈরি হয়ে উঠল সাবলটার্ণ স্টাডিজ। পার্থ চট্টোপাধ্যায়, দীপেশ চক্রবর্তী, গৌতম ভদ্র, শাহীদ আমিন, জ্ঞান পাণ্ডে, ডেভিড আর্নল্ড ও আরও অনেকের নানা রচনায় দেখা গেল এক স্বতন্ত্র ধরনের ইতিহাসচর্চা। এই ইতিহাসচর্চার মূল বিষয় হল নিম্নবর্গের কার্যকলাপ ও আন্দোলনকে তুলে ধরা এবং উচ্চবর্গের আন্দোলনের থেকে এর পৃথকীকরণ। তাদের মতে, জাতীয় সংগ্রাম ঔপনিবেশিকতাবাদ ও ভারতীয় জনগণের সংগ্রাম নয়, বিদেশি ও স্বদেশি এলিটদের সঙ্গে নিম্নবর্গের লড়াই। এই প্রসঙ্গে বামপন্থী ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্র মন্তব্য করেছেন : ... ‘This (Subaltern) approach is characterised by a generally ‘a historical glorification of all forms of popular militancy and consciousness...’

প্রশ্ন

১। নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার সীমাবদ্ধতাগুলি কী কী?

১.৩.৮.৪ : নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার সীমাবদ্ধতা

এ কথা ঠিক নিম্নবর্গীয় ইতিহাস রচনার প্রয়াস, তাদের তত্ত্ব, নতুন উপাদান (Source) আর নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের জ্ঞানের পরিধিকে প্রসারিত করেছে। কিন্তু এইসঙ্গে এই কথাটিও সত্যি যে তাদের মতাদর্শে ও রচনায় অনেক ত্রুটি থেকে গেছে। সাবলটার্ণ স্টাডিজ—এর প্রথম পর্বের কাজের সবচেয়ে মৌলিক সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিড্যাক-এর প্রবন্ধে। ১৯৮৫ সালে লেখা প্রবন্ধ দুটিতে স্পিড্যাক প্রস্তাব দিয়েছিলেন, ‘সবার ওপরে নিম্নবর্গ সত্য’, এরকম মন্ত্র না আউড়ে নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকদের চেষ্টা করা উচিত উচ্চবর্গে অপর হিসেবে নিম্নবর্গকে কীভাবে নির্মাণ করা যায়, সেই প্রক্রিয়াগুলিকে আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান করা।

মোটামুটিভাবে পঞ্চম-ষষ্ঠ খণ্ড থেকে সাবলটার্ণ স্টাডিজ-এ প্রকাশিত গবেষণায় নতুন ঝাঁক ও পুরোনো আদিকল্পের বা মডেলের সংশোধন, পরিবর্তন বা নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। আগের

সাথে এই পর্বের প্রধান পার্থক্য এই যে ঐতিহাসিক গবেষণা থেকে নিম্নবর্গের সত্তা বা চৈতন্যের একটা বিশুদ্ধ পরিপূর্ণ চেহারার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব, এই অতি সরল ধারণাটি এখন পরিত্যক্ত হল। আশির দশকের শেষে এসে

নিম্নবর্গীয় ইতিহাসচর্চার মূল বিষয় ছিল নিম্নবর্গের কার্যকলাপের ও আন্দোলনকে তুলে ধরা এবং উচ্চবর্গের আন্দোলন থেকে এর পৃথকীকরণ। এ কারণে তাঁরা এলিট নেতৃত্বের গুরুত্ব অস্বীকার করে, নিম্নবর্গের সচেতন নেতৃত্ব, আন্দোলনের স্বাভাবিক স্বকীয়তা ও স্বকর্তৃত্বকে বড় করে দেখাতে চেয়েছেন। তাদের মতে জাতীয় সংগ্রাম ঔপনিবেশিকতাবাদ ভারতীয় জনগণের সংগ্রাম নয়, বেদেশি ও স্বদেশি এলিটদের সঙ্গে নিম্নবর্গের লড়াই।

দেখা গেল সাবলটার্ণ স্টাডিজের প্রাথমিক ধারণাটির আপাত অবলুপ্তি, নতুন এক ব্যাখ্যায় ‘আধিপত্য’ বলতে কেবলই বোঝানো হচ্ছে এক সর্বগ্রাসী পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক আবহকে। নিম্নবর্গ সেখানে নানা ধরনের গ্রস্ত সাংস্কৃতিক ভূবন। আগেকার সমাজ অর্থনৈতিক আলোচনা থেকে সচেতনভাবে সরে এসেছেন নব্যপন্থীরা, কেননা ঐ অর্থনৈতিক আলোচনার ভিত্তি স্পষ্টতরই মার্ক্সীয় দর্শন যা কিনা ঐ ধরনের পাশ্চাত্য ‘সর্বজনীনতার’ (Universalism) বোধের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এখন দেখা যাচ্ছে, ‘সাবলটার্ণ স্টাডিজ’-এর কোনও নির্দিষ্ট বিষয়গত সীমারেখা থাকছে না। সব বিষয় নিয়েই সেখানে লেখা শুরু হয়ে গিয়েছে। পূর্বে ‘চাষা-ভূষো কুলিনকামিন নিয়ে’ তারা লিখছিলো।

এখন হঠাৎ বঙ্গিম-গান্ধী-জওহরলাল, বিজ্ঞান-শিল্প-সাহিত্য নিয়ে তাঁরা লেখা শুরু করেছে। এখন নজর গিয়ে পড়েছে আধুনিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপর, যার মাধ্যমে নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান সঞ্চারিত মতাদর্শ এবং আধুনিক ক্ষমতাতন্ত্র ঔপনিবেশিক এবং পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতবর্ষে তার জাল বিস্তার করেছে। অর্থাৎ স্কুল-কলেজ, সংবাদপত্র, প্রকাশনাসংস্থা, হাসপাতাল-ডাক্তার-চিকিৎসা ব্যবস্থা, জনসংখ্যা গণনা, রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স, আধুনিক শিল্প উৎপাদনে দৈনন্দিন শ্রমসংগঠন, বিজ্ঞান-সংস্থা, গবেষণাগার—এইসব প্রতিষ্ঠানের বিশদ ইতিহাসও এবার ‘সাবলটার্ণ স্টাডিজের’ বিষয় হয়ে পড়ল। এই চেহারা বদল খুব অপ্রত্যাশিত নয়। তবে এই ধারার আলোচনায়ও নানা দুর্বলতা রয়েছে। সাংস্কৃতিক আধিপত্যের আলোচনায় কেবলই ঢাকা পড়ে যায় অর্থনৈতিক সামাজিক ভেদাভেদে বাস্তব।

প্রশ্ন

- ১। কয়েকজন নিম্নবর্গীয় ইতিহাসচর্চার ঐতিহাসিকের নাম লেখো।
- ২। নিম্নবর্গীয় ইতিহাসচর্চার মূল বক্তব্য কি?

১.৩.৮.৫ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

- ১। নিম্নবর্গের ইতিহাস (সম্পাদন)—গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়
- ২। ‘Subaltern Studies : Deconstructing Historiography’ in R. Guha (ed) Subaltern Studies IV. (Gayatri Chakraborty Spivak)
- ৩। স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস—অমলেশ ত্রিপাঠী
- ৪। নিম্নবর্গের ইতিহাস—রণজিৎ গুহ, ‘এক্ষণ’ পত্রিকা—পঞ্চদশ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা, বর্ষ ১৩৮৯

১.৩.৮.৬ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

- ১। সাবলটার্ণ ইতিহাসচর্চার উদ্ভবের প্রেক্ষাপট আলোচনা করো। এদের ইতিহাসচিন্তার প্রকৃতি কি?
 - ২। সাবলটার্ণ ইতিহাসচর্চার উদ্ভবের পশ্চাতে গ্রামশির রচনার কোনো ভূমিকা আছে কি?
 - ৩। সাবলটার্ণ ইতিহাসচর্চার প্রকৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করো।
 - ৪। সাবলটার্ণ ইতিহাসচর্চার দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় কি?
 - ৫। সাবলটার্ণ ইতিহাসচর্চার সীমাবদ্ধতা কি?
-

একক ৯

Post-Modernist Approaches to History

বিন্যাসক্রম :

- ১.৩.৯.০ : উদ্দেশ্য
- ১.৩.৯.১ : ইতিহাসের উত্তর আধুনিক মতবাদ
- ১.৩.৯.২ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী
- ১.৩.৯.৩ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১.৩.৯.০ : উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন :

- (১) উত্তর আধুনিকতাবাদ কথাটির অর্থ
- (২) ফোকোর উত্তর আধুনিকতাবাদের তত্ত্বের প্রসারে ভূমিকা ও তাঁর মতবাদের বৈশিষ্ট্য
- (৩) উত্তর আধুনিকতাবাদের সমালোচনা

১.৩.৯.১ : ইতিহাসের উত্তর-আধুনিক সমালোচনা

পোস্টমডার্নিজম শব্দটির অর্থ কী? "Modern-day Dictionary of Received Ideas" গ্রন্থে বলা হয়েছে "This word has no meaning. Use it as possible" অর্থাৎ এই শব্দটি কোন প্রকৃত অর্থ নেই। এই শব্দটি কোন কিছু থেকে কোন কিছুকে বোঝায়। ধারণার জগতে পোস্টমডার্নিজম এক গোলকধাঁধা। এর দুর্বোধ্য বিষয়বস্তু পাঠকদের বিহ্বল করে তোলে। অধ্যাপক Arran Gare মনে করেন, পোস্টমডার্নিজম একটি বিতর্কের আবহাওয়া তৈরি করে যে পৃথিবীতে এবং বিশেষ করে পশ্চিমী সমাজে প্রকৃতি কোন সাংস্কৃতিক রূপান্তর ঘটেছে, কিনা। যদি তা হয়ে থাকে তাহলে সেটি ভাল না খারাপ? আসলে পোস্ট মডার্নিজম কথাটির কোন ছোট একটি শব্দার্থ নেই। এর বিষয়বস্তু হল বর্তমান যুগ এবং কাজ হল এই যুগের মানুষের অভিব্যক্তির মূল্যায়ন করা। Gare-এর মতে, আধুনিকতা, উন্নতি ও জ্ঞানদীপ্ত মানবিকতায় বিশ্বাস হারানোর মধ্য দিয়ে পোস্টমডার্ন অবস্থায় সৃষ্টি হয়। পোস্টমডার্নিস্টরা মনে করেন উপরোক্ত ধারণাগুলির জন্যই মনুষ্যত্ব আত্মহননের পথে এগিয়ে চলেছে। তাদের মতে, উন্নতির ধারণা চরমতম আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে দুটি বিশ্বযুদ্ধের দ্বারা। যার মধ্য দিয়ে প্রকটিত হয়েছে ধ্বংস, দারিদ্র, পরিবেশ দূষণ এবং মানবিকতার অবনমন। সুতরাং, It may be stated in general terms that post modernism reflects this loss of faith in modernity.

Post modernism কে অনেক সময় 'Post Structuralism-এর সমার্থক বলে মনে করা হয়। যদিও দুটি ধারণার মধ্যে পার্থক্য আছে। ১৯৬৮ সালে May আন্দোলনের সময় প্যারিসের কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর মাধ্যমে Post Structuralist বা Post modern ধারণার উৎপত্তি ঘটে। কয়েকজন Post Structuralist বুদ্ধিজীবী এই মতের সমর্থন করেছিলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন Barthes, Lacan, Foucault, Derrida, Guattari প্রমুখ। তবে Post modernism-এর সূত্রপাত ঘটে Nietzsche এবং Martin Heidegger-এর রচনার মাধ্যমে। প্যারিসের বুদ্ধিজীবীরা এদের অনুসরণ করেছিলেন। Ben Agger সাধারণভাবে Post structuralism and post modernism এর মধ্যে একটি পার্থক্য

পোস্ট মর্ডার্নিজম এর বিষয়বস্তু হল বর্তমান যুগ এবং কাজ হল এই যুগের মানুষের অভিব্যক্তির মূল্যায়ন করা। পোস্ট মর্ডার্ন নিজমরা মনে করেন উন্নতির ধারণা চরমতম আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে দুটি বিশ্ব যুদ্ধের দ্বারা। যার মধ্যদিয়ে প্রকটিত হয়েছে ধ্বংস দারিদ্র পরিবেশে দূষণ এবং মানবকতার অবনমন। Post structuralist এবং Post modernist-রা জ্ঞানদীপ্ত সামাজিক চিন্তার যে সমালোচনা করেছেন তারসঙ্গে ইতিহাসের গভীর সম্পর্ক আছে। Post modernist চিন্তাবিদ Foucault ইতিহাসের সমালোচনা করে বলেছেন এবং কোন মানবিক বিষয় নেই এবং ইতিহাস মানবিক উন্নতির উপর জয় প্রকাশ করতে পারে না। Foucault ইতিহাসে প্রবাহমানতা বা পরস্পর বিশ্বাসী নন।

দেখাবার চেষ্টা করেছেন। তার মতে, Post-structuralism হল a theory of Knowledge এবং post modernism হল a theory of society, culture and history, তবে প্রকৃত পক্ষে দুটি ধারণার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা খুবই কঠিন। যে জন্য বিশেষ করে ইতিহাসের উপর প্রভাবের ক্ষেত্রে দুটি ধারণাকে একইরকমের মনে করা যায় না। বর্তমান post modernist দের আলোচ্য বিষয়গুলি হল 'Science', 'Politics', 'Colonialism', 'Late capitalism, classness, race, gender, women's studies, Feminism, aesthetic theory, literary criticism, environmental pollution and history.'

Post structuralist এবং post modernistরা জ্ঞানদীপ্ত সামাজিক চিন্তার যে সমালোচনা করেছেন, তার সঙ্গে ইতিহাসের গভীর সম্পর্ক আছে। বস্তুতপক্ষে post modern চিন্তাধারা ঐতিহাসিক চিন্তাধারার সামনে এক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিখ্যাত post modernist চিন্তাবিদ Foucault ইতিহাসের সমালোচনা করে বলেছেন যে এর কোন প্রতিনিয়ত মানবিক বিষয় নেই এবং ইতিহাস মানবিক উন্নতি অর্থাৎ প্রগতির উপর মানবিক বৃত্তির জয় প্রকাশ করতে পারে না। এছাড়া তিনি বলেছেন, মার্কস এবং বেগেল যা ভেবেছিলেন সেইরকম ইতিহাসের কোন প্রকৃত উদ্দেশ্য নেই। Foucault মনে করেন অতীত তার অবিকল পুরনো কাঠামোর আর নেই এবং সেইজন্য ঐতিহাসিকের অতীত থেকে যা পুনরুদ্ধার করে তা কখনোই 'বস্তুগত সত্য' বলে বিবেচিত হতে পারে না। সেইজন্য অতীতে তথ্যের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং তত্ত্ব রচনা করা যায় না। তাঁর মতে, বস্তুগত ধারণা হল অবাস্তব চিন্তা। কারণ, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে একই ঐতিহাসিক তথ্যের একটিই সত্য বেরিয়ে আসে না, বেরিয়ে আসে অনেক ধরনের সত্য। এছাড়া Foucault 'continuity in history' অর্থাৎ ইতিহাসের প্রবাহমানতার ধারাকে বাতিল করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন 'history is necessarily discontinuous'. আসলে তিনি এক নতুন ধরনের ইতিহাস রচনা করতে চেয়েছেন। তিনি তার ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু, নিয়মবিদ্যা, ব্যাখ্যা এক সিদ্ধান্তগুলির মধ্য দিয়ে অতীতকে নতুনভাবে দেখাতে চেয়েছেন। তিন পশ্চিমী সভ্যতা এবং এর জ্ঞানদীপ্তিগত ভিত্তিকে কটোরভাবে সমালোচনা করেছেন। Foucault ইতিহাসের কতগুলি অপ্রচলিত ও আকর্ষণীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা

করেছেন যেগুলি হল—“madness, sexuality, criminality and the evolution of social attitudes towards them”. Foucault-এর প্রথম বইটির নাম হল ‘Madness and Civilisation’—এই গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে পাগলাগারদের উৎপত্তি হয়েছিল এবং ঐতিহাসিক ঘটনার মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাগলামি সম্পর্কে ধারণাও কীভাবে পরিবর্তন ঘটেছিল। মধ্যযুগে পাগলামিকে ‘পবিত্র’ বলে মনে করা হত। আবার আদি আধুনিক পাশ্চাত্যে এটিকে একটি রোগ হিসাবেই মনে করা হত। Foucault তার ‘The Birth of the Clinic’ গ্রন্থে ঔষধের ইতিহাস সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন। Foucault-এর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ‘The Archaeology of Knowledge’, ‘The order of Things, Discipline and Punish, The History of Sexuality’ ইত্যাদি। তবে অধ্যাপক J.G. Merquior বলেছেন, Foucault-র ইতিহাস সম্পর্কিত তত্ত্ব সবক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয় না। তাঁর ব্যাখ্যার মধ্যেও অনেক ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। তাঁর সংগৃহীত ঐতিহাসিক তথ্য ছিল নির্বাচিত এবং বিকৃত। তার বিশ্লেষণের মধ্যেও পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়।

Foucault-এর ইতিহাস চিন্তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

Foucault ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ‘বর্তমান’কেই প্রাধান্য দিতে চান। কারণ তিনি মনে করেন অতীতের objective বা বস্তুগত আলোচনা করা সম্ভব নয়। তিনি বলেছেন, “It was only in the perspective of the present that the past can be explained”. Foucault দাবী করেছেন যে, তিনি অতীতের চেয়েও বর্তমান থেকে বেশি জ্ঞানলাভ করেছেন। এর ফলে অতীতের দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা গুরুত্ব কমে যায় এবং বর্তমানকাল প্রভাব বিস্তার করে। Foucault ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে আধুনিক বুর্জোয়া প্রভাবিত সংস্কৃতির পরিবর্তে ‘History of the Present’-কে গুরুত্ব দিয়েছেন।

Foucault জ্ঞানদীপ্তি যুগের ‘মানবিকতা’, ‘ব্যক্তির গুরুত্ব’ ইত্যাদি ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। ‘The Order of Things’ গ্রন্থে তিনি মানুষ, ব্যক্তি ও মানবিকতার গুরুত্বকে অস্বীকার করেছেন। তিনি এই গ্রন্থে ‘death of man’-এর কথাই বলেছেন।

Foucault ইতিহাসে continuity বা প্রবাহমানতা বা পরস্পরায় বিশ্বাসী নন। পশ্চিমী দর্শন ও চিন্তাধারার মধ্যে যে যোগসূত্র ও পরস্পরা বা পর্যায় আছে সেগুলিকে তিনি অস্বীকার করেছেন। এই ‘epistome’গুলির মধ্যে কোন সাযুজ্য নেই বলে তিনি মনে করেন। পশ্চিমী দর্শন চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি ৪টি স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল :

- (i) Pre-classical (upto 1650AD)
- (ii) Classical (1650-1800)
- (iii) Contemporary age (Singe 1950)

তিনি মনে করেন এই চারটি স্তরের মধ্যে Continuity বা পরস্পরাগত যোগসূত্র নেই।

Foucault ইতিহাসে ক্ষমতার নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি মনে করেন ইউরোপে জ্ঞানদীপ্তি ও উনিশ শতকের প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও বিজ্ঞান আসলে জনগণের উপর ক্ষমতা আরোপ করতে চেয়েছে।

বিজ্ঞান আসলে জনগণের উপর ক্ষমতা আরোপ করতে চেয়েছে। বিজ্ঞান ছিল ক্ষমতা বিস্তারের মাধ্যম। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ধীরে ধীরে মানুষের উপর ক্ষমতা বিস্তার করেছে। বিজ্ঞান যে ‘শাস্ত্রত সত্য’ কথা বলে তা আসলে হল শক্তির প্রকাশ তিনি বলেছেন “all knowledge, reason and science are but instruments and tools of the will to power. The criterion of truth is might.”

Foucault-এর বক্তব্যের প্রধান বিরোধী হলেন অধ্যাপক Merquior। তিনি বলেছেন, ইতিহাসচর্চায় Foucault-এর নতুন বৈজ্ঞানিক নিয়মবিদ্যা এতদিন ধরে বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাকে নস্যং করতে চেয়েছেন। Peter Sedgwick-ও তাঁর বক্তব্যের সমালোচনা করেছেন। এর বক্তব্য হল Foucault তাঁর আধুনিকতা ও বুর্জোয়াবিরোধী মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে কতকগুলি ‘False assumption’ তৈরি করেছেন। অন্তত ঔষধ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি এর ‘discontinuity’ তত্ত্বকে কঠোর সমালোচনা করেছেন। Foucault-এর সমালোচনা করে David Levy বলেছেন, যদি কেউ ইতিহাসে ‘Continuity’-এর তত্ত্বকে অস্বীকার করেন তাহলে ইতিহাসকে কীভাবেই বা বোঝা যাবে? তিনি বলেছেন, ‘A degree of historical continuity is basic to an understanding of the past.’ সমালোচকেরা মনে করেন, ফরাসী বিপ্লবকে Foucault তাঁর ইতিহাস চর্চার বিষয়বস্তু না করে ঠিক কাজ করেননি।

সমালোচনা সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, Foucault তার বিদ্রোহী ও বিতর্কিত ইতিহাসচর্চার মাধ্যমে ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে এক নতুন পদ্ধতি আনার চেষ্টা করেছেন। ঐতিহাসিক Mark Poster তাই যথার্থই মন্তব্য করেছেন— “Foucault offers historians a new framework for studying the past, a new set of methods for doing so and new notion of discontinuity.”

প্রশ্ন

- ১। ‘পোস্টমডার্নিজম’ শব্দটির অর্থ কী?
- ২। কয়েকজন পোস্টমডার্নিস্টের নাম করো।

১.৩.৮.২ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

- ১। E. Sreedharan—‘A Textbook of Historiography’
- ২। Kelth Jenkins (ed.)—The Post-Modern history Reader.
- ৩। Steven Best and Douglas Kellner—Post-modern theory : Critical Interrogation’.

১.৩.৯.৪ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

- ১। উত্তর-আধুনিকতাবাদ বলতে কী বোঝায়? মিশেল ফুকো কীভাবে উত্তর-আধুনিকতাবাদকে ইতিহাসের ধারণায় আলোচনা করেছেন?

পর্যায় গ্রন্থ-৪

Different Theories

একক ১০

Cyclical, Historical Materialism, Sociological

বিন্যাস ক্রম :

- ১.৪.১০.০ : উদ্দেশ্য (Objective)
- ১.৪.১০.১ : চক্রাকার আবর্তন তত্ত্ব (Cyclical Theory)
- ১.৪.১০.২ : ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (Historical Materialism)
- ১.৪.১০.৩ : সমাজতাত্ত্বিক ইতিহাসতত্ত্ব (Sociological Approaches in History)
- ১.৪.১০.৪ : তুলনামূলক ইতিহাসতত্ত্ব (Comparative History)
- ১.৪.১০.৫ : মার্ক্স ব্লক ও তুলনামূলক ইতিহাস
- ১.৪.১০.৬ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী (Suggested Readings)
- ১.৪.১০.৭ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Assignment)

১.৪.১০.০ : উদ্দেশ্য (Objective)

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন :

- ১) চক্রাকার আবর্তন তত্ত্ব বলতে কি বোঝায়
- ২) এই তত্ত্বের বিভিন্ন দিক ও তার ব্যাখ্যা
- ৩) এই তত্ত্বের প্রসারে ভিকোর অবদান আলোচনা
- ৪) কার্ল মার্ক্সের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ
- ৫) ঐতিহাসিক বস্তুবাদের নানা সূত্র ও তার ব্যাখ্যা
- ৬) সামাজিক ও আর্থিক রূপান্তরের প্রক্রিয়া
- ৭) তুলনামূলক ইতিহাসতত্ত্বের অর্থ ও উদ্দেশ্য
- ৮) তুলনামূলক ইতিহাসতত্ত্বের উদ্ভব কিভাবে হয়েছিল

- ৯) তুলনামূলক ইতিহাসতত্ত্ব পদ্ধতির প্রয়োগ ও প্রখ্যাত ঐতিহাসিকদের অবদান
- ১০) মার্ক ব্লক ও তুলনামূলক ইতিহাস পদ্ধতির নিপুণভাবে প্রয়োগ
- ১১) তুলনামূলক ইতিহাস পদ্ধতির সমালোচনা

১.৪.১০.১ : চক্রাকার আবর্তন তত্ত্ব (Cyclical Theory)

ইতিহাস চক্রাকার আবর্তন হল একটি নীতি যার অর্থ হল সমস্ত ঘটনাই চক্রাকার পদ্ধতিতে প্রায় একইভাবে ফিরে আসে। চক্রাকার তত্ত্বের দুটি দিক আছে। প্রথমটি হল Cosmic Cycle; আর দ্বিতীয়টি হল মানুষের কার্যকলাপ সম্বন্ধীয়। চক্রাকার তত্ত্ব প্রাচীন ভারত, ব্যাবিলন ও গ্রীসে প্রচলিত ছিল। জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু যে চক্রাকার তত্ত্ব তা প্রাচীন যুগে প্রচলিত ছিল। ভারতেও যে চারটি যুগের ধারণা প্রচলিত আছে তার মধ্য দিয়েও চক্রাকার তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন — মহাযুগ, সত্যযুগ, কলিযুগ ইত্যাদি। এই ধারণা প্রচলিত আছে যে কলিযুগের পর পৃথিবীতে আবার নতুন বছর শুরু হবে। গ্রীস ও রোমেও এই তত্ত্ব প্রচলিত ছিল। ফ্রেডারিক নিৎস্ “Eternal Recurrence”-এর কথা বলেছেন। খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে এমপোডোক্লিস্-ও (Empedocles) এই তত্ত্ব বিশ্বাস করতেন। হেরাক্লিটাস, এ্যারিস্টটল এই তত্ত্বকে আরও ব্যাখ্যা করেন — যেমন আগুন তার তাপ হারিয়ে বাতাসে পরিবর্তিত হয় এবং পৃথিবীতেও তার শুষ্কতা হারিয়ে জলে পরিণত হয়। স্টেয়িকরাও চক্রাকার তত্ত্বের সমর্থক ছিলেন। খ্রীষ্টান লেখকরা অবশ্য ‘Cosmic Cycle’-এর নীতিকে গ্রহণ করেননি। তবে উনিশ শতকে নিৎস্-এর ‘Eternal Recurrence’-এর বক্তব্যের মাধ্যমে আবার Cosmic Cycle ধারণা ফিরে আসে।

প্লেটো তাঁর ‘Statesman’-এ বলেছেন, “all history is advance and retrogression. These occur in cycles” অ্যারিস্টটল তাঁর Mataphysics-এ বলেছেন, “The arts and sciences have been lost and regained many times”. **Politics** গ্রন্থে তিনি বলেছেন, “All ideas of any value have already been discovered and tried”. *Dr Caelo* গ্রন্থে তিনি বলেছেন, “The same doctrines have been discovered innumerable times”. অবশ্য Aristotle ‘periodic recurrence’-এর ধারণার সঙ্গে ‘cosmic cycles’ কে মেলাতে চাননি। তাঁর **On Philosophy** গ্রন্থে ধ্বংসের (deluge) পর আবার সভ্যতার পুনর্জন্মের কথা বলেছেন। তবে তিনি এই চক্রের সীমা কত বছর তা নির্দিষ্ট করে কিছু বলেননি। তাছাড়া বিভিন্ন চক্রের মধ্যে সাদৃশ্য সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু উল্লেখ করেননি। অ্যারিস্টটল এবং পলিবিয়াস সরকারের অবক্ষয়ের মধ্যেও চক্রাকার তত্ত্বের সম্মান করেছেন। পলিবিয়াস তাঁর ‘History’ গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে ছয় ধরনের সরকার বারবার নির্দিষ্টভাবে ফিরে আসে। যেমন ‘monarchy, aristocracy, oligarchy, democracy এবং mob-rule পলিবিয়াস মনে করেন, এক একটি cycle বা চক্র প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা তৈরি হয়।

মধ্যযুগে এই তত্ত্ব স্তিমিত হয়ে যায়। কারণ প্রাকৃতিক নিয়মের চেয়ে রাষ্ট্রের নৈতিক আচরণকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হত। কিন্তু রেনেসাঁসের যুগের গোড়ার দিকে পলিবিয়াসের তত্ত্বের পুনরুজ্জীবন ঘটে। দিয়োভালি গিলোনির ‘Chronicle of Florence’ গ্রন্থে আবার চক্রাকার তত্ত্বকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। ভিলানি বলেছেন যে “Success engenders pride, sin and sin brings on decline”. পরবর্তীকালে ম্যাকিয়াভেলী ছিলেন পলিবিয়াসের উত্তরসাধক।

ম্যাকিয়াভেলী তাঁর Discourses গ্রন্থে পলিবিয়াসের তত্ত্ব প্রয়োগ করেন। এছাড়া Francesco Guicciardini তাঁর Ricordi গ্রন্থে বলেছেন, “The Future repeats the past and that only the names of things change.”

‘বিংশ শতাব্দীতে অসওয়াল্ড স্পেঙ্গলার ও আর্নল্ড টয়েনবির রচনার মধ্যে এই তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। এরা বলেছেন, সমগ্র মানব ইতিহাসকে সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জাতি হিসাবে ভাগ করা যায় না। এগুলির আবার জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু আছে। স্পেঙ্গলার তাঁর ‘Decline of the West’ গ্রন্থে বলেছেন, সংস্কৃতির পর্বের পর Rationality-র পর্ব আসে। তারপর আসে সভ্যতার পর্ব। এর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সৃষ্টিশীল উৎসাহ বিনষ্ট হয়। তিনি মনে করেন ‘The cycle of culture-civilization-death-culture goes for ever.’ টয়েনবি তাঁর গ্রন্থে পৃথিবীর ২৬টি দেশের সত্যতাকে নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, ‘All have undergone the same stimuli known as challenges.’ সভ্যতা এই চ্যালেঞ্জের জবাব বিভিন্নভাবে দেয় এবং একেই সেইসব সভ্যতার ইতিহাস বলে ধরা হয়ে থাকে। স্পেঙ্গলার ও টয়েনবির লেখার মধ্য দিয়ে ইতিহাসের একটি সাধারণ Pattern পাওয়া যায়। কোন ব্যক্তিগত ঘটনা পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক George Boas ইতিহাসের চক্রকে ঘড়ির পেণ্ডুলামের সঙ্গে তুলনা করেছেন যেটি বারবার একই জায়গায় ফিরে আসে। তিনি বলেছেন, “The doctrine of historical cycles is that based on the metaphor of the swinging pendulum according to which an historical movement will reach an extreme and the turn back until it reaches an opposite extreme. Thus radicalism and conservatism in politics, romanticism and classicism in art, skepticism and authoritarianism in religion have all been said to occur in this manner.”

আধুনিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে ভিকোর অবদানগুলির অন্যতম হল তার চক্রাকার পরিবর্তনের তত্ত্ব। এই তত্ত্ব বলা হয়েছে যে, সাধারণভাবে এবং বিশেষ করে জাতিগত ইতিহাস কয়েকটি অগ্রগতির স্তর অতিক্রম করে এগিয়ে যায়। যেমন উত্থান, পরিপূর্ণতা, ক্ষয় এবং পতন। ভিকো এই অভিমত পোষণ করেন যে, একটি সমাজ-জীবনের বিভিন্নধারা তাদের চলার পথে একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। ইতিহাসের অগ্রগতির স্তরগুলি তাদের নিজস্ব প্রথা, আইন-কানুন, অর্থনীতি, সাহিত্য এবং শিল্পের মাদ্যমে এগিয়ে চলে। ইতিহাসের এই অগ্রগতিকে ভিকো তিনটি অধ্যায় বা স্তরে বিভক্ত করেছেন। ভিকো তাঁর প্রথম স্তরটির নাম দিয়েছেন ‘Age of God’ বা ‘ঈশ্বরের যুগ’। ভিকোর মতে, এই যুগের মানুষ বিশ্বাস কদরত যে, তাঁরা ঈশ্বরের শাসনে বসবাস করছে। ভিকোর মতে, সমাজে আদিমতম অধ্যায় ছিল ঐশ্বরিক। কারণ সংস্কৃতিগতভাবে এই যুগ ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। ভিকো তাঁর দ্বিতীয় স্তরটির নাম দিয়েছেন ‘Age of Heroes’ বা ‘বীরদের যুগ’। আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ এবং বহিঃআক্রমণের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য অলিগার্কি বা মুষ্টিমেয় শাসন প্রচলিত হয়। এই সময় সমাজ ‘Patrician’ এবং ‘Plebian’ ক্রীতদাস এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায়। এই সময় শক্তিশালী এবং সম্মানীয় যুদ্ধবাদী অভিজাততন্ত্র সমাজের আইনসম্মত পদের অধিকারী ছিল। যেহেতু বীরদের প্রতিহত করবার জন্য সমাজে কোন বাস্তব আইন ছিল না সেজন্য দ্বৈরথ সংগ্রামই ছিল যে কোন দ্বৈর মীমাংসার সহজ পদ্ধতি। ভিকোর বক্তব্য অনুসারে ক্রমশঃ মর্যাদার চূড়ায় ওঠা এই সমস্ত বীরদের স্বৈরাচারী হয়ে ওঠার প্রবণতা আরেক ভাবে প্রতিহত হত। সেটি হল এই সমস্ত বীররা ঈশ্বরের নিকট দায়বদ্ধ ছিল। যেহেতু বীরদের ক্ষমতাকে ‘ঐশ্বরিক’ বা ‘divine’ বলে মনে করা হত, সেজন্য ক্রীতদাসরা এদের তুলনায় নিচুমানের জীবনযাত্রাকে স্বাভাবিক হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছিল। ভিকো বর্ণিত তৃতীয় স্তর হল ‘মানুষের যুগ’ বা ‘Age of men’। এই যুগে প্রত্যেকটি মানুষ সমান

মর্যাদার অধিকারী ছিল। এইভাবেই গড়ে উঠেছিল প্রথম জনপ্রিয় শাসনতন্ত্র। এই শাসন ব্যবস্থায় মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই যুগ ছিল সম্পূর্ণভাবে মানবতার যুগ। এইযুগে শুভবুদ্ধি ও কর্তব্যবোধের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। এই যুগের সরকার মানুষের স্বাধীনতা ও সাম্যের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। এই যুগে প্লেবিয়ানরা তাদের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছিল এবং তা অর্জনও করেছিল। কিন্তু ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা সমাজ দোদুল্যমান হয়ে ওঠে। মূল্যবোধ ও প্রথাগত ব্যবস্থার মধ্যে ঘটে যায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আসে গণতন্ত্রের যুগ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আসে দুর্নীতি ও অকর্মণ্যতা। পরিণামে সমাজে শুরু হয় অবক্ষয়। ভিকোর মতে, এই চক্রের শেষ হয় বৈদেশিক আক্রমণে বা গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। পরিণামে আবার আসে পুরানো বর্বরতা এবং সূচনা হয় নতুন এক চক্রের। ভিকো এই চক্রের নাম দিয়েছেন ‘Recorso’ বা ‘Recurrence’।

ইতিহাসে চক্রাকার আবর্তন তত্ত্ব হল একটি নীতি যার অর্থ হল সমস্ত ঘটনাই চক্রাকার পদ্ধতিতে প্রায় একইভাবে ফিরে আসে। চক্রাকার তত্ত্ব প্রাচীন ভারত, ব্যাবিলন ও গ্রীসে প্রচলিত ছিল। ফ্রেডারিক নিংস, এমপোডোক্লিস, হেরাক্লিটাস ও এ্যারিস্টটল এই মতের সমর্থক ছিলেন। মধ্যযুগে এই তত্ত্ব স্তিমিত হয়ে যায় কিন্তু রেনেসাঁসের যুগের গোড়ার দিকে পলিবিয়াসের তত্ত্বের পুনরুজ্জীবন ঘটে। বিংশ শতাব্দীতে অসওয়াল্ড স্পেঞ্জার ও আর্নল্ড টয়েনবির রচনার মধ্যে এই তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। আধুনিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে ভিকোর অন্যতম অবদান হল তার চক্রাকার পরিবর্তনের তত্ত্ব। তার তত্ত্ব অনুযায়ী অতীতে যা লঘুটেছিল, তা ভবিষ্যতেও ঠিক একইভাবে ঘটবে।

সাধারণভাবে বলা যায় যে, ভিকোর ধারণা অনুযায়ী অতীতে যা ঘটেছিল, তা ভবিষ্যতেও ঠিক একইভাবে ঘটবে। এইভাবে তিনি ঐতিহাসিক অগ্রগতির একটি স্থায়ী চিত্র অঙ্কন করেছিলেন। বস্তুতঃপক্ষে ‘Recurrence’ ঠিক অতীতের পূর্ণ প্রতিফলন নয়, এটি হল নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে এক বিবর্তন।

এইভাবেই চক্রাকার পরিবর্তনের দৃঢ় সমর্থক ভিকো ইতিহাসের সমান্তরাল অগ্রগতির ধারণাকে বাতিল করে দিয়েছিলেন। ভিকোর চক্রাকার পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় উদাহরণ রোমান সভ্যতা। রোমান সাম্রাজ্য সার্বভৌম শাসন ব্যবস্থার সৃষ্টি করে বিশ্বের সব দেশকেই অতিক্রম করেছিল। আধুনিককালে এক প্রধান চিন্তাবিদ হিসাবে ভিকো ইতিহাসের গতিশীলতাকে অস্বীকার করেছিলেন এবং অনুসন্ধানের এক নতুন পথের নির্দেশ দেন।

প্রশ্ন

- ১। পৃথিবীর কোন কোন দেশে প্রাচীনকালে আবর্তন চক্র প্রচলিত ছিল?
- ২। এ্যারিস্টটল তার কোন কোন গ্রন্থে আবর্তন চক্রের ব্যাখ্যা দিয়েছেন?

১.৪.১০.২ : ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (Historical Materialism)

মর্নীষী কার্ল মার্কস তাঁর নব দর্শনের আলোকে ইতিহাস ব্যাখ্যার যে নতুন পথ উদ্ঘাটন করেছেন, তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে তার মধ্যে নিম্নলিখিত সূত্রগুলি নিহিত আছে।

- (i) ‘যে সকল সংঘর্ষের ফলে যুগে যুগে সমাজের রূপান্তর ঘটেছে তা মানুষের মনোবৃত্তির সৃষ্টি নয়। মানুষ নিজের স্বতন্ত্র ইচ্ছা বা অন্য নিরপেক্ষ চিন্তার দ্বারা সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। ভোগ্যবস্তু উৎপাদন রীতির পরিবর্তনের ফলেই সমাজে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় এবং তারই ফলে সমাজব্যবস্থা রূপান্তরিত হয়ে থাকে।’

সমাজে প্রগতির ইতিহাস অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন দেশে বিভিন্নকালে অনেক বড় বড় সমাজ সংস্কারকের বা চিন্তা নায়কের আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁদের বাণী, তাঁদের প্রচার সমকালীন জনমানসের উপর গুরুতর প্রভাব বিস্তার করেছে, একথাও ঠিক। ইউরোপীয় মহাদেশে গণতন্ত্র ও উদার নীতির প্রতিষ্ঠায় ইংল্যান্ডের জন স্টুয়ার্ট মিল, জেরেমি বেন্থাম কিংবা ফ্রান্সের রুশো, ভলতেয়ার প্রভৃতির বৈপ্লবিক চিন্তার প্রভাব কিংবা আমাদের দেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণকে উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে রামমোহন, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহাপুরুষদের চিন্তার প্রভাব স্পষ্টতই আমাদের অন্তরকে অভিভূত করে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এ সকলের মূল অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাব যে, এইসব চিন্তানায়কের আবির্ভাব আকস্মিক নয়। প্রচলিত বাস্তব অবস্থার প্রবাবেই এদের আবির্ভাব ঘটেছে। পুরানো সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-রীতির ভিতরে তার ধ্বংসকারী প্রতিকূল অবস্থাগুলির সমাবেশের ফলে পুরানো উৎপাদন রীতি ভেঙে পড়েছে। পুরানো উৎপাদন রীতি ভেঙে না পড়লে ইউরোপ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই সম্ভব হত না। সব সময়ই প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থা থেকেই তৎকালীন সামাজিক সম্পর্কগুলি রূপায়িত হয়।

প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থায় সম্পদ সৃষ্টির রীতিনীতি ও সৃষ্ট সম্পদের বিলির ব্যবস্থা যেভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং তার ফলে মানুষে মানুষে যেভাবে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে — তারই সাথে তাল রেখে মানুষের ‘কৃষ্টি’ ও ‘বোধ’ রূপায়িত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। মানুষ এবং পার্থিব বস্তুসমূহের মধ্যে ‘ভোগ্যবস্তুর ব্যবহার প্রণালী’কে অবলম্বন করে অনাদিকাল থেকে সম্পর্ক প্রবহমান রয়েছে। এ সম্পর্ক প্রতি মানবের সহজাত। কোন মানুষই এ সম্পর্ককে পরিহার করতে পারে না।

মানবগোষ্ঠীর সাথে বস্তু সমষ্টির এই যে চিরানুসৃত সম্পর্ক রয়েছে — তারই ফলে এক মানুষ আর এক মানুষের সাথে সম্পর্ক সূত্রে আবদ্ধ হয়। অর্থাৎ মানুষ ও বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ক — মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। ভোগ্যবস্তুর ব্যবহার রীতির পরিবর্তনের সাথে মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্পর্কেরও প্রকারভেদ ঘটে।

মানুষের ধর্মবোধ, ন্যায়-নীতি সম্পর্কীয় ধারণা বা রুচি এগুলির কোনটাই স্থিতিশীল নয়। এককালে যা ‘ধর্ম’ বলে বিবেচিত হয়, ‘ন্যায়’ বলে সমর্থিত হয় অন্যকালের মানুষের বিবেচনায় তাই আবার ‘অধর্ম’ অন্যায় বলে নিন্দিত হয়ে থাকে। যে ক্রীতদাস প্রথা একালে বহু নিন্দিত, সেই ক্রীতদাস প্রথাকে এককালে অ্যারিস্টটলের ন্যায় মহাপণ্ডিতও ‘ধর্মীয় বিধান’ বলে সমর্থন করেছিলেন।

মানুষের সামাজিক ব্যবহার, নীতিবোধ, ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা, ধর্মবোধ-এ সমস্তই পরিবর্তনশীল। ‘সনাতনধর্ম’ কথাটাই স্ববিরোধী। কারণ সভ্যতার ইতিহাসে ‘সনাতন’ বা শ্বাশ্বক ধর্মের কোন হাদিস্ মেলে না। উৎপাদন রীতির পরিবর্তনের ফলে সামাজিক সম্পর্কের প্রকারভেদ ঘটেছে তার সেই জন্যই ন্যায়, নীতি, ধর্ম, পাপ, পুণ্য ইত্যাদি সম্পর্কে মানুষের পূর্বতন ধারণা পাল্টে যাচ্ছে।

মার্কসের নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্র হল মানুষের সামাজিক তেনা ব্যক্তিগত চিন্তা থেকে ভিন্ন। এক একটি আর্থিক-নীতি কতকগুলি সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে। এই সকল সামাজিক সম্পর্কই মানুষের সামাজিক চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

আদিকাল থেকে মানব সভ্যতার অগ্রগতির সূত্র যে সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সামাজিক অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে, সম্পদ উৎপাদন ও সম্পদ বন্টনের পদ্ধতির বিভিন্নতা অনুসারে মার্কস তার নিম্নলিখিত রূপ বিভাগ নির্দেশ করেছেন।

সমাজ গড়ে ওঠে মানুষের সাথে যোগাযোগের ফলে। সৃষ্টির আকাল থেকে প্রকৃতি মানুষে মানুষে এই যোগাযোগ ঘটাচ্ছে। ফলমূল সংগ্রহের জন্য বনে ঘোরার সময় যুথবদ্ধ হয়ে চলাফেরা না করলে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা ছিল। যুথবদ্ধ চলার রীতি বানর সমাজেও দেখা যায়। খাদ্যের জন্য বন্য পশু শিকারের কাজও দলবদ্ধ হয়েই করতে হত। কোন কোন দেশে ভল্লুক, হাতি প্রভৃতি জন্তুর মাংসও খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত হত। এগুলিকে একা একা শিকার করা একেবারেই অসম্ভব। তাই আদি সমাজে জৈবিক প্রয়োজনেই যুথবদ্ধ রূপে জীনযাত্রার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। এযুগে সম্পত্তি বলতে বিশেষ কিছু ছিল না। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হয়নি। তাই এ সমাজে সামূহিক শ্রমে খাদ্য সংগ্রহ, হাতিয়ার প্রস্তুত, আত্মরক্ষা ইত্যাদি অপরিহার্য ছিল বলে আত্ম বস্তুর ভোগও ছিল সামূহিক। এই হল ‘আদিম সাম্যবাদ’। এঙ্গেলস বলেছেন যে, এই আদিম কমুনিজমের যুগেই ‘সম্পত্তির’ প্রথম উদ্ভব হয়। এর ফলে যুথ জীবনে সঙ্কট আসে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত স্বার্থে শ্রমনিয়োগ পুরাতন সামূহিক সম্পদ ও সামূহিক শ্রমের প্রথাকে পরাস্ত করে। আদিম সাম্রাজ্যবাদ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। মনুষ্য সমাজ মানব সভ্যতার এক নতুন স্তরে উন্নীত হয়।

কার্ল মার্কস ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, ভোগবস্তুর রীতির পরিবর্তনের সাথে মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকার ভেদ ঘটে। সভ্যতার প্রতিস্তরেই প্রচলিত আর্থিক রীতির মধ্যে সঙ্কট উদ্ভূত হয় এবং উন্নততর আর্থিক রীতির সন্ধানের জন্যে মানুষের মন ব্যগ্র হয়ে ওঠে। যখন একদল এই উন্নততর আর্থিক রীতির সুযোগ নেবার চেষ্টা করে। তখন তার সঙ্গে পুরানো আর্থিক রীতির আওতায় যে প্রভুশ্রেণী পুষ্ট হয়ে এসেছে। তার সঙ্গে বিরোধ বাধে কারণ তারা নতুন আর্থিক রীতির প্রবর্তনকে প্রাণপণে বাধা দেয়।

নতুন সমাজে প্রাচীন ‘যুথ’ বা ‘কম্যুনের’ স্থান গ্রহণ করল — ‘গোষ্ঠী’। যুথে সমষ্টির প্রাধান্য। গোষ্ঠীতে ব্যক্তি বিশেষের প্রাধান্য। আদিম যুথ সমাজ বিধ্বস্ত হল পশুপালনস্বরূপ নতুন শ্রম কৌশল উদ্ভাবিত হওয়ার ফলে। এরফলে কতকগুলি পশু আর বন্য বা প্রাকৃতিক সম্পদ থাকল না — ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তিতে পরিণত হল।

মার্কস মানব সভ্যতার দ্বিতীয় স্তরে যে গোষ্ঠীপতি-প্রধান সমাজের উল্লেখ করেছেন—প্রাচীন ভারতের ঋষিপ্রধান সমাজ তারই নিদর্শন। গ্রীস দেশের ও রোমের প্রাচীন ইতিহাসে গোষ্ঠীপতি-প্রধান সমাজের চিত্র আরো সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। মানুষের সমাজ বিকাশের ইতিহাসে গোষ্ঠী-প্রধান সমাজ মানুষের জীবন চর্চায় অসামান্য পরিবর্তন নিয়ে আসে।

মান সভ্যতার ইতিহাসে প্রথম সমাজ বিপ্লব যুথ সমাজকে ভেঙে দিয়ে গোষ্ঠীপতি-প্রধান সমাজ প্রতিষ্ঠা করে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তিতেই এই সমাজ গড়ে ওঠে।

মার্কস বলেন — ‘যে অবস্থায় সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যম ও শ্রম নিয়োগের মুখ্য উপযোগী অবস্থা সমূহের উপর ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব থাকে কেবল সেই অবস্থাতেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকতে পারে। সমাজে যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি এল, সাথে সাথে সেই সম্পত্তির মালিকানার সূত্রে সমাজের সমস্ত মানুষ প্রধান দুইটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ল। একশ্রেণী যারা সম্পত্তির মালিক, অপর শ্রেণী যারা সম্পত্তির মালিক নয়। সমাজে প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক স্থাপিত হল।

প্রভু শ্রেণী ও দাস শ্রেণী—এই দুই শ্রেণীতে মানবগোষ্ঠী বিভক্ত হল। একশ্রেণীর লোকেরা পরশ্রমভোগী, অপর শ্রেণীর লোকেরা শ্রমজীবী। এক শ্রেণী শোষক, অপর শ্রেণী শোষিত। গোষ্ঠীপতিদের জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও তাদের বিলাস দ্রব্যের সরবরাহ করবার জন্য প্রচলিত আর্থিক রীতিকে চালু রাখার জন্য ঐ যুগে ক্ষুদ্র শিল্পী, ব্যবসায়ী প্রভৃতিকে নিয়ে এক মধ্যশ্রেণীর উদ্ভব হয়। কিছু কিছু ব্যক্তিগত সম্পত্তি এই মধ্যশ্রেণীর মালিকানাভুক্ত হয়। কিছু দাসেরা মুক্তির জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে। মধ্যশ্রেণীর লোকেরা আপন স্বার্থে তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। পুরাতন আর্থিকরীতির সাথে নব আবিষ্কৃত আর্থিকরীতির লড়াই বাধে। এ লড়াইয়ে গোষ্ঠীপতি প্রধান সমাজ ভেঙে পড়ে। মানব সমাজ আবার সভ্যতার এক নতুন স্তরে উন্নীত হয়।

ভূস্বামীতান্ত্রিক সমাজকে অনেকে সামন্ত-প্রধান সমাজ বলে। একজন বড় ভূস্বামীর অধীনস্থ অন্য ছোট ছোট ভূস্বামীদের ‘সামন্ত’ বলে মার্কস এই সমাজকে ‘ফিউডাল’ সমাজ নামে আখ্যাত করেছে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে দ্বিতীয় সমাজ বিপ্লব হল—ফিউডাল বিপ্লব। ভূমির উপরে মানুষ ও পশুর শ্রম নিয়োগ করে ধনোৎপাদন করার কৌশল অবগত হওয়া মানব মস্তিষ্কের এক যুগান্তকারী উদ্ভাবন।

ফিউডাল আর্থিক রীতি আপন প্রয়োজনেই এক মধ্য শ্রেণীর সৃষ্টি করেছে। এই মধ্য শ্রেণীর লোকেরা প্রধানত বণিক এবং বৃত্তিজীবী শিল্পী। ফিউডাল ব্যবস্থার প্রসারের সাথে সাথে এই মধ্য শ্রেণীর লোকদেরও নিজেদের কাজকর্মে মূলধন নিয়োগের মাত্রা বাড়তে থাকে এবং তাদের ক্রমশঃ বেশি শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। অসম্পৃষ্ট ভূমিদাসরা এদের কাছে প্রশ্রয় পেতে থাকে। মধ্য শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা নতুন বাণী নিয়ে শোষিতবর্গের সম্মুখে দেখা দেন। ফিউডাল প্রভুশক্তির অন্যায় অত্যাচার থেকে মুক্তি লাভের বাণী প্রচণ্ড সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে নতুন আর্থিকরীতি, পুরাতন জরাজীর্ণ ফিউডাল আর্থিক রীতিকে সরিয়ে দিয়ে নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। মানব সভ্যতা আরো এক নতুন প্রগতির ক্ষেত্রে উন্নীত হয়। পণ্ডন হয় নতুন সমাজের, যার নাম পুঁজিতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী সমাজ— ইংরাজীতে বলা হয় ক্যাপিটালিস্ট সমাজ।

শিল্পজ উৎপাদনে স্পষ্টত দুইটি শ্রেণীর বিকাশ ঘটল। এক মালিক শ্রেণী বা শিল্পপতি — যারা শ্রম না করে মূলধন খাটিয়ে মুনাফা লোটে, অপর শ্রেণী মজুরির বিনিময়ে সেই উৎপাদনে শ্রম নিয়োগ করে। একশ্রেণী ‘পুঁজিপতি’ বা মূলধনওয়ালার, অপরশ্রেণী ‘শ্রমিক’ বা মেহনতওয়ালার। এক শ্রেণী মুনাফাভোগী, অপর শ্রেণী মজুরীজীবী। একশ্রেণী মালিক, অপরশ্রেণী মজুর। এই হল পুঁজিবাদী সমাজের শ্রেণী বিভাগের চিত্র।

মানব সভ্যতার প্রত্যেক স্তরে সমসাময়িক সমাজ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় সংস্থা, আইনকানুন প্রভৃতি যে রীতিতে গঠিত ও পরিচালিত হয় তা সেই সমাজের আর্থিক রীতির প্রতিফলন মাত্র। প্রত্যেক সামাজিক স্তরেই উৎপাদন ব্যবস্থায় আধিপত্য যে শ্রেণীর উপর ন্যস্ত থাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাও সেই শ্রেণীর কবলিত হয়। সেই আইন কানুন, ধ্যানধারণা সর্বক্ষেত্রে প্রভুশ্রেণীর স্বার্থের প্রতিফলন দেখা যায়। সভ্যতার কোন বিশেষ স্তরে যে সকল রাষ্ট্রীয় বিধান, আইন, ন্যায়বোধ ইত্যাদি প্রচলিত থাকে তা একদিক দিয়ে যেমন প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থার প্রসূত ফল অন্যদিক দিয়ে প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থার দর্পণ।

ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যা থেকে আমরা যুগে যুগে উৎপাদন প্রকৃতি (mode of production) বদলে যাওয়াতেই ভিন্ন ভিন্ন সমাজের উদ্ভব হয়েছে। উৎপাদনের শক্তি (forces of production) এবং উৎপাদনের সম্বন্ধ (relation

of production) —এই দুই-এর মিলনে উৎপাদনের প্রকৃতি গড়ে ওঠে। উৎপাদনের উপাদান (means of production) যখন গোষ্ঠী বিশেষের সম্পত্তি হয় তখন শ্রেণী বা class কে দেখা যায়। আরো যে সূত্রটি পাই তা হল : ‘সমাজ বিকাশের মূলনীতি (অর্থাৎ দ্বন্দ্ব নীতি) অনুসারে এই কথাই প্রতিপন্ন হয় যে, সমাজের প্রতিস্তরেই বিরোধের বীজ নিহিত থাকে। প্রত্যেক সমাজ তার আপন পরিপুষ্টির সাথে সাথে আত্মধ্বংসের বীজকেও পুরিপুষ্ট করতে থাকে।’

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মানব সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে যে সকল বিশেষ সমাজ গড়ে ওঠে তারা প্রত্যেক জন্মকাল থেকে নিজের গর্ভে আত্মধ্বংসকারী শত্রু শিশুর ভ্রূণকে লালিত করতে থাকে। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ তার বিস্ময়কর অগ্নিগতির সূত্রে একদিকে যেমন পর্বত প্রমাণ সম্পদ সৃষ্টি করে চলেছে, অন্যদিকে তেমনি সর্বহারাজনশ্রেণীর ক্রমাগত স্ফীতি ঘটছে। পুঁজিবাদের নিজের সৃষ্টি এই সর্বহারাজনশ্রেণী পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের গর্ভে লালিত দৈত্য শিশু। এই সংঘর্ষে পুঁজিবাদী সমাজের ধ্বংস অবশ্যস্বাবী এবং আসন্ন। পুঁজিবাদকে ধ্বংস করে সর্বহারার আত্মপ্রতিষ্ঠা মানব ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশ।

সামাজিক রূপান্তর (অর্থাৎ সভ্যতার এক স্তর থেকে অপর স্তরে উন্নয়ন) শান্তিপূর্ণ ক্রমবিকাশের নীতিতে হয় না। বেগবান সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই সমাজের রূপান্তর ঘটে। সভ্যতার প্রতিস্তরেই প্রচলিত আর্থিকরীতির মধ্যে সঙ্কট পাওয়া মাত্র একদল লোক তার সুযোগ নেবার চেষ্টা করে। পুরানো আর্থিকরীতির ধারকদের সাথে তাদের বিরোধ বাধে। পুরানো আর্থিক রীতির আওতায় যে প্রভুশ্রেণী পুষ্ট হয়েছে তারা নতুন আর্থিক রীতির প্রবর্তনকে প্রাণপণে বাধা দেয়। ফলে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন

- ১। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রবর্তক কে?
- ২। পুঁজিবাদী সমাজের দুটি শ্রেণী কী কী?

১.৪.১০.৩ : সমাজতাত্ত্বিক ইতিহাসতত্ত্ব (Sociological Approaches in History)

অগাস্ট কোঁত (August Conte) প্রবর্তিত দৃষ্টিবাদী ইতিহাসচর্চার এক উল্লেখযোগ্য ফলশ্রুতি হিসাবে ইতিহাসচর্চায় সমাজতত্ত্বের প্রতিফলন ঘটে। দৃষ্টিবাদীরা ঐতিহাসিক ঘটনাকে ব্যবহার করে মানব সমাজের গতিপ্রকৃতি কতকগুলি সূত্রের (laws) মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। রাসায়নিক পদ্ধতিতে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করার পর দৃষ্টিবাদীরা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মত সেই তথ্যগুলির মধ্যে অন্তর্নিহিত যোগসূত্র রচনার কাজে নিয়োজিত হন। অর্থাৎ ঐতিহাসিকদের কাজ হল সমাজতত্ত্ববিদদের মত তথ্যগুলির কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজে বের করা। এজন্য R. G. Collingwood বলেছেন, “The sociologist would thus be a kind of super-historian raising history to the rank of a science.” সুতরাং দৃষ্টিবাদী ইতিহাস তত্ত্ব থেকে ইতিহাসচর্চা সমাজতাত্ত্বিকতার দিকে অগ্রসর হয়। ‘Man is Society’ এবং ‘social behaviour’ সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা সচেতন হতে থাকে এবং তা ইতিহাসচর্চায় অন্তর্ভুক্ত করতে থাকে।

এমিনি ডার্কহাইম (১৮৫৮-১৯১৭) এবং ম্যাক্স ওয়েবারের (১৮৬৪-১৯২০) প্রচেষ্টায় ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব

অনেক কাছাকাছি আসে এবং ইতিহাসচর্চায় সামাজিক ইতিহাসের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ঐতিহাসিক H. E. Barnes এবং E. H. Can ইতিহাস সমাজতাত্ত্বিক ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। ঐতিহাসিক কার বলেছেন, ‘Sociology,

সমাজতত্ত্ববিদ ঐতিহাসিকদের কাজ হল একজন সমাজতত্ত্ববিদের মত বিভিন্ন তথ্যগুলির কার্যকারণ সম্পর্কে খুঁজে বের করা। কারণ তাদের মতে সমাজ হল ইতিহাস রচনার মৌলিক উপাদান। যেমন ঐতিহাসিক টয়েনবি সমাজকে ইতিহাস রচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু বলে মনে করেন।

if it is to become a fruitful field of study, must like history concern itself with the relation between the unique and the general; but it must also become dynamic — a study not of society at present but of social change and development.” একথা অনস্বীকার্য যে সমাজবিদ্যা ইতিহাসকে সামাজিক গতিশীলতা অনুভব করতে সাহায্য করে। সামাজিক পরিবর্তন ও অগ্রগতি ইতিহাসচর্চার এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে মানুষ ও তার সমাজ ও বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিবর্তন সামাজিক ইতিহাসের প্রধান

বিষয়বস্তু হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। মানবজীবনের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ যেমন পারিবারিক গোষ্ঠীজীবন, আচারব্যবহার, খাদ্যাভ্যাস, লোকাচার, উৎসব, রমেলা ইত্যাদি সব কিছুই সামাজিক ইতিহাসের সঙ্গ হয়ে উঠেছে।

কার্ল মার্কস তাঁর *The Critique of Political Economy* দেখেয়েছেন সমাজে শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সামাজিক বিপ্লব ঘটে। সমাজ বিপ্লব সামাজিক প্রগতি নিয়ে আসে। প্রাচীন যুগে দাসবিদ্রোহ, মধ্যযুগে কৃষকবিদ্রোহ ইত্যাদি ঘটেছে। ১৬৪২ সনে ইংলণ্ডের বিপ্লব এবং ১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবের ফলে এই দুই দেশে সমাজতাত্ত্বিক সমাজের পরিবর্তে বুর্জোয়া সমাজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৪৮ সালে জার্মানিতেও একটা ঘটনা ঘটে। মার্কস ও এঞ্জেলস্ এর সমাজ চেতনা ও সমাজ ভাবনা নিখাসন্দেহে ইতিহাস রচনাকে প্রভাবিত করেছে। *The Communist Manifesto* সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ঐতিহাসিক A. J. P. Taylor বলেছেন, everyone thinks differently about politics and society, when he thinks at all.” *The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte* সম্পর্কে একই কথা বলেছেন, এডমণ্ড উইলসন। ব্রদেল তাঁর structural history রচনার সময়ও ইতিহাসে social theoryর অবতারণা করেছেন। কারণ সামাজিক তত্ত্ব structure কে প্রভাবিত করে। ঐতিহাসিক টয়েনবিও সমাজকে ইতিহাস রচনার মূলকেন্দ্রবিন্দু বলে মনে করতেন। সমাজ হল ইতিহাস রচনার মৌলিক উপাদান। বর্তমানে ‘Social Mobility’, ‘social protest’, ‘Caste history’ বর্ণব্যবস্থা, ফিউডাল সমাজ, বুর্জোয়া সমাজ, ধনতাত্ত্বিক সমাজ, সামাজিক সংঘাত ইত্যাদি কথাগুলি ইতিহাসচর্চায় বিশেষভাবে স্থান লাভ করেছে। অধ্যাপক ইরফান হাবিব তাঁর *Interpreting Indian History* গ্রন্থে দেখিয়েছেন সুরী ও তুর্কীদের উত্তরভারত বিজয়ের পর এক ধরনের ‘social formation’ হয়েছিল, যার ভিত্তি ছিল ‘labour process’, ‘surplus value’ এবং ‘system of distribution of surplus’ অর্থাৎ ভারতের মধ্যযুগীয় অর্থনীতিতে এক ধরনের স্বতন্ত্র ‘social formation’ হয়েছিল যা সামন্ততাত্ত্বিক অর্থনীতি থেকে আলাদা ছিল।

তবে ঐতিহাসিক আর্থার আরউইক মনে করেন, ইতিহাস ও সমাজবিদ্যার মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র থাকলেও পার্থক্যও আছে। কারণ সমাজতত্ত্ববিদরা ‘general section’ করে থাকেন, যা ঐতিহাসিকরা সাধারণত করতে চান না।

প্রশ্ন

১। সমাজতাত্ত্বিক ইতিহাস চর্চা বলতে কি বোঝ?

১.৪.১০.৪ : তুলনামূলক ইতিহাসতত্ত্ব (Comparative History)

ইতিহাস চর্চায় তুলনামূলক পদ্ধতির প্রধান উদ্দেশ্য হল সাধারণ প্রতিষ্ঠান, ধারণা, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর ঐতিহাসিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে যে সব সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় সেগুলির অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। তুলনামূলক ইতিহাসচর্চার প্রধান এককগুলি হল : রাষ্ট্র, সামাজিক শ্রেণী, প্রতিষ্ঠান এবং ধারণা (idea)। এই ধরনের ইতিহাস চর্চায় এই এককগুলিকে ব্যাখ্যা ও নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন। তাছাড়া যদি সমাজগুলির সামাজিক ও অর্থনৈতিক এককের তুলনা করার ক্ষেত্রে (যেমন—গ্রামীণ ও শহুরে, রক্ষণশীল ও আধুনিক) যথেষ্ট পার্থক্য দেখা দেয়, তাহলে সেই পার্থক্যের স্তরভাগকেও তুলনার অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। যেসব contextual variable-গুলিকে পরীক্ষা করা হবে সেগুলিকে অত্যন্ত যত্ন সহকারে ব্যাখ্যা করতে হবে। সাধারণভাবে তুলনামূলক পদ্ধতি বলতে cross-cultural তুলনাকেই বোঝায়। কিন্তু এই ধরনের অন্যান্য বিষয়কেও তুলনামূলক পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করা যায়। যেমন, কোন একটি সমাজে বিভিন্ন ধরনের ধারণার অনুপ্রবেশ ও গ্রহণ। এই ধরনের বিষয় আলোচনার ক্ষেত্রে সংস্কৃতির পরিবর্তে সেই সমাজে ধারণাগুলি গ্রহণের সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দিকগুলির চিহ্নিতকরণ করতে হবে।

উনিশ শতকের Comparative Method থেকেই আধুনিক তুলনামূলক ইতিহাসচর্চা উদ্ভূত হয়েছে। John Wyon Burrow-এর মতে, “Comparative Method consists in the recognition of similarities between the practices and beliefs of contemporary primitive or barbaric peoples and those recorded in the past history of civilisation” বস্তুতপক্ষে এই Comparative Method কিন্তু অনেক আগেই ব্যবহৃত হয়েছিল। অ্যাডাম স্মিথ, অ্যাডাম ফাণ্ডসন, জন মিলার প্রমুখ স্কটিশ রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদরা তাঁদের লেখায় এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন। মানবসভ্যতার কথা বলতে গিয়ে তাঁরা সমাজের শ্রেণী বিভাজন করেছিলেন সেই সমাজের গঠন পদ্ধতি বা কাঠামোর সাথে মানবদেহের তুলনা করে।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে স্যার হেনরি মেইন আইন ও historical jurisprudence-এর ক্ষেত্রে তুলনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। তাঁর Ancient Law এবং Village Communities in the East and West গ্রন্থ দুটিতে এবং তাঁর অন্যান্য লেখায় তুলনামূলক ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায়। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি গ্রীস ও ভারতের ইউরোপীয় সংস্কৃতির সমধর্মী উৎপত্তির তুলনা করেন। তুলনামূলক পদ্ধতি আলোচনায় তিনি একদিকে যেমন সংস্কৃতির বিকাশের কেন্দ্রীয়করণের কথা বলেছেন, তেমনি অন্যদিকে রাজনৈতিক - অর্থনীতিবিদদের মত পরিবর্তন ও বিবর্তনের কথাও বলেছেন। উনিশ শতকে নৃতত্ত্ববিদ্রাও তুলনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করতে থাকেন। তবে বর্তমানে তুলনামূলক ইতিহাসচর্চা প্রভাবিত হয়েছে কার্ল মার্কসের

উনিশ শতকের Comparative Method থেকে আধুনিক তুলনামূলক ইতিহাসচর্চার উদ্ভূত হয়েছে। তুলনামূলক ইতিহাস চর্চার প্রধান এককগুলি হল :— রাষ্ট্র সামাজিক শ্রেণী প্রতিষ্ঠান এবং ধারণা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক এককের তুলনার ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা দিলে সেই পার্থক্যের স্তরভাগকে তুলনার অন্তর্ভুক্ত করা। কার্ল মার্কস তুলনামূলক ইতিহাসকে বর্তমানে প্রভাবিত করেছেন। টয়েনবির নিজের অজ্ঞাত সারেই রোমের ইতিহাস ও সভ্যতাকে ‘ideal type’ হিসাবে গ্রহণ করে তার ভিত্তিতে অন্য দেশের সভ্যতাকে তুলনা ও মূল্যায়ন করেন। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের তুলনামূলক ইতিহাসের ক্ষেত্রে কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া যায় যেমন — ডারউইনবাদ, আপেক্ষিকতাবাদ, ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি।

মাধ্যমে। মার্কস প্রথম social action-এর সাধারণ তত্ত্ব তৈরী করেন এবং তারপর তা বিভিন্ন সমাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। মার্কস-এর ঐতিহাসিক ব জ্ঞবাদ ও সম্পদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে বিবর্তনের পরিকল্পনাকে সমর্থন করেছিল। এই সম্পদ ছিল বিভিন্ন ধরনের যেমন — tribal বা communal, state, feudal and capitalistic। এই ধরনের পরিকল্পনা ইউরোপের ইতিহাসের পর্ব বিভাজনের সৃষ্টি করে এবং একই সঙ্গে বিভিন্ন সমাজের সামাজিক পরিকাঠামোর মধ্যে তুলনা করার পদ্ধতির অবতারণা করে। মার্কস-এর ম্যাক্স ওয়েবারও তুলনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করেন। তিনি ধর্মীয় মূল্যবোধ, আমলাতন্ত্র এবং কৃষিকার্যের বিভিন্ন প্রথাগুলির মধ্যে তুলনা করেন। তাঁর approach ছিল typological। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতার গঠনকে একত্রিত করে একটি ধারার মধ্যে নিয়ে আসেন। যেমন—modern bureaucracies of the West, ancient bureaucracies of the old empires, partrimonialism, hierarchy, and caesaro-papism—এই model গুলিকে তিনি অন্য model-এর সঙ্গে তুলনা করেন এই উদ্দেশ্যে যে এর ফেলে একদিকে যেমন subtype গুলির মূল্যায়ন করা যাবে তেমনি কোন একটি বিশেষ model-এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যাবে।

বিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক তাত্ত্বিক আর্নল্ড টয়েনবিও তাঁর বিখ্যাত ‘A study of History’ গ্রন্থে এই পদ্ধতির প্রয়োগ করেন। তিনি ২৬টি দেশের সভ্যতাকে তাঁর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের একক হিসাবে বেছে নেন। হেসই সভ্যতাগুলির পরিবেশগত তাৎপর্য তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। টয়েনবির নিজের অজ্ঞাতসারেই রোমের ইতিহাস ও সভ্যতাকে ‘ideal type’ হিসাবে গ্রহণ করে তার ভিত্তিতে অন্য দেশের সভ্যতাকে তুলনা ও মূল্যায়ণ করেন। তিনি খ্রিস্টধর্মকেও প্রাধান্য দিয়েছিলেন। এজন্য অবশ্য তিনি সমালোচিত হয়েছেন। তা সত্ত্বেও যে বিরাট পরিধি নিয়ে তিনি কোন বিশেষ সভ্যতার dynamic এবং পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করেছেন তা অতুলনীয়। তবে পৃথিবীর ইতিহাস তত্ত্বের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্য এবং বর্তমানে অর্থনীতিকে বিশ্লেষণের একক হিসাবে গ্রহণ করার প্রবণতা দেখা যায় World-economyকে আবার তিনটি type-এ বিভক্ত করা যায়—Corestates, peripheral areas, এবং semi-peripheral areas. তৃতীয় Core এবং Peripheral-এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মধ্যস্থের ভূমিকা পালন করে। মার্শাল হজসন পাঁচ ধরনের এর কথা বলেছেন, যাদের মাধ্যমে আন্তঃআঞ্চলিক তুলনা করা যেতে পারে। এগুলি হল : (i) Common events (2) Parallel developments (3) supra regional effects (4) activity motifs (5) the inter regional role of specific regions.

হজসন ঐতিহাসিক তুলনার ক্ষেত্রে যে এককগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন সেগুলি হল — সভ্যতা, অঞ্চল, সাংস্কৃতিক এলাকা এবং সভ্যতার ট্রাডিশন।

বৌদ্ধিক তুলনামূলক ইতিহাস সাধারণত একটি বা অনেকগুলি ধারণার উপর ভিত্তি করে সেগুলিকে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে। বৈজ্ঞানিক ধারণা বা তত্ত্বের তুলনামূলক ইতিহাসের ক্ষেত্রে কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন—ডারউইনবাদ, আপেক্ষিকতাবাদ, ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি।

প্রশ্ন

- ১। আধুনিক তুলনামূলক ইতিহাসের উৎস কি?
- ২। তুলনামূলক ইতিহাস চর্চার প্রধান এককগুলি কী কী?

১.৪.১০.৫ : মার্ক ব্লক ও তুলনামূলক ইতিহাস

মধ্যযুগের ইউরোপীয় সমাজের ইতিহাস পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এই তুলনামূলক পদ্ধতিটিকে নিপুণভাবে প্রয়োগ করেছেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক মার্ক ব্লক। তাঁর মতে, তুলনামূলক ইতিহাস পদ্ধতি ইতিহাসচর্চায় এক মহত্তর কাজ সম্পাদনা করে। কারণ ইতিহাস ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এর ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ব্যবহারিক সমাজ সংস্থা এমনকি সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তুলনামূলক ইতিহাস পদ্ধতিটির প্রয়োগ ঘটেছে।

বেশিরভাগ ঐতিহাসিকই এই পদ্ধতিটির প্রয়োগ রপ্ত করে উঠতে পারেননি। অধ্যাপক ব্লক-এর মতে এর প্রধান কারণ এই যে, অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, তুলনামূলক ইতিহাস হল — ইতিহাসের দর্শন বা সাধারণ সমাজতত্ত্বের একটি অধ্যায় মাত্র। অন্যদিকে ইতিহাস বিশেষজ্ঞরা এমন একটি পদ্ধতি চান যা সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, যাকে সহজেই অনুকরণ করা যায় এবং যা প্রত্যক্ষ ফল দেবার ক্ষমতা রাখে — এমন একটি ব্যবহারিক যন্ত্র। মার্ক ব্লক-এর মতে, তুলনামূলক পদ্ধতি ঠিক এইধরনের একটি যন্ত্র।

অধ্যাপক ব্লক মনে করেন, কোন অঞ্চলের জমিদারী পদ্ধতির ইতিহাস রচনা করতে হলে ঐ জমিদারীর দলিল, দস্তাবেজ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের অংশ বিশেষের সাথে অনবরত তুলনা করতে হবে। কারণ ইতিহাস রচনার বিভিন্ন বিষয়গুলি একই সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অংশ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। কেবলমাত্র কোন জাতি বা রাষ্ট্রের সীমারেখার পাশের ঘটনাগুলির সঙ্গে তুলনা করলেই চলবে না, রাজনৈতিক ও জাতীয় বৈষণ্যের বিষয়টিকেও গুরুত্ব দিতে হবে, কারণ বাস্তব ক্ষেত্রে এই বৈষম্যগুলিই সামাজিক বৈষম্যের সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ বহন করে। ব্লক-এর মতে সমাজ তার সম্পূর্ণতা নিয়ে একটি বৃহত্তর এককের সৃষ্টি করে। সমাজের এই এককগুলি স্থান ও কালের দিক থেকে আলাদা। কিন্তু তুলনামূলক ইতিহাস এই বিভিন্ন সমাজগুলির মধ্যে সাদৃশ্য এবং তাদের পারস্পরিক প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় — পুরাতন গ্রীক ও রোমান সভ্যতার সঙ্গে বর্তমানকালের এবং আদিম সমাজের তুলনা করা যেতে পারে।

তুলনামূলক ইতিহাস পদ্ধতির আর এক ধরনের প্রয়োগের কথা মার্ক ব্লক বলেছেন। এই প্রয়োগের ক্ষেত্রে তুলনীয় একক হল “ভৌগোলিক প্রতিবেশী বা ঐতিহাসিক সমসাময়িক সমাজগুলি অবিরাম পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত।” এই সমাজগুলি ইতিহাসের বিকাশের ক্ষেত্রে একই ধরনের কারণ দ্বারা প্রভাবিত হয়। এর কারণ হল এরা স্থান ও কালের দিক থেকে পরস্পরের খুবই নিকটবর্তী। ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে এই ধরনের তুলনামূলক পদ্ধতি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত।

অধ্যাপক মার্ক পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপে পাশাপাশি অবস্থিত সমসাময়িক সমাজের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এক্ষেত্রে

ঐতিহাসিক মার্ক ব্লক মধ্যযুগের ইউরোপীয় সমাজের পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এই তুলনামূলক পদ্ধতিটিকে নিপুণভাবে প্রয়োগ করেছেন। তুলনামূলক পদ্ধতি প্রত্যক্ষ ফল দেবার একটি যন্ত্র। ব্লক বলেছেন যে ভৌগোলিক প্রতিবেশী বা ঐতিহাসিক সমসাময়িক সমাজগুলি অবিরাম পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রকৃত অর্থে তুলনামূলক ইতিহাস পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য হল পার্থক্য পর্যালোচনা করা। সেই পার্থক্য মৌলিক ও সাধারণ উৎস থেকে হতে পারে।

তিনি ফ্রান্সের দাসত্ব প্রথার অবসানের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন ফ্রান্সের প্রভেন্সে দাসত্ব প্রতার অবসান ঘটেছিল এবং কৃষি সংক্রান্ত রূপান্তর ঘটেছিল। এটি অষ্টাদশ শতাব্দির ঘটনা। ব্লক মনে করেন পঞ্চদশ, ষাটশ ও সপ্তদশ শতকেও এই অঞ্চলে এ ধরনের আন্দোলন ঘটেছিল। কিন্তু কেউ তা লক্ষ্য করেনি। প্রভেন্সে দাসপ্রথার বসানের আন্দোলন ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চলের অন্যান্য আন্দোলন-এর চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

এছাড়া মার্ক ব্লক মধ্যযুগের ইউরোপের মেরোভিজিয়ান ও ক্যারোলিজিয়ান রাজত্বের মধ্যে তুলনা করেছেন। তাঁর মতে ক্যারোলিঞ্জিয়ান রাজত্বকাল ছিল সম্পূর্ণ নতুন এবং মৌলিক বিশিষ্টতায় পরিপূর্ণ। চার্চের সাথে জনগণের সম্পর্কের কথা বিবেচনা করলে মেরোভিজিয়ানদের কেবলমাত্র একজন সাধারণ মত্রাজুস ছাড়া কিছু মনে করা যায় না। অন্যদিকে ক্যারোলিজিয়ান জনগণ রাজার সিংহাসনে আরোহনের সময় থেকেই পবিত্রতার চিহ্ন পেয়েছিলেন।

তুলনামূলক ইতিহাস পদ্ধতির অপরিসীম গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও সমালোচনা তার তীব্র সমালোচনা করেছেন। বিভিন্ন ঘটনার সাদৃশ্য অনুসন্ধান করা ছাড়া এই পদ্ধতির আর কোন উদ্দেশ্য নেই। এই অভিযোগ করা হয় যে, অনেক চেষ্টা করেই এই সাদৃশ্য খোঁজা হয়, সাদৃশ্য খোঁজার জন্য বিভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে প্রয়োজনীয় সমান্তরাল অবস্থান প্রমাণ ছাড়া এবং ইচ্ছা করেই প্রবেশ করানো হয়। যদি এইসব অভিযোগ সত্যি হয়, তাহলে মন করতে হবে যে, এই পদ্ধতিটিতে স্বধর্মের বিকৃতি ঘটেছে। প্রকৃত অর্থে তুলনামূলক ইতিহাস পদ্ধতির মডেল উদ্দেশ্য পার্থক্য পর্যালোচনা করা, সেই পার্থক্য মৌলিক ও সাধারণ উৎস থেকে হতে পারে।

মার্ক ব্লক মনে করেন, “যখন আলোচনা বিশদ, সূক্ষ্ম ও সুপ্রমাণিত তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে, তখনই তুলনামূলক আলোচনার যথার্থ মূল্য পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন

- ১। মার্কব্লক কোন ক্ষেত্রে তুলনামূলক পদ্ধতিটিকে নিপুণভাবে পর্যালোচনা করেছেন?
- ২। মার্ক ব্লকের মতে কোন অঞ্চলের জমিদারী পদ্ধতির ইতিহাস রচনা করতে হলে কি করতে হবে?

১.৪.১০.৬ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী (Suggested Readings)

1. Keith Jenkins (ed) : The Postmodern Histgory Reader.
2. Steven Best and Douglas Kellner : Post modern Theory : Critical Interrogations.
3. Brian Fay, Philip Pomper and Richard T. Vann (eds) : Histoy and Theory :contemporary Readings.
4. Butterfield : Dictionary of the History of Ideas.
5. Collingwood : Idea of History.
6. John Whitlam : ‘Karl Marx’ in John Cannon, ed., Historian at Work.
7. E. H. Carr : What is History

-
- | | |
|-------------------|-----------------------------------|
| 8. H. E. Barnes | : A History of Historical Writing |
| 9. Arthur Marwick | : Nature of History |
| 10. Collingwood | : Idea of History. |
-

১.৪.১০.৭ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Assignment)

1. Critically discuss cyclical view of history.
 2. How did Vico formulate his cyclical views on the basis of three ages of mankind.
 3. Critically discuss Marx's materialist interpretation of history.
 4. How would you explain comparative theory of history.
 5. What is the Sociological History?
 6. Write a note on the approaches of the Sociological Historians.
-

Post-Modernist Critiques of History

বিন্যাস ক্রম :

১.৪.১১.০ : উদ্দেশ্য (Objective)

১.৪.১১.১ : উত্তর-আধুনিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে ইতিহাসের মূল্য নিরূপণ

১.৪.১১.১.১ : ফুকো এবং তাঁর ঐতিহাসিক দর্শন

১.৪.১১.২ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১.৪.১১.৩ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১.৪.১১.০ : উদ্দেশ্য (Objective)

সাম্প্রতিককালে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীতে উত্তর-আধুনিকতাবাদ খুবই আলোচিত, সমালোচিত এবং গুরুত্বপূর্ণ। Michael Foucault, Jacques Derrida, Jean Francois Lyotard প্রমুখ বুদ্ধিজীবী ও দার্শনিকগণ উত্তর আধুনিকতাবাদ সংক্রান্ত আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। বিভিন্ন গবেষক ও বুদ্ধিজীবীগণ বিভিন্নভাবে উত্তর আধুনিকতাবাদের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। ঐতিহাসিক ও দার্শনিক Arran Gare এর সংজ্ঞা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন যে উত্তর আধুনিকতাবাদ এমন পরিস্থিতি যেখানে আধুনিকতা, অগ্রসরতা এবং জ্ঞানদীপ্তি যুগের যুক্তিবাদ এর প্রতি কোন বিশ্বাস জ্ঞাপন করা হয় না। আরও বলা যায় যে, এটি জনগণকে এই মর্মে সচেতন করে যে, এই পরিস্থিতিই কালক্রমে মানবতাবাদকে ধ্বংসের পথে চালিত করে। এটি একটি বিশেষ পরিস্থিতি যেখানে সমগ্র আধুনিক সভ্যতা নিজেই নিজেকে একটি জটিল দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করতে বাধ্য হয়।

সুতরাং এই এককটি পাঠের ফলে শিক্ষার্থী আধুনিক ইতিহাসের এমন একটি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে যা জটিল দার্শনিক চিন্তাভাবনায় সমৃদ্ধ হয়েছে। যা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, তা হল শিক্ষার্থী এই বিষয়টি সম্পর্কেও অবহিত হবে যে, উত্তর আধুনিকতাবাদ ইতিহাসের প্রচলিত চিন্তাভাবনাকে কিভাবে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যাখ্যা করেছে। মিশেল ফুকোর ন্যায় উত্তর আধুনিকতাবাদীগণ কিভাবে জ্ঞানদীপ্তি যুগের চিরাচরিত ধারণাকে খণ্ডন করে ইতিহাসের ধারাকে ভিন্ন পথে চালিত করেছে, তা শিক্ষার্থীকে বিশেষভাবে অবহিত করবে।

১.৪.১১.১ : উত্তর-আধুনিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে ইতিহাসের মূল্য নিরূপণ

জ্ঞানদীপ্তি সামাজিক চিন্তার উপর আধুনিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ঐতিহাসিক চিন্তাভাবনায় একটি মৌলিক অবদান রেখেছে। উল্লেখ্য ইতিপূর্বে ৩০০ বছর পূর্বেও Descartes-এর ন্যায় দার্শনিকগণ ঐতিহাসিক ধ্যান ধারণাকে

চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। কিন্তু এই চ্যালেঞ্জ অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে দেখা দিয়েছে উত্তর-আধুনিকতাবাদীদের কাছ থেকে। সাধারণভাবে তারা এই ধারণা উপস্থিত করেছেন যে ঐতিহাসিক ধারণার কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই। Derrida-র উপর লিখিত একটি প্রবন্ধে David Hoy এই মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, মানব সভ্যতার অগ্রসরের কাহিনী যা ঐতিহাসিক গবেষকদের দ্বারা বর্ণিত হয়েছিল তা এখন কার্যত পরিত্যক্ত। এমনকি এটি একটি বাগাড়ম্বরপূর্ণ অস্তিত্বহীন রূপক কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। David আরও বলেন যে, দর্শন (Philosophy) যা নিজেই মানুষের কার্যকলাপের বিবরণকে তুলে ধরে তা কার্যত এই অলীক কাহিনীরই একটি অংশ।

সপ্তদশ শতকে 'বিজ্ঞান বিপ্লব' শুরু হওয়ার পর থেকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রা শুরু হয়। এই প্রেক্ষাপটেই সামাজিক অথবা মানবিক বিজ্ঞানের (Human Sciences) আবির্ভাব ঘটে। মানুষের আচরণের সুসংহত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনও অভিন্ন ধারা আছে কিনা সে বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু হয়। একটি সামাজিক বিজ্ঞানকে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তৎপরতাও শুরু হয়। এই প্রবণতা চলতে থাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়কাল পর্যন্ত যতক্ষণ না পর্যন্ত Sartre-এর মত পণ্ডিতেরা ইতিহাস সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাকে আক্রমণ করেন। Claude Levi Struss বলেন যে, ইতিহাসকে অন্য সব কিছুর ন্যায় জানা যাবে কিছু বৈসাদৃশ্যমূলক সাংকেতিক পদ্ধতির দ্বারা (Codes of Contrasts)। সত্য অথবা স্বাধীনতাকে জানার জন্য ইতিহাস কোনও স্বতন্ত্র উপলব্ধির বিকাশ ঘটায় না। আরও একথাপ এগিয়ে অন্যতম উত্তর আধুনিকতাবাদী দার্শনিক Lyotard। ইতিহাস এবং সমাজের সম্পূর্ণতার ধারণাকে পুরোপুরি খণ্ডন করেছেন। তিনি মার্কসবাদের ন্যায় 'বিস্তৃত বর্ণনামূলক' (Grand narratives) পদ্ধতির উদঘাটন করেছেন বিশ্বজগৎকে পারস্পরিক সম্পর্কের ধাঁচে (Patterned interrelationship) বোঝার জন্য। তবে সবতেকে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাবিদ যিনি এই ধারণা ব্যক্ত করেছেন যে, ইতিহাসে মানুষের আচার আচরণকে সাধারণ আইনকানূনের মাধ্যমে বোঝা যাবে না, তিনি হলেন মিশেল ফুকো।

১.৪.১১.১.১ : ফুকো এবং তাঁর ঐতিহাসিক দর্শন

ফরাসী দার্শনিক Sartre এর পর থেকে মিশেল ফুকো উত্তর আধুনিকতাবাদ বা উত্তর গঠনবাদ (Post - structuralism) সম্পর্কিত ভাবনায় নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। ইতিহাস দর্শনের প্রতি ফুকোর বিরোধপূর্ণ চিন্তাভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, (ক) ইতিহাস মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারাবাহিক বিবরণ তুলে ধরে না। (খ) মনুষ্য প্রকৃতির উপর যুক্তিবাদের আধিপত্যকেও ইতিহাস নির্দেশ করে না। (গ) হেগেল এবং মার্কসবাদী দর্শনের মত কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ইতিহাসে নেই। এই সমস্ত যুক্তিগুলির অবতারণা করে ফুকো জ্ঞানদীপ্তি যুগের দার্শনিকদের দাবী অগ্রাহ্য করে বলেন যে, মানুষ কখনই একটি সর্বজনীন ধারণা (Universal Category) র মধ্যে থাকতে পারে না। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, 'Effective history differs from traditional history in being without constants. Nothing in man-not even his body-is sufficiently stable to serve as a basis for this self recognition or for understanding other men,' ফুকোর মতে, ইতিহাস আমাদের আবেগ, অনুভূতি সবকিছুকেই বিভক্ত করে। সর্বোপরি ইতিহাস ধারাবাহিকতাহীন প্রক্রিয়ার সূচনা ঘটায়।

ফুকোর ধারণায় অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত মানুষের কার্যকলাপের বিস্তৃত ইতিহাস হল মূলত একটি অলীক কল্পনা। এটি বহুল প্রচলিত ধারণা যে, অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত মানুষের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে শৃঙ্খলিত

উন্নতি অর্জন করেছে। কিন্তু মানুষের অতীতকে ফুকো কখনই শৃঙ্খলিত হিসাবে দেখেন নি, বরং সেটি একটি ঝঞ্জাটপূর্ণ সংঘর্ষের দ্বারা (haphazard Conflicts) সংগঠিত হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে মানুষের জীবন ধারাবাহিকতাহীন, অসংখ্য এবং বিরামহীন সংঘর্ষের মধ্যে নিয়োজিত।

ফুকোর ন্যায় Post-Structuralist তথা উত্তর আধুনিকতাবাদীগণ ইতিহাসের প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গী আরোপ করেছেন তার মূলকথা হল বিশুদ্ধ অতীত বলে কিছু হতে পারে না। এবং ঐতিহাসিকরা অতীত সম্পর্কিত যা ব্যাখ্যা প্রদান করেন তা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হতে পারে না। অতীত সম্পর্কিত তথ্যাবলীতে ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ এবং তত্ত্বের ভূমিকা খুব সামান্যই, বরং এই সমস্ত কার্যাবলীতে প্রধানত ঐতিহাসিকের পক্ষপাতপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীই ফুটে ওঠে। একই ঐতিহাসিক ঘটনার বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ বহুমুখী সত্য উদঘাটন করতে পারে। সুতরাং নিরপেক্ষতা একটি অলীক ধারণা।

ফুকো ইতিহাসে সমস্ত রকমের ধারাবাহিকতার তত্ত্বকে অস্বীকার করেছেন। এ প্রসঙ্গে ফুকো বলেন যে ইতিহাসে ধারাবাহিকতার ধারণা চিন্তা এবং সময়ের ধারণার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। এক্ষেত্রে সচেতন মুহূর্তগুলির সম্পূর্ণতার প্রেক্ষাপটটি গুরুত্বপূর্ণ। চিন্তা, মানসিকতা এবং কাজকর্মে সমান্তরাল ধারাবাহিকতা কেবলমাত্র বিচ্ছিন্নভাবে ইতিহাসে দেখা যেতে পারে। কিন্তু আসলে সেখানে মতবিরোধ, বিচ্ছিন্নতা এবং ধারাবাহিকতাহীনতাই লুকিয়ে থাকে এবং এই সমস্ত বিষয়গুলির প্রতিই ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি নিষ্কেপ করা উচিত। কারণ এই সমস্ত বিচ্ছিন্নতাগুলির মধ্যেই ইতিহাস নিক্ষিপ্ত থাকে, কোন স্থায়ী গঠন কাঠামোর মধ্যে নয়।

বস্তুতপক্ষে ফুকো যে ধরনের ইতিহাস লিখেছেন তা চিরাচরিত ইতিহাস নয়। এর বিষয়বস্তু, পদ্ধতি, কার্যকলাপ এবং সিদ্ধান্তসমূহ অতীতকে নুতনভাবে দেখতে শেখায়। সমস্ত ধরনের মানবিক বিজ্ঞানগুলিতে (human sciences) ফুকো ইতিবাচক ধারণাগুলির বিরোধিতা করেছেন। প্রধানত ইতিহাস এবং দর্শনের মধ্যে প্রকৃত সংযোগ সাধনের উদ্দেশ্যে ফুকো এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন যা শেষ পর্যন্ত আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং জ্ঞানদীপ্তির ভিত্তিগুলির প্রতি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গপূর্ণ সমালোচনার পথ প্রশস্ত করে।

১.৪.১১.২ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

1. E. Shreedharan—A Text Book of Historiography
2. অমল বন্দ্যোপাধ্যায়—‘উত্তর-আধুনিকতাবাদ এবং কয়েকজন ফরাসী ভাবুক’
3. Will Thompson—'Post modernism and History'.

১.৪.১১.৩ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

- ১। উত্তর আধুনিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে ইতিহাসের মূল্য নিরূপণ কর?
- ২। উত্তর আধুনিকতাবাদী দার্শনিক হিসাবে ফুকো কিভাবে ইতিহাসের রূপরেখা বিশ্লেষণ করেছেন?

একক ১২

Structure, World-System, Ecological Approaches of History

বিন্যাস ক্রম :

- ১.৪.১২.০ : উদ্দেশ্য
- ১.৪.১২.১ : গঠনবাদ (Structuralism)
- ১.৪.১২.২ : ইতিহাসচর্চায় পরিবেশবিদ্যা (Ecological Historiography)
- ১.৪.১২.৩ : সহায়ক গ্রন্থ
- ১.৪.১২.৪ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১.৪.১২.০ : উদ্দেশ্য

এই অংশটি থেকে ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারবেন :

- ১) গঠনবাদ বলতে কি বোঝায়?
- ২) পরিবেশবিদ্যা চর্চার সাথে ইতিহাস চর্চার সম্পর্ক।

১.৪.১২.১ : গঠনবাদ (Structuralism)

ইতিহাসের ধারণা বা মতবাদের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন হল Structuralism। এই মতবাদের জন্ম হয়েছিল দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে যেটি এখনো বিস্তৃত হচ্ছে। এজন্য এ সম্পর্কে শেষ কথা বলার সময় এখনো আসেনি। 'Structure' সম্বন্ধে ধারণাটি অবশ্য খুবই পুরানো। সপ্তদশ শতকে জীববিদ্যার শব্দকোষে এই শব্দটি পাওয়া যায়। ১৯ শতকে ভাষা সাহিত্য দর্শনের ক্ষেত্রে এই শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়। Structuralism এর কাছাকাছি একটি শব্দ হল 'System'। System ও Structure এর মধ্যে একটি অদ্ভুত সম্পর্ক আছে। যেমন System কাজ করে কিন্তু Structure করে না। যেমন Traffic Singnal System এর মাধ্যমে Traffic নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং Structure in this sense is a more fundamental characteristic of the object it studies." Structure কেবলমাত্র একটি Form নয়। Structure হল 'The significative Contact of the System.'

প্রধান প্রধান গঠনবাদীদের মধ্যে গঠনবাদ আন্দোলনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে মতভেদ আছে। এই আন্দোলন কি কেবলমাত্র সমাজ বিজ্ঞানের Methodology এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে; না এটি সাহিত্যিক সমালোচনা এবং দর্শনের অন্তর্ভুক্ত হবে? একটি বিষয়ে সবাই একমত যে কোন ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে কিছু ধারণার অগ্রগতি বিভিন্ন

ধরনের চিন্তাবিদদের আকৃষ্ট করে। তাঁদের মধ্যে কিছু সাধারণ বৌদ্ধিক মিল দেখা যায়। বর্তমানে সমাজ বিজ্ঞান ও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় Structuralist Trend লক্ষ্য করা যায়। ফার্দিনান্দ সসার ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে Structuralism-এর প্রয়োগ বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন।

গঠনবাদ আন্দোলন জনপ্রিয় হয়েছে প্রধানত লেভিস্ট্রসের দুটি বইকে কেন্দ্র করে। বই দুটি হল Tristes Tropiques (1955) এবং La Pensee Sauvage (1962). তিনি মার্কস এবং এঙ্গেলসের কাছ থেকেই Structure সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। গঠনবাদী বিশ্লেষণ কখনো একটি সরলরেখা ধরে এগিয়ে চলে না, বা কোন নির্দিষ্ট সমস্যা থেকে নিশ্চিত সমাধানের খোঁজে বের হয় না। লেভিস্ট্রস মনে করেন ছড়ানো তথ্যগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা দরকার।

প্রধানত সাংস্কৃতিক কাব্যে গঠনবাদের প্রয়োগ বেশি দেখা যায় যেখানে সবকিছুই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে mind বা মন—এর ফসল। জ্যাক দেরিদা তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধের মাধ্যমে গঠনবাদী দর্শনকে সাম্প্রতিক পশ্চিমী চিন্তাধারায় ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করেছেন। লুই আলথুজার অন্যভাবে Structuralism method ব্যবহার করেছেন। তবে আলথুজার নিজেকে একজন Structuralist বলে মনে করেন না।

মার্ক ব্লক, লুসিয়ান ফেবার, ফার্দিনান্দ ব্রদেল প্রমুখ 'আনাল' গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকেরা তাঁদের রচনায় ইতিহাস গঠন বাদের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তাঁরা মনে করেন, 'Historiography would gain its Structural history' and 'historical events' are brought together is a genuinely historic explanation of human life." এই সমালোচনার উত্তরে Peter Caws বলেছেন "Fashions change, and the value of the structural perspective will survive these changes."

গঠনবাদীদের বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযোগ উঠেছে। প্রথমত, গঠনবাদ হল একটি গোষ্ঠী বা আদর্শ যেখান থেকে Historical Positivist এবং Existentialist দের বাদ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত, যা কিছু দুর্বোধ্য তাকেই Structuralist বলা হয়েছে। তৃতীয়তঃ সাহিত্য ও সমাজের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ আপত্তিকর।

Structuralism এর কাছাকাছি একটি কাজ হল 'System' ও 'Structure' এর মধ্যে একটি অদ্ভুত সম্পর্কে রয়েছে। যেমন System কাজ করে কিন্তু Structure করেনা। যেমন Traffic Signal System এর মাধ্যমে Traffic নিয়ন্ত্রণ করে। সুতারাং Structure শুধু লাল ও সবুজ আলোর সঙ্কেত দেয়।

প্রশ্ন

১। গঠনবাদ বলতে কি বোঝ?

২। গঠনবাদ সম্পর্কে লেভিস্ট্রস-এর বক্তব্য আলোচনা করো।

১.৪.১২.২ : ইতিহাসচর্চায় পরিবেশবিদ্যা (Ecological Historiography)

বর্তমান বিশ্বের এক কঠিন সমস্যা হল পরিবেশগত সমস্যা। সমগ্র পৃথিবী জুড়ে ব্যাপক হারে ভূমির অবক্ষয়, অরণ্য, সংহার, মিষ্টি জলের ঘাটতি এবং জল ও বায়ুদূষণ প্রকৃতির ভারসাম্য বিশেষভাবে বিঘ্নিত করেছে। অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি পৃথিবী থেকে লোপ পেতে চলেছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্কের

যোগসূত্র ছিন্ন হয়েছে। ব্যাপকভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এই সমস্যাগুলিকে আরও জটিল করেছে। শিল্প বিপ্লবের ফলে সারা বিশ্বের শিল্পায়ন একদিকে যেমন নিয়ে এসেছে বিপুল বৈষয়িক প্রাচুর্য; তেমনি অন্যদিকে করেছে ব্যাপক পরিবেশগত অবক্ষয়। প্রযুক্তির হাত ধরে এসেছে তেজস্ক্রিয়দূষণ, বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ, জলদূষণ ইত্যাদি। ফলশ্রুতি হিসাবে নষ্ট হয়েছে পরিবেশগত ভারসাম্য। দেখা দিয়েছে আর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংকট। পরিবেশের এই সমস্যার বিষয়ে ঐতিহাসিকরা নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকতে পারেন না। পরিবেশের এই সংকটের কারণ, প্রকৃতি ও প্রভাব সম্পর্কে তাঁরা অনুসন্ধান, বিচার ও বিশ্লেষণের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করছেন। এর ফলে এক নতুন ধরনের ইতিহাস চর্চার উদ্ভব হয়েছে। যার নাম হল Environmental historiography বা পরিবেশগত ইতিহাস চর্চা। কারণ, আধুনিক পরিবেশবাদের উৎপত্তি ব্যাখ্যা দেবার ক্ষেত্রে ইতিহাসের একটি বড় ভূমিকা আছে। সাম্প্রতিক পরিবেশ সংক্রান্ত বিতর্কে ইতিহাস অবশ্যই নতুন দিক নির্দেশ করার দাবী রাখে।

পরিবেশগত ইতিহাসচর্চাকে তাত্ত্বিক দিক থেকে প্রধানতঃ চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে : (a) biocentric (b) ecological (c) economic (d) ethical. Biocentric তত্ত্বের মূল বক্তব্য হল, প্রাকৃতিক জীবজন্তুকে রক্ষা করা। প্রাচীন কালে বিপদ থেকে মুক্ত হবার জন্য মানুষ ভয়ে প্রকৃতি, গাছপালা ও জীবজন্তুকে শ্রদ্ধা করত ও তাদের রক্ষা করার চেষ্টা করত। পরিবেশ চর্চার ecological দিক বলতে বোঝায় 'something like a stable system, a certain mix of species of plants and animals with natural conditions like climate or soil structure remain in or near a state of equilibrium.' পরিবেশগত ইতিহাস চর্চার অর্থনৈতিক দিক হল প্রকৃতিকে ব্যবহার ও শোষণ করে অর্থনৈতিক উন্নতি করার প্রচেষ্টা। পরিবেশ চর্চার ethical দিক বলতে বোঝায় 'right of nature' বা 'প্রকৃতির অধিকার' এর ধারণাকে বলবৎ ও প্রতিষ্ঠিত করা। এর উদ্দেশ্য হল প্রধানত গাছপালা, জীবজন্তু ও প্রকৃতিকে রক্ষা করা।

ইতিহাস ও Ecology ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। প্রযুক্তি, অর্থনীতি ও সামাজিক সংগঠনের পরিবেশগত প্রভাব পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পড়তে বাধ্য। প্রাচীন যুগে মানুষের খাবার সংগ্রহ, পশুচারণ, স্থায়ী কৃষিকাজ এবং আধুনিক যুগে শিল্পায়ন নিঃসন্দেহে প্রকৃতিকে বিনষ্ট করেছে। প্রাচীন যুগের প্রথম তিনটি কাজের ফলে প্রকৃতি ততটা ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও পরবর্তীকালে অর্থাৎ আধুনিক যুগে শিল্পায়ন ও প্রকৃতিকে ব্যবহার করে অর্থনৈতিক শোষণের মাত্রাতিরিক্ত প্রচেষ্টা পরিবেশের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে। প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের ধারণাকে বিভিন্ন দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রাক-আধুনিক ইউরোপে এবং বিশেষ করে উত্তর-রেনেসাঁস যুগে মানুষ প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা করে। Keith thomas এর Man and the Naturl World গ্রন্থে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অন্যদিকে Simon Schame তাঁর বিখ্যাত বই Landscape and Memory গ্রন্থে সাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্য প্রভৃতি উপাদান ব্যহার করে দেখিয়েছেন যে ইউরোপীয় সংস্কৃতি কিভাবে প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক নষ্ট করেছিল। আদিম অরণ্য, নদী-জীবন, পবিত্র পর্বতের ধারণা ধীরে ধীরে অস্তহিত হতে থাকে। তবে পরিবেশ ইতিহাসচর্চার সবচেয়ে বড় দিক হল পরিবেশ আন্দোলন। এই আন্দোলনের প্রধান শক্তি হল পরিবেশ রক্ষার আর্দর্শগত ও নৈতিক দিক। Donald Worster মনে করেন 'Environmental history was born out of a moral purpose'. কারণ অনেকেই মনে করেন যে 'Environmental ethics হল পরিবেশ আন্দোলনের উজ্জীবনী শক্তি।

এখন প্রশ্ন হল, পরিবেশ ঐতিহাসিকরা আধুনিক পরিবেশবাদ বা পরিবেশ চেতনার সূচনাকাল কখন থেকে ঠিক করেছেন? অধ্যাপক রিচার্ড গ্রোভ তাঁর 'Green Imperialism'(1995) ও 'Ecology, climate and Empire'

(1998) গ্রন্থ দুটিতে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে আধুনিক পরিবেশবাদ এর শুরু হয়েছিল। আমেরিকায় পরিবেশগত পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে। গ্রোভ পরিবেশবাদকে আরও তিনশত বছর পিছনে নিয়ে গেছেন। তিনি মনে করেন ১৫০০ থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ঔপনিবেশিক বিস্তৃতি পরিবেশ চিন্তাকে প্রভাবিত করেছিল। উপনিবেশ বিস্তারকারী ইউরোপীয়রা ‘Tropical Forest’ এবং ‘Botanical Garden’ গুলিকে সংরক্ষণের জন্য সচেতন হয়। ১৫৭১ খ্রিষ্টাব্দে Fernandery Oveido আবহাওয়ার পরিবর্তন, বৃষ্টিপাত, গাছপালা সম্পর্কে তাঁর বইতে আলোচনা করেন। প্রধানত ইউরোপীয় বিজ্ঞানের প্রভাবেই উপনিবেশ বিস্তারকারীরা এই ধরনের পরিবেশচিন্তায় সচেতন হয়। রিচার্ড গ্রোভ পরিবেশের ইতিহাসকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখতে চাননি। তিনি পরিবেশ চেতনাকে সংস্কৃতি, ধর্ম, ও অর্থনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেখতে চেয়েছেন। পর্তুগীজ ও ডাচদের মধ্যেও পরিবেশ চেতনা বা প্রকৃতি সংরক্ষণের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ১৫৩৬ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগীজ চিকিৎসক Garcia da orta এ সম্পর্কে একটি বই লেখেন। বইটিতে প্রাচ্য ও ভারতের বিভিন্ন ঔষধি গাছপালা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এইসব গাছপালা থেকে সংগৃহীত ঔষধ ইউরোপে যেত। বইটিতে স্থানীয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ১৬৭৮-১৬৯৩ খ্রিষ্টাব্দে ১২টি খণ্ডে প্রকাশিত Dutch Botanical Encyclopaedia সংকলন করেন Van Reede। তিনি স্থানীয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উপর গুরুত্ব দেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে রাষ্ট্রীয় পরিবেশবাদ বা বিশ্ব পরিবেশবাদ (Global environmentalism) ধারণার সৃষ্টি হয়। রিচার্ড গ্রো মনে করেন, আধুনিক পরিবেশবাদ আলোচনায় স্থানীয় পরিবর্তে বিশ্বকে গুরুত্ব দেওয়া দরকার। পরিবেশ চিন্তার ক্ষেত্রে Forster, Robert Kyd এবং Alexander Von Humbolt এর নাম উল্লেখ করা যায়। Robert Kyd ১৭৮৬ সালে কলকাতায় Botanical Garden প্রতিষ্ঠা করেন। Humbolt অরণ্য ধ্বংসের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। Roxbarg বৃক্ষ রোপণের উপর গুরুত্ব দেন। Nathaniel Wallich বাংলায় বাঁশ গাছ কাটার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। Sleeman উত্তর ভারতের অরণ্য সংরক্ষণের পক্ষে মতামত দেন। এইসব আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক রিচার্ড গ্রোভ মনে করেন, “Modern environmentalism is the child of European and colonial experience as well as knowledge.” তবে গ্রোভের আলোচনার প্রধান ত্রুটি হল তিনি পরিবেশ সচেতনতার উপর বেশী জোর দিয়েছেন, পরিবেশ ধ্বংসের উপর জোর দেননি। সাম্প্রতিককালে ভারতের পরিবেশ ইতিহাস সম্পর্কে বিখ্যাত বইটি হল রামচন্দ্র গুহ ও ডেভিড আর্নল্ড সম্পাদিত Nature, culture and imperialism গ্রন্থটি। বইটিতে অধ্যাপক নীলাদ্রি ভট্টাচার্য ও সাতলুরি মুরালি তাঁদের প্রবন্ধের মাধ্যমে দেখাতে চেয়েছেন সংস্কৃতি ও ট্র্যাডিশনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে পরিবেশ পরিবর্তনকে বুঝতে হবে। মুরালি দেখিয়েছেন কিভাবে সাহিত্যের মধ্যে পরিবেশ পরিবর্তন সম্পর্কে মানুষের চেতনা প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

পরিবেশ আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে আদর্শগত বিভিন্নতার কথা বলা দরকার। বিভিন্ন গোষ্ঠী এইসব আন্দোলনের নেতৃত্বে দিচ্ছেন। এঁদের মধ্যে আছেন গান্ধীবাদী, মার্কসবাদী ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানীরা। গান্ধীবাদী আদর্শে পরিবেশ আন্দোলনের একজন উল্লেখযোগ্য নেতা হল সুন্দর লাল বহুগুণা। এঁরা পরিবেশ সংরক্ষণের উপর বেশি গুরুত্ব দেন। মার্ক্সবাদী পরিবেশবিদরা প্রধানত ব্যবসায়িক বনসৃজন, অনিয়ন্ত্রিত খনি স্থাপন, ইত্যাদির বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষপাতী। প্রযুক্তিবিদরা অবশ্য চেষ্টা করেছেন কিভাবে কৃষি ও শিল্পের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা যায়। তবে সবশেষে বলা যায়, যদিও বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য আছে তবুও তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতার কথা, উপেক্ষা করা যায় না।

১.৪.১২.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

1. Keith Jenkins (ed) : The Postmodern History Reader.
2. Steven Best and Douglas Kellner : Post modern Theory : Critical Interrogations
3. Brain Fay, Phiip Pomper and Richard T.Vann(eds) : History and Theory ; Contemporary Readings.
4. Butterfield : Dictionary of the History of Ideas.
5. Collingwood : Idea of History.
6. John Whitlam : 'Karl Marx' in John Cannon, ed, Historian at Work.
7. Michel Lane (ed) ; Structuralism : A Reader.
8. Derk Attridge (ed) : Post- Structuralism and the Question of History.
9. Richard Macksey and Eugenio Donato (ed) : The Structuralist Controversy : The Languages of Criticism and the Sciences of Man.
10. Richard Grove : Green Imperialism, Colonial Expansion, tropical island Eens and The Origins of Environmentalism 1600-1800.
11. Alfred W. Crosby : Ecological Imperialism and the biological of Europe.
12. David Arnold and Ramchandra Guha (ed) : Nature, culture, Imperialism.
13. Gadgil and Guha (ed) : Ecology and Equityy, the Use and abuse of nature in contemporary India.

১.৪.১২.৪ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

1. How would you define Structuralism?
2. Analyse the main features of Ecological historiography.
3. Make an assessment of the contribution of Richard Grove to the development of ecological historiography.

প্রশ্ন

- ১। পরিবেশগত ইতিহাসচর্চার তত্ত্বগত বিভাজনগুলি কি কি?
- ২। পরিবেশ ইতিহাস চর্চায় রিচার্ড গ্রোভের অবদান আলোচনা করো।
- ৩। পরিবেশ চেতনার ঐতিহাসিক পটভূমি আলোচনা করো।
- ৪। পরিবেশ ইতিহাস চর্চার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করো।

পর্যায় গ্রন্থ-৫

একক-১৩

Economic, Labour and Peasant, Varna, Jati, Janajati and Gender

বিন্যাস ক্রম :

- ১.৫.১৩.০ : উদ্দেশ্য (objective)
- ১.৫.১৩.১ : অর্থনৈতিক ইতিহাস (Economic History)
- ১.৫.১৩.২ : কৃষক ও শ্রমিকদের ইতিহাস (History of the peasants and workers)
- ১.৫.১৩.৩ : সূচনা—শ্রমিকদের নিয়ে ইতিহাসচর্চা
- ১.৫.১৩.৪ : শ্রমিক ইতিহাসচর্চার ধারা (Trend of Labour Histroiography)
- ১.৫.১৩.৫ : উপসংহার (Conclusion)
- ১.৫.১৩.৬ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী (Suggested Redings)
- ১.৫.১৩.৭ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Assignment)

১.৫.১৩.০ : উদ্দেশ্য (objective)

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন :

- (১) ভারতীয় অর্থনীতির ইতিহাসের সূচনাপর্ব
- (২) ব্রিটিশ যুগে ভারতীয় অর্থনীতি সম্পর্কে ভারতীয় ও ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ ও ঐতিহাসিকদের বক্তব্য ও তাদের মধ্যে বিতর্ক
- (৩) ভারতীয় অর্থনীতির উপর ঔপনিবেশিক প্রভাব এবং ব্রিটিশ শাসনে সম্পদের নির্গমণ
- (৪) কৃষকদের নিয়ে ঐতিহাসিকদের ইতিহাসচর্চার সূচনাপর্ব এবং স্বাধীনতা -সংগ্রামে কৃষকদের ভূমিকা
- (৫) শিল্প ও শ্রমিক শ্রেণীকে নিয়ে ইতিহাসচর্চার সূচনা ও প্রসার —স্বাধীনতার পূর্বে ও উত্তরপর্বে।
- (৬) ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং শ্রমিক আন্দোলনে শ্রমিকদের অবদান নিয়ে ইতিহাসচর্চা
- (৭) শ্রমিক ইতিহাসচর্চার সূত্রপাত
- (৮) শ্রমিক ইতিহাসচর্চার ধারা
- (৯) শ্রমিক ইতিহাসচর্চার মূল্যায়ন

১.৫.১৩.১ : অর্থনৈতিক ইতিহাস (Economic History)

আঠারো শতকে শিক্ষার একটি বিষয় হিসাবে অর্থবিদ্যার (Economics) আবির্ভাব ইতিহাসেরও একটি নতুন শাখার উদ্বোধন ঘটায়। সেটি হল অর্থনৈতিক ইতিহাস। অর্থবিদ্যার জগতের আদিপুরুষরা হলেন এ্যাজাম স্মিথ ও অন্যান্য ফ্রপদী অর্থনীতিবিদরা। শিল্পবিপ্লবের সময়ে ইংলণ্ডের একদল চিন্তাবিদ ও ফ্রপদী অর্থনীতিবিদদের কাছে ভারতও একটি আগ্রহের বিষয় ছিল। তাঁরা ‘লেসে ফেয়ার’ (অবাধ বাণিজ্য) নীতির প্রবক্তা ছিলেন এবং দেশের অর্থনীতিতে যতটা কম সম্ভব রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ-এর পক্ষপাতী ছিলেন। অগ্রগণ্য ফ্রপদী অর্থনীতিবিদ এ্যাজাম স্মিথ ভারতের শাসক হিসাবে ইসচ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নতুন ভূমিকার নিন্দা করেন। তিনি কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের সমালোচনা করেন। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জে. এম. কেইনসের প্রভাবে অর্থবিদ্যার জগতে তত্ত্বের আবির্ভাব ঘটে। তিনি জনকল্যাণ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য সরকারের কৌশলগত হস্তক্ষেপের কথা বলেন। কেইনস্ ভারতের কথাও গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন। এর প্রমাণ হল তাঁর ‘Indian Currency and Finance’ গ্রন্থখানি। সর্বোপরি, ১৮১৩ এবং ১৮৩৩ সালের চার্টার আইন দুটির মাধ্যমে কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অবসান ঘটানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এ্যাজাম স্মিথের প্রভাব যথেষ্টই ছিল। ইংলণ্ডে অর্থনৈতিক চিন্তাধারার বিবর্তন এবং ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় সংস্কারের সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় ছিল সে বিষয়ে ঐতিহাসিকরা সতর্ক দৃষ্টি দিয়েছিলেন। এই ধারণার প্রকাশ ঘটেছিল কয়েকটি গ্রন্থের মাধ্যমে। যেমন Eric Stokes এর ‘The English Utilitarians and India’ : S Ambirajan এর ‘Classical Political Economy and British Policy in India’. এবং A Chandravarkar-এর ‘Keynes and India : a study in Economics and Biography’.

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থবিদ্যায় অগ্রগতির বীজ কেনসীর অর্থনীতি বপন করেছিল। অন্যদিকে ইংলণ্ডের ফ্রপদী রাজনৈতিক অর্থনীতি উনিশ শতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবাধ বাণিজ্য অর্থনীতির ভিত্তি স্থাপন করেছিল। এই দুই ধরনের অর্থনৈতিক নীতি ভারতীয় রাষ্ট্র ও অর্থনীতিকে প্রভাবিত করেছিল এবং এর ফলে ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসে বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

প্রথম দিকের ঔপনিবেশিক লেখকরা স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গেই দেশীয় অর্থনীতির উপর ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব সম্পর্কে সমালোচনা করেছিলেন এবং তাঁরা ভারত থেকে ইংলণ্ডে সম্পদ নিগর্মনেরও নিন্দা করেছিলেন। তাঁরা *The Seir Mutaqherin* (1789) এর লেখক সৈয়দ গোলাম হুসেন খান এর বক্তব্যকেও অস্বীকার করেন নি। গোলাম হুসেন বলেছিলেন, এদেশে ইংরেজদের যেন অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল ‘scraping together as much money as they can and carrying in immense sums to the kingdom of England’. এছাড়া ‘Historical Review of the External Commerce of Calcutta from 1750 until 1830’ শীর্ষক সরকারী রিপোর্টে এদেশে সম্পদ লুণ্ঠনের কথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করা হয়েছিল।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে যখন সমালোচনায় ভারতীয় মতামত প্রকাশ পেতে থাকে, তখন ঔপনিবেশিক প্রশাসন দেখানো চেষ্টা করে যে ভারতে কী রকম অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে। মাদ্রাজ প্রশাসনের তরফ থেকে প্রকাশিত ‘Memorandum on the progress of Madras Presidency during the last forty years of the British Administration’ গ্রন্থে ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে সমর্থন করা হয়। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের দ্বিতীয় শতকে একদিকে

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমর্থক (apologist) ও অন্যদিকে সমালোচক (critic) দের মধ্যে বিতর্ক চলতে থাকে। ভারতীয় জাতীয়বাদীরা, ভারতের পক্ষে সহানুভূতিশীল ইংরেজরা এবং মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীরা ভারত থেকে সম্পদের নিগমণ

আঠারো শতকে শিক্ষার একটি বিষয় হিসেবে অর্থনৈতিক ইতিহাসের আবির্ভাব ঘটে। এর ফলে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবাধ বাণিজ্য নীতি নিয়ে একদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমর্থক ও অন্যদিকে সমালোচকদের মধ্যে বিতর্ক চলতে থাকে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা, ভারতের পক্ষে সহানুভূতিশীল ইংরেজরা এবং মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীরা ভারত থেকে সম্পদের নিগমণ এবং ভারতকে দরিদ্র করে তোলার জন্য ব্রিটিশ সরকারকে দোষারোপ করেন। অন্যদিকে ঔপনিবেশিক অফিসাররা দেখান যে ভারতে কোনভাবেই সম্পদশূন্য করা হয়নি।

এবং ভারতকে দরিদ্র করে তোলার জন্য ব্রিটিশ সরকারের উপর দোষারোপ করেন। অন্যদিকে লর্ড কার্জনের উদ্যোগে ঔপনিবেশিক অফিসাররা দেখানো চেষ্টা করে যে ভারতকে কোনভাবেই সম্পদশূন্য করা হয়নি এবং তাঁরা দুপক্ষেরই জাতীয় আয়ের হিসাব দাখিল করেন। ভারতীয়দের পক্ষে এইসময়কার দুটি বিখ্যাত বই হল—দাদাভাই নওরোজীর লেখা 'Poverty and Un-British Rule in India : এবং উইলিয়াম

জিগ্‌বি-র লেখা "Prosperous" British India : a Revelation from the Official Records. অন্যদিকে ব্রিটিশ পক্ষের বিখ্যাত প্রবন্ধ হল F.T. Atkinson-এর লেখা 'A Statistical Review of the Income and Wealth of British India : লেখাটি Journal of the Royal Statistical Society তে প্রকাশিত হয়েছিল। Atkinson ছিলেন বড়লাট লর্ড কার্জনের অধীনে একজন অফিসার। তিনি তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন যে ধীরে হলেও ভারতে জাতীয় আয় কীভাবে ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অন্যদিকে দাদাভাই নওরোজী বিপরীত বক্তব্য রাখেন। তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন ভারত থেকে সম্পদ নিগমণের পরিমাণ ১৮০০ সালে যেখানে ছিল ৫,০০০,০০০ পাউণ্ড সেখানে তা বিংশ শতাব্দীর শুরুতে হয়ে দাঁড়া. ৩০,০০০,০০০ পাউণ্ড।

ব্রিটিশ ও ভারতীয় পক্ষের লেখকদের এই বিতর্কের ফলে ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে কতকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখ করা যায় রমেশ চন্দ্র দত্তের লেখা দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ। বই দুটি হল— 'The Economic History of India under Early British Rule (1757-1837)' এবং 'The Economic History of India under the Victorian Age'. তিনি ভারতের ব্রিটিশ শাসনের অর্থনৈতিক কুফলের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি যে বিষয়গুলির উপর জোর দেন সেগুলি হল—চাষীদের উপর অত্যধিক জমির যোজনা, কুটির শিল্পের ধ্বংস, বারংবার দুর্ভিক্ষ এবং ভারত থেকে বাৎসরিক সম্পদ নিগমণ। তিনি লিখেছেন, 'The British had given India peace, but nit prosperity'. তবে ঔপনিবেশিক প্রশাসন দত্ত-র এই জাতীয়তাবাদী বক্তব্য মেনে নেয়নি।

তাঁর ব্রিটিশ ধ্বংসাত্মক অর্থনীতির সমালোচনা পরবর্তীকালে R.P. Dutt প্রমুখ মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীরা গ্রহণ করেন। ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য R.P. Dutta ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের সমালোচনা করে India Today গ্রন্থটি রচনা করেন। বইটি লণ্ডন থেকে প্রকাশ হয়েছিল কিন্তু ব্রিটিশ সরকার ভারতে এই বইটির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। তিনি ভারতে ব্রিটিশ অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের তীব্র সমালোচনা করেন।

ভারতীয় অর্থনীতিতে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব ও ব্রিটিশ শাসনে ভারতের সম্পদশূন্যতদা সম্পর্কে এই বিতর্ক শিক্ষিত মহলে একটি প্রশ্নের সৃষ্টি করেছিল। সেটি হল—ব্রিটিশ শাসনের আগে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল? তখন কী ভারত অনেক বেশী সম্পদশালী ছিল? জাতীয় আয় কী তখন বেশী ছিল? ঔপনিবেশিক

শাসনের প্রথম দিকে দেশীয় অর্থনীতির গঠন সম্পর্কে সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এক্ষেত্রে পূর্ব দক্ষিণ ভারত সম্পর্কে ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিল্টনের বই উল্লেখযোগ্য। তিনি কৃষি, শিল্প ও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উপর বিস্তারিত অনুসন্ধান করেন। এ সম্পর্কে তাঁর বই দুটি হল—A Journey from Madras through the Countries of Mysore, Canara and Malabar এবং An Account of the Districts of Bihar and Patna in 1811-1812 পরবর্তীকালে অনেক ঐতিহাসিক মুঘল যুগের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে শুরু করেন।

প্রকাশিত হয় Edward Thomas এর *'The Revenue Resources of the Mughal Empire in India'* এবং যদুনাথ সরকারের *'India of Aurangzed : Topography, Statistics and Roads'*-প্রাক ঔপনিবেশিক যুগের ভারতের সাধারণ অর্থনৈতিক ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক হলেন W.H. Moreland তাঁর বইগুলি হল : *India at the Death of Akbar, From Akbar to Aurangzeb* এবং *Agrarian System of Moslem India*. মোরল্যাণ্ড হিসাব করে দেখিয়েছেন যে টোডরমলের সার্ভে অনুযায়ী ভারতের জাতীয় আয় বিংশ শতাব্দীর শুরুর তুলনায় আকবরের আমলে বেশি ছিল না। মোরল্যাণ্ডের সিদ্ধান্ত হল 'a parasitic agrarian despotism had driven India to an economic dead end, despite the considerable, expansion of foreign trade that the Dutch and English East India Companies brought about in the seventeenth century'. তিনি আরও বলেছেন যে মুঘল যুগে বিদেশী বণিকরা যথেষ্ট রূপো এনেছিলেন এবং বস্ত্র রপ্তানিকে উজ্জীবিত করেছিলেন। এই বক্তব্যের সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায় K.N. Chaudhuri র লেখা *'The Trading World of Asia and the English East India Company 1660-1760'* গ্রন্থে। মার্কসবাদী ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব মুঘল যুগের ধনতন্ত্র সম্পর্কে যে বিখ্যাত প্রবন্ধটি লেখেন তা হল : *'The Potentialities of Capitalist Development in the Economy of Mughal India'*. অধ্যাপক রজত কান্ত রায় মন্তব্য করেছেন, "Habib demonstrated the sophistication of the Mughal urban economy, but like Moreland he emphasized its parasitic relationship with the heavily taxed rural economy".

ঔপনিবেশিক যুগের অর্থনীতি সম্পর্কে R.C. Dutt এর পর অনেক বই প্রকাশিত হয়। উল্লেখযোগ্য বইগুলি হল : D.R. Gadgil এর *The Industrial Evolution of India in Recent Times*; Vera Anstey র *The Economic Development of India* এবং D.H. Buchanan এর *Development of Capitalist Enterprise in India*. সাম্প্রতিককালে অধ্যাপক তপন রায়চৌধুরী ও ইরফান হাবিব সম্পাদিত *The Cambridge Economic History of India Vol.1 1200-1750* এবং ধর্মা কুমার সম্পাদিত *The Cambridge Economic History of India vol. 2 1757-1970*. বই দুটি খুবই উল্লেখযোগ্য। Daniel Houston Buchanan নামে একজন আমেরিকান লেখকের মতে, ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে কেটি প্রধান বাধা হল জাতিভেদ প্রথা। অন্য দিকে অধ্যাপক গ্যাডগিল এরজন্য অর্থনৈতিক কারণের কথা বলেছেন। সেগুলি হল—'The difficulties of capitalist mobilisation on account of the absolute smallness of capital resources in respect to the size of the population, the late development of organized banking, and the seasonal fluctuations of a monsoon economy'. একজন নিরপেক্ষ অর্থনীতিবিদ হিসাবে তিনি ভারতে শিল্পবিন্যাসের অনুপস্থিতির জন্য ভারতীয় সামাজিক কাঠামো বা বিদেশী শাসনের উপর দোষারোপ করেননি। পশ্চিমী ঐতিহাসিকরা এরজন্য ভারতীয় অর্থনীতির 'technological backwardness' কে দায়ী করেছেন।

ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের ফলশ্রুতি হিসাবে এক বিপুল পরিমাণ বাৎসরিক সরকারী পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে। স্বাধীনতা লাভের পর অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকরা ওই সব পরিসংখ্যানের সাহায্যে জাতীয় আয়, কৃষি ও শিল্প উৎপাদন প্রভৃতির সুদূরপ্রসারী গতিধারা বিশ্লেষণ করেছেন। এই ধরনের গবেষণা সংক্রান্ত দুটি বই-এর কথা উল্লেখ করা যায়। একটির লেখক George Blyn. এর বই এর নাম হল 'Agricultural Trends in India 1891-1947 ; Output, Availability and Productivity'. অন্যটির লেখক S. Sivasubramonian এর বইটির নাম হল—*The National Income of India in the Twentieth Century. Blyn* ১৯২০ সালের পর ভারতের কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রতিকূল গতির সন্ধান পেয়েছেন। প্রধানতঃ বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত Greater Bengal' এরপ ক্ষেত্রে এটি প্রযুক্ত ছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ পর্বে জনপ্রতি খাদ্যের পরিমাণ কমতে থাকে। S. Sivasubramonian দেখিয়েছেন যে ১৯০০ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে ভারতের জাতীয় আয় অত্যন্ত ধীর গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর প্রধান কারণ হল কৃষিক্ষেত্রের অনগ্রসরতা। অন্যদিকে শিল্পে উন্নতি ঘটে। তাঁর মতে এই পর্বে কোন 'de-industrialisation' ঘটেনি।

উনিশ শতকের ক্ষেত্রে এই ধরনের পরিসংখ্যানের যথেষ্ট অভাব আছে। সেজন্য এই শতকে অবশিষ্টায়ন নিয়ে বিতর্কও আছে। যেহেতু এই শতকে যথেষ্ট পরিমাণ শিল্প উৎপাদন হয়নি, সেজন্য এই শতকে প্রকৃতই কুটির শিল্প ধ্বংস হয়েছিল কিনা সে সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ১৯৬০ এর দশকে এ সম্পর্কে বিখ্যাত বির্তকের সৃষ্টি করেছেন মরিস ডেভিড মরিস। অর্থশিল্পায়নের পক্ষে ঐতিহাসিকদের বিরুদ্ধে তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে ভারতের তাঁতীরা ব্রিটেন থেকে আনা কম দামী সুতোর দ্বারা লাভবান হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু কোন পক্ষই যথেষ্ট পরিসংখ্যান উপস্থাপিত করতে পারেননি সেজন্য এই বিতর্কটি 'আলোর পরিবর্তে যথেষ্ট তাপ' উৎপন্ন করেছে মাত্র। অন্যদিকে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমিয় কুমার বাগচীর একটি প্রবন্ধকে

উনিশ শতকে অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটা অন্যতম বিষয় ছিল অবশিষ্টায়ন বিতর্ক। এই বিতর্কের ক্ষেত্রেও আমরা দুই শ্রেণীর ঐতিহাসিকদের উপস্থিতি লক্ষ্য করি। একটা শ্রেণী দেখতে চেয়েছেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ফলে ভারতীয় শিল্পেকতটা সমস্যা ঘটেছিল অন্যদিকে আর একটি শ্রেণী বলেন যে, ব্রিটিশ শাসনের ফলে শিল্পে ক্ষতি হয়নি এবং উন্নতি ঘটেছিল।

নিয়ে বির্তকের সৃষ্টি হয়েছে। প্রবন্ধটির শিরোনাম হল 'Deindustrialisation in Gangetic Bihar 1809-1901' বুকানন হ্যামিলটনের লেখা থেকে তিনি যথেষ্ট পরিসংখ্যানের সাহায্যে দেখিয়েছেন উনিশ শতকে কুটির শিল্পে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা দারুণভাবে কমে যায়। অধ্যাপক বাগচীর বক্তব্যের কঠোর সমালোচনা করেছেন Marika Vieziany. তিনি বাগচীর বুকানন হ্যামিলটন থেকে নেওয়া পরিসংখ্যানগত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। Marika-এর বক্তব্য প্রকাশিত হয় The Indian Economic and Social History Review পত্রিকায়। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম হল : 'The Deindustrialisation of India in Nineteenth Century : A Methodological Critique of Amiya Kumar Bagchi'. এই প্রবন্ধটির সঙ্গে অধ্যাপক বাগচীর 'A Reply' টিও প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে একই পত্রিকায় J . Krishnamurty অধ্যাপক বাগচীর সমর্থন করে একটি প্রবন্ধ লেখেন। শিরোনাম হল : 'De-industrialisation in Gangetic Bihar during the nineteenth century : Another Look at the Evidence'. কিন্তু সাম্প্রতিককালে অধ্যাপক তীর্থঙ্কর রায় তাঁর Traditional Industry in the Economy of Colonial India' (১৯৯৯) গ্রন্থে অধ্যাপক বাগচীর মতের বিরোধিতা করে বলেছেন যে উনিশ

শতকে অবক্ষয় ঘটেনি। আঠারো শতক সম্পর্কে বাংলাদেশী গবেষক হামিদা হোসেনের বক্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি দেখিয়েছেন এই শতকে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি কাপড়ের রপ্তানির ক্ষেত্রে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করার ফলে তাঁতীদের উপর অবর্ণনীয় নিষ্পেষণ চলে। তাঁর বই এর নাম হল : *The Company Weavers of Bengal : The East India Company and the Organisation of Textile production in Bengal 1750-1813*.

উনিশ শতকের প্রথম দিকের ভারতীয় ব্যবসায়ীদের উদ্যোগ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য বইটি লিখেছেন অধ্যাপক ব্লেয়ার ক্লিং (Blair B. Kling) বইটির নাম হল : *Partnership in Empire: Dwarknath Tagore and the Age of Enterprise in Eastern India*. আসিয়া সিদ্দিকের লেখা '*The Business World of Jamestjee Jeyebhoy*' প্রবন্ধটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। উনিশ শতকে ঔপনিবেশিক বন্দর নগরগুলিতে ব্যক্তিগত ইউরোপীয় ব্যবসায়িক উদ্যোগ সম্পর্কে লিখেছেন অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী তাঁর *Trade and Finance in the Bengal Presidency 1793-1833* গ্রন্থে। পরবর্তীকালের managing agency house গুলির কার্যকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন রাধেশ্যাম রুংতা, তাঁর *The Rise of Business Corporations in India 1851-1900* গ্রন্থে। কিন্তু ঔপনিবেশিক নগরগুলিতে দ্বারকানাথ ঠাকুর ও জামসেদজী জিজিভয় তার পদ্ধতি অনুসৃত ভারতীয় ব্যবসা পিছিয়ে পড়তে থাকে যখন ইউরোপীয় পুঁজি ধীরে ধীরে একচেটিয়া কর্তৃত্ব বিস্তার করে। কিন্তু C.A. Bayly কিছুটা ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁর বিখ্যাত *Rulers, Townsmen and Bazaars : North Indian Society in the Age of British Expansion 1770-1870* গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন যে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা ঔপনিবেশিক শাসনের সঙ্গে সমঝোতা করে আভ্যন্তরীণ বাজারগুলিতে ভালই ব্যবসা-বাণিজ্য করেছিল।

ভারতীয় অর্থনীতির উপর ঔপনিবেশিক প্রভাব সম্পর্কে অনেক ঐতিহাসিক আলোচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে অনেকের লেখা প্রকাশিত হয়েছে K.N. Chaudhuri and C.J. Dewey সম্পাদিত *Economy and Society* গ্রন্থে। এ প্রসঙ্গে C.J. Dewey and A.G. Hopkins সম্পাদিত *The Imperial Impact : studies in the Economic History of India and Africa* গ্রন্থে। এই সমস্ত প্রবন্ধগুলিতে বাজার, শিল্পনীতি ও কৃষিসমাজ সম্পর্কে অনেক নতুন সিদ্ধান্ত আলোচিত হয়েছে। আঞ্চলিক অর্থনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে দুখানি বিখ্যাত গ্রন্থ হল অধ্যাপক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ এর তিন খণ্ডে লেখা *The Economic History of Bengal* এবং C.J. Baker এর লেখা *An Indian Rural Economy : The Tamil Nadu countryside 1880-1950*.

ডঃ রজত রায় মনে করেন সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্যে সবচেয়ে বেশী ব্রিটিশ পুঁজির বিনিয়োগ ঘটেছিল 'railways and canals'-এ। কিন্তু তাঁর মত হল এই বিনিয়োগের ফলে উনিশ শতকে জার্মানী, রাশিয়া ও জাপানের মত ভারতে শিল্পের অগ্রগতি ঘটেনি তাছাড়া এর ফলে পরিবেশ ক্ষত্রিস্ত হয়েছিল এবং গ্রামাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। এই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন Daniel Thorner, তাঁর *Investment in Empire* গ্রন্থে এবং 'Great British and the Economic Development of India's Railways' নামক প্রবন্ধে। দুর্ভিক্ষ নিয়ে আলোচনা করেছেন Elizabeth Whitecomb এবং অধ্যাপক অমর্ত্য সেন। Whitecomb এর বই এর নাম হল : *Agrarian conditions in Northern India: the United Provinces under British Rule 1660-1900*. নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অমর্ত্য সেন তাঁর *Poverty and Famines : an Essay on Entitlement and Deprivation* গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে "famines could be because of adverse movements in prices and wages even when the food stocks were available."

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কিছু শিল্পায়ন ঘটলেও কোন শিল্পবিপ্লব ঘটেনি। শুধু তাই নয় ১৯৪৭ এর আগে বৃহদায়তন শিল্পের যথেষ্ট বিকাশ ঘটলেও ভারতীয় অর্থনীতিতে বিরাট কোন পরিবর্তন দেখা দেয়নি। কোনও 'take off' কেন হল না সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অমিয় কুমার বাগচী তাঁর *Private Investment in India 1900-1939* গ্রন্থে এবং অধ্যাপক রজত কান্ত রায় তাঁর *Industrialisation in India : Growth and Conflict in the Private Corporate Sector. 1914-1947* গ্রন্থে যুক্তি দেখিয়েছেন যে ঔপনিবেশিক নীতিই এজন্য দায়ী ছিল। অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক মরিস ডি মরিস যুক্তি দেখিয়েছেন যে ভারতীয় অর্থনৈতিক পরিকাঠামোয় কারিগরী অনগ্রসরতা বৃহদায়তন শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করেছিল। ঐতিহাসিক B.R. Tomlinson মনে করেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সরকারী নীতির জন্য ভারতীয় শিল্পের বিকাশ ঘটেনি। ডঃ রজত কান্ত রায় মন্তব্য করেছেন, "By then, there was a large Indian capitalist class locked in a struggle with European capital in India". এই অভ্যন্তরীণ বিবাদ ও অস্থিরতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন Claude Markovitz. তাঁর *Indian Business and Nationalist Politics 1931-1939* গ্রন্থে।

বলা যেতে পারে যখন থেকে দাদাভাই নওরোজী, আর, সি. দত্ত, উইলিয়াম ডিগ্‌বী প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তির সরকারের অর্থনৈতিক নীতির কঠোর সমালোচনা করে লিখতে শুরু করেন, তখন থেকেই সম্ভবত প্রকৃতপক্ষে ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সূচনা হয়েছিল। D.R. Gadgil, Vera Anstey এবং D.H.Buchanan এঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ঔপনিবেশিক যুগের অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনা করেছেন। যদুনাথ সরকার ও মোরল্যাণ্ড মুঘল অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। স্বাধীনতা উত্তর যুগে অর্থনৈতিক ইতিহাস একটি প্রতিষ্ঠিত বিষয় হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।

প্রশ্ন

- ১। তুমি কি মনে কর ব্রিটিশ শাসন ভারতীয় অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করেছিল?
- ২। অবশিল্পায়ন বিতর্ক কি?

১.৫.১৩.২ : কৃষক ও শ্রমিকদের ইতিহাস (History of the Peasants and Workers)

বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় রাজনীতিতে বামপন্থী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কৃষক ও শ্রমিকদের ভূমিকা ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় সমাজে শ্রেণী সম্পর্কের কথা এসে পড়ে। বিশেষ করে কৃষক-জমিদার সম্পর্ক এবং শ্রমিক মালিক সম্পর্ক। এর আগের ইতিহাস চর্চায় শিল্প সম্পর্কে অনেক কিছুই লেখা হয়েছে। কিন্তু 'র্যাডিকাল' গতিধারা অন্যরকম। ডঃ রজত রায় লিখেছেন, 'The aim of radical historiography, however, was to treat the peasants and workers as historical subjects in their own right'. বোঝা গেল যে, কৃষক ও শ্রমিকদের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করতে হলে তাদের সঙ্গে উচ্চতর শ্রেণীর সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা প্রয়োজন। এই উপলক্ষের পর নতুন শ্রমিক ঐতিহাসিকরা শ্রমিক ও পুঁজি এই দুই বিষয়বস্তুকে নিয়ে একই আলোচনার উপর গুরুত্ব দিতে

থাকেন। একইভাবে এই সিদ্ধান্তে আসা গেল যে, ইতিহাস রচনা করতে হলে সামগ্রিকভাবে কৃষিসমাজের সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতেই তা করতে হবে। কৃষক ও শ্রমিকদের সম্পর্কে বামপন্থী ইতিহাসচর্চা প্রধানতঃ স্বাধীনতা লাভের পরে শুরু হয়েছে। প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসাবে দুজন মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীর নাম করা যেতে পারে। একজন হলেন ডঃ এ. আর. দেশাই। আর অন্যজন ডঃ সুনীলকুমার সেন। ডঃ দেশাই এর বইটির নাম হল *Peasant Struggles in India* (১৯৭৯)। ডঃ সেনের বই দুখানির নাম হল : *Agrarian Struggle in Bengal, 1946-47* এবং *Working Class Movements in India 1885-1975*। আর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ হল মার্কসবাদী ব্যাখ্যায় রচিত সুকোমল সেনের *Working Class of India : History of Emergence and Movement 1830-1970*।

তবে এটা ভাবলে ভুল করা হবে যে কৃষক ও শ্রমিকদের বিষয়টি একেবারেই নতুন ভাবনা। এটাও ঠিক নয় যে, সমাজতন্ত্রের উত্থানের আগে এই বিষয় দুটি নিয়ে কোন আগ্রহ ছিল না। অনেক আগেই ১৮৭৪ সালে গরীবদের অবস্থা সম্পর্কে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে-র ইংরাজীতে লেখা দুখণ্ডের উপন্যাস *Govinda Samanta* প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৭৮ সালে এর নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বইটির নতুন নাম হল *Bengal Peasant Life*। বইটিতে উনিশ শতকে বাংলার কৃষক সম্প্রদায় সম্পর্কে অনেক তথ্য সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। এছাড়া ১৮৭৪ সালে ব্রাহ্ম সমাজ সংস্কারক শশীপদ ব্যানার্জীর সম্পাদনায় প্রকাশিত বিখ্যাত পত্রিকা ‘ভারত শ্রমজীবী’-র কথা অবশ্যই উল্লেখ করা যায়। এই পত্রিকাতেও শ্রমিকদের সম্পর্কে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়।

ইচ্ছা করলে আঠারো শতকেও ফিরে যাওয়া যায়। সে সময় ইংরাজী ও পার্সী ভাষায় কৃষি ও কৃষকদের সম্পর্কে কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রবীণ কর্মচারী এইচ.টি. কোলব্রুক লিখেছিলেন, *Remarks on the Husbandry and Internal Commerce of Bengal in 1794*। বইটির নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮০৪ সালে। সাম্প্রতিককালে ঐতিহাসিকরা একটি পার্সিয়ান পাণ্ডুলিপির খোঁজ পেয়েছেন। বইটির লেখক শেষ মুঘল পর্বের একজন বাঙালী। বইটির নাম *Risala-i Zirat (Treaties on Agriculture)*। বইটি লেখা হয়েছিল ১৭৮৫ সালে। বইটিতে চাষীদের চারভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। বৃটিশ কর্তৃপক্ষের ভূমি রাজস্বের উপর অত্যধিক নির্ভরতার ফলে ঔপনিবেশিক প্রশাসন চাষীদের সম্পর্কে আগ্রহান্বিত ছিল এবং তাদের সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। কিন্তু কৃষি শ্রমিকদের ক্ষেত্রে তাদের কোন আগ্রহ ছিল না কারণ তারা কোন জমির খাজনা দিত না।

B.H. Baden Powell তাঁর *Manual of Land Revenue system and Land Tenures of India* (১৮৮২) বইতে চাষী ও জমিদারদের সম্পর্কে আলোচনা করেন। বইটির পরবর্তী কালে *Land Systems of British India* নামে তিনখণ্ডে প্রকাশিত হয়। W.H. Moreland নামে আর একজন ব্রিটিশ অফিসার দুখানি গুরুত্বপূর্ণ বই লেখেন। বই দুটির নাম হল : *Notes on the Agricultural Conditions and problems of the United Provinces, Revised upto 1911* এবং *Agrarian System of Moslem India*।

ব্যাডেন পাওয়েল এবং মোরল্যাণ্ডের রচনা থেকে বোঝা যায় যে শুধু ঔপনিবেশিক পর্বেরই নয়, প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগেও রাষ্ট্র ও জমিদার কৃষকদের উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করত। চাষীদের ঋণগ্রস্ততা সম্পর্কে Malcom Darling এর লেখা *The Punjab peasant in Prosperity and Debt* গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক

প্রশাসনও সরকারী উদ্যোগে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছেন ও বই প্রকাশ করেছেন। William Honey-এর লেখা *A Monograph on Trade and Manufactures in Northern India* গ্রন্থটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বৃহদায়তন-শিল্পের উত্থানের ফলে দুটি নতুন 'সামাজিক শক্তি' আত্মপ্রকাশ করে—শ্রমিক এবং পুঁজি। ঔপনিবেশিক যুগে এ সম্পর্কে বিখ্যাত বইগুলি হল : S.M. Rutnagar এর লেখা *Bombay Industries : The Cotton Mills* এবং D.H. Buchanan-এর লেখা *The Development of Capitalist in India*. এটা বোঝায় যে ঔপনিবেশিক শাসনের শেষের দিকে কৃষকদের পাশাপাশি শ্রমিকরা ও দেশের অর্থনৈতিক জীবনে নিজেদের স্থান করে নিয়েছিল।

বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ও ঐতিহাসিকরা কৃষক ও শ্রমিকদের ইতিহাস চর্চায় নতুন 'কাঠামো' উপস্থাপিত করেন। তাঁরা শ্রমজীবী শ্রেণীকে শ্রেণী সংগ্রামের অগ্রদূত হিসাবে চিহ্নিত করেন এবং ভারতীয় সমাজে তাদের প্রগতিশীল রাজনৈতিক শক্তি বলে মনে করেন। যেহেতু ভারতের এক বিপুল জনসংখ্যা কৃষির উপর নির্ভরশীল, সেজন্য বামপন্থী ঐতিহাসিকরা কৃষক সমাজের উপর গুরুত্ব দিতে থাকেন। ঔপনিবেশিক যুগে কৃষি সমাজের পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনার জন্য তাঁরা নতুন 'কাঠামো' তৈরি করেন। স্বাধীনতা লাভের পরই ১৯৫২ সালে প্রকাশিত S.J. Patel-এর লেখা *Agricultural Workers in Modern India and Pakistan* গ্রন্থটিকে এই 'কাঠামো' রচনার প্রথম প্রয়াস হিসাবে গণ্য করা যায়। এ সম্পর্কিত আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বই হল : রামকৃষ্ণ মুখার্জির *The Dynamics of a Rural Society* (১৯৫৭)। এঁদের বক্তব্য অনুযায়ী ঔপনিবেশিক যুগে কৃষিসমাজে কতগুলি বাজারের সৃষ্টি, চাষীদের ঋণগস্ততা, চাষীদের অবলুপ্তি, ভূমিহীন কৃষকদের উদ্ভব এবং স্বনির্ভর চাষীদের গ্রামীণ সম্প্রদায়ের ভাঙন ইত্যাদি।

পরবর্তীকালের গবেষণায় দেখা যায় এই সব ধারণার অনেকগুলিই তথ্যসম্মত নয়। সংশোধন শুরু হয় ধর্ম কুমারের *Land and Caste in South India. Agricultural Labour in Madras Presidency during the Nineteenth Century (1965)* গ্রন্থটির মাধ্যমে। প্রচুর তথ্য উপস্থাপিত করে তিনি দেখালেন যে "Pre-colonial and early colonial already Possessed a vast agrarian under-class of bonded labourers who traditionally belonged to the untouchable castes." রজত ও রত্না রায় দেখিয়েছিলেন ঔপনিবেশিক শাসনের গোড়ার দিকে একদল ধনী চাষী তাদের জমি চাষ করাতো ভাগচাষী ও 'bonded labourer' দের মাধ্যমে।

মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের ধনী ও গরীব চাষীর মধ্যে বিভাজনের তত্ত্ব চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। Eric Stokes বললেন, "there was no agrarian polarisation," এই জটিল প্রশ্নটিকে ঘিরে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিভাজন দেখা দেয়। নীল চার্লসওয়ার্থ দেখালেন যে ঔপনিবেশিক ভারতে কৃষির বাণিজ্যিকরণের ফলে অনেক চাষীর আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটে। অন্যদিকে ডঃ সুগত বসুর সিদ্ধান্ত হল যে "Rich farmers were to be seen only among reclaimers of land in a few frontier areas." সম্প্রতি Nariaki Nukazato অধ্যাপক বিনয়ভূষণ চৌধুরীর বক্তব্যকেই সমর্থন করেছেন। অধ্যাপক চৌধুরীর মতে, "The growing number of share-croppers among the peasants indicated an incipient process of depeasantisation even while outwardly the small-holding system appeared to be intact". অনেক ঐতিহাসিক এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজনের ক্ষেত্রে শ্রেণীই একমাত্র নির্ণায়ক ছিল না। M.C Pradhan, David Polock এবং Stephen F.

Dale দেখিয়েছেন যে "caste and community were capable of producing important rural solidarities among members setting them apart from other peasants."

ঐতিহাসিক মোরল্যাণ্ড গ্রামীণ মানুষদের জীবনে রাষ্ট্রের ভূমিকার যে বিষয়সূচী তৈরী করে দিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে আলিগড়ের মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরা সেই পথ অনুসরণ করেন। তাঁরা প্রাক-ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিক যুগের কৃষিজীবন ও রাষ্ট্রীয় গঠনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। ১৯৬০ এর দশকে আলিগড়ের বিখ্যাত মার্কসবাদী ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব দেখিয়েছিলেন "The overwhelming presence of the Mughal state in the life of the heavily taxed peasantry." তিনি ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের কয়েকটি কৃষক বিদ্রোহের বর্ণনা দেন। জাপানী ঐতিহাসিক Hisorhi Fukazawa একদিকে রাষ্ট্র এবং অন্যদিকে গ্রাম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। মার্কিন ঐতিহাসিক স্টেইন বলেছেন যে "The state, rooted in the life of the peasant community, had a weaker and more segmented character ". আর একজন মার্কিন ঐতিহাসিক David Ludden দক্ষিণ ভারতের তিরুনেলভেলী জেলায় স্থানীয় শাসক ও গ্রামবাসীদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এর ফলে কৃষকদের ইতিহাস মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের কৃষক আন্দোলনের স্তর অতিক্রম করে এক বিস্তৃততর আঙ্গিকে প্রবেশ

এভাবে একদল অ-মার্কসবাদী ঐতিহাসিক কৃষক সংগ্রামের ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। এঁরা কৃষক বিদ্রোহ আলোচনায় 'sophisticated new variety' নিয়ে আসেন। এই ঐতিহাসিকদের পথপ্রদর্শক হলেন Eric Stokes তিনি কৃষকদের অবস্থা ও কৃষকআন্দোলন সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে জাতি, বাজার, ট্যাক্সের চাপ, এবং তরাওঅন্যান্য বিষয়ের অবতারণা করেছেন। তাঁর প্রবন্ধগুলি একত্রে সংকলিত করে একটি বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে। বইটির নাম *The Peasant and the Raj : Studies in Agrarian Society and Peasant Rebellion in Colonial India (1978)*. বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ D.N Dhanagare এর লেখা *Peasant Movements in India (1983)* বইটিতেও প্রচলিত মার্কসবাদী বক্তব্য থেকে বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়। তিনি দেখিয়েছেন, "Peasant actions were typically circumscribed by the locality, based in caste of communal ties."

ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের পুরানো বামপন্থী ইতিহাসে ভারতীয় শ্রমিকদের সামাজিক কাঠামো ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ইউরোপীয় শ্রমিকদের কোন পার্থক্য দেখানো হয়নি। কিন্তু পরবর্তী কালের ঐতিহাসিকরা শ্রমিকদের বিপ্লবী ক্ষমতা ও সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অভাব লক্ষ্য করেছেন। নতুন শ্রমিক ঐতিহাসিকরা মনে করেন শিল্প শ্রমিকদের মানসিকতা ও চেতনা গরীব ঠিকা শ্রমিকদের থেকে আলাদা ছিল না। এই ধরনের সংশোধিত শ্রমিক ইতিহাসের অন্যতম প্রবক্তা হলেন মরিস ডি মরিস, আর .কে. নিউম্যান, সুজাতা প্যাটেল প্রমুখ ঐতিহাসিকরা মরিস ডি মরিস-এর বইটির নাম হল : *The Emergence of an Industrial Labour Force in India : A study of the Bombay Cotton Mills 1845-1947*. নিউম্যান-এর বই এর নাম হল : *Workers and Unions in Bombay 1919-29: A study of Organisation in the Cotton Mills*. সুজাতা প্যাটেল এর বই-এর নাম হল : *The Making of Industrial Relations, The Ahmedabad Textile Industry 1918-1939*. অধ্যাপক দীপেশ চক্রবর্তী তাঁর *Rethinking Working Class History: Bengal 1890-1940* গ্রন্থে নিম্নবর্ণীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পাটকল শ্রমিকদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। অধ্যাপক চক্রবর্তী মনে করেন, "The hierarchical precapitalist

culture of the workers made them prone to communal violence and inclined them to dependence on the 'Sardars' who recruited them". রাজনারায়ন চন্দ্রভারকরও দেখিয়েছেন যে শ্রমিকরা স্থানীয় দাদাদের উপর নির্ভরশীল ছিল। তারা সম্প্রদায়গত ভাবে সংঘবদ্ধ ছিল। Sir Henry Maine এবং Kapil Khmar শ্রমিক ইতিহাস লিখতে গিয়ে ভারতীয় সমাজকে 'status and community'-র ভিত্তিতে আলোচনা করেছেন। ডঃ রজত রায় মন্তব্য করেছেন, "The long term effect of colonial rule was to bring the classes into play in a new national area."

প্রশ্ন

- ১। কোন সময় থেকে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণী স্থান পেয়েছে?
- ২। শ্রমিক ও কৃষকদের ইতিহাসটা কিভাবে ভারতের ইতিহাসে স্থান পেয়েছে?

১.৫.১৩.৩ : সূচনা—শ্রমিকদের নিয়ে ইতিহাসচর্চা

একটি নতুন আর্থ-সামাজিক শ্রেণী হিসাবে শিল্পে নিযুক্ত বেতনভোগী শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব ভারতবর্ষে উনিশ শতকের শেষপাদে হয়েছিল। শ্রমিক শ্রেণী, তাদের অবস্থা ও আন্দোলন নিয়ে সমাজবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকদের আগ্রহ এরপর আস্তে আস্তে দেখা যায়। ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীকে নিয়ে ইতিহাসচর্চার সূচনা হয়েছিল মাত্র গত শতাব্দীতে। অথচ ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবের পর থেকেই শ্রমিক শ্রেণীকে কেন্দ্র করে ইতিহাসচর্চা জোরকদমে চলেছিল। ইউরোপের অন্যান্য দেশেও এই ইতিহাসচর্চা থেমে থাকেনি। বরং ভারতে বিশ শতকের শেষ দু-তিন দশকের কথা বাদ দিলে এই ইতিহাসচর্চার গতি ছিল বেশ মস্তুর। কিন্তু বিগত দু-দশকে এই ক্ষেত্রে বহু গবেষণা হয়েছে, গ্রন্থ বেরিয়েছে, প্রবন্ধ সংকলন হয়েছে, ইংরেজী ভাষায় রচিত আন্তর্জাতিক মানের পত্র-পত্রিকা থেকে শুরু করে, ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের একাডেমিক পত্রিকায়, এমনকি লিটল ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠাতেও বহু মূল্যবান নিবন্ধ, স্মৃতিচারণ ছড়িয়ে রয়েছে। ভারতবর্ষের শ্রমিক শ্রেণীকে নিয়ে ইতিহাসচর্চা এখন শুধু ইতিহাসের ছাত্র ও গবেষকদের কাছেই একটি অতি পরিচিত বিষয়বস্তু নয়, এমনকী সাধারণ মানুষ ও অন্যান্য বিষয়ের পণ্ডিতদের কাছেও এ বিষয়টি একটি পরিচিত বিষয় শুধু নয়, যথেষ্ট কৌতূহল ও উৎসাহও সৃষ্টি করেছে সকলের মধ্যে।

ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবের পর থেকেই শ্রমিক ইতিহাসচর্চা জোর কদমে চললেও ভারতীয় শ্রমিক নিয়ে ইতিহাস চর্চার সূচনা হয়েছিল মাত্র গত শতাব্দীতে। বিগত দু দশকে এই শ্রমিক ইতিহাস চর্চা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে শুরু করে প্রবন্ধ এমনকি ম্যাগাজিনেও স্থান পেয়েছে। তাই ভারতবর্ষের শ্রমিক শ্রেণীকে নিয়ে ইতিহাসচর্চা এখন শুধু ইতিহাসের ছাত্র ও গবেষকদের কাছেই পরিচিত বিষয়বস্তু নয়। এমনকি সাধারণ মানুষও অন্যান্য বিষয়ের পণ্ডিতদের কাছেও বিষয়টি যথেষ্ট কৌতূহল ও উৎসাহ সৃষ্টি করেছে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়াধে বাংলা, বিহার, বোম্বাই (অধুনা মুম্বাই), আমেদাবাদ, কানপুর দক্ষিণ ভারতের প্রধান শরহগুলিতে নতুন নতুন কলকারখানা, পাটশিল্প, সূতীবস্ত্রশিল্প, কয়লাখনি, বাগিচা. রেল ও ট্রামের মত আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থা চালু হবার পর শিল্প শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। পূর্বতন কারিগর শ্রেণী, বা হস্তশিল্প, কুটির শিল্প ও অন্যান্য গ্রামীণ শিল্পের শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে এই আধুনিক শিল্পের মজুরিভোগী শ্রমিকদের পার্থক্য ছিল এবং তা এখন নানা লেখায় পরিষ্কার। প্রধানতঃ বিদেশি পুঁজির লগ্নিতেই ভারতের শিল্পায়নের

সূত্রপাত, যদিও কিছু পরেই দেশীয় পুঁজিপতিদেরও আবির্ভাব। যে যুগে দেশের মানুষ বিদেশি ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে, সেই সময়েই শ্রমিককে লড়তে হয়েছে যুগপৎ বিদেশি সরকার ও দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে। ভারতে শিল্পায়নের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নতুন উৎপাদন ব্যবস্থা, মালিক-শ্রমিক উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে উঠল। নতুন সামাজিক শ্রেণী হিসাবে তাদের জন্মের পর ঔপনিবেশিক যুগেই তাদের নিয়ে নানা স্তিভাবনা ও সেই চিন্তাভাবনারফসল হিসাবে ইতিহাস রচনা শুরু হল।

প্রশ্ন

- ১। ভারতবর্ষে শ্রমিক শ্রেণীকে নিয়ে ইতিহাসচর্চার সূচনা কখন থেকে শুরু হয়?
- ২। কিসের ভিত্তিতে ভারতে শিল্পায়নের সূত্রপাত ঘটে?

১.৫.১৩.৪ : শ্রমিক ইতিহাসচর্চার ধারা (Trend of Labour Historiography)

তবে ঔপনিবেশিক যুগে শ্রমিকদের নিয়ে ইতিহাসচর্চা শৈশব অবস্থায় ছিল বলা যেতে পারে। আজ থেকে দু-দশক পূর্বেও ‘তলা থেকে ইতিহাস’ (History from below) রচনার সম্ভাবনাগুলি একেবারেই খতিয়ে দেখা হয়নি। বরং সে সময়কার ইতিহাস ছিল ‘এলিটিস্ট’ মনোভাবাপন্ন। এ ধরনের ইতিহাসে কায়িকশ্রমে নিযুক্ত সাধারণ শ্রমিকের প্রকৃত চিত্র ধরা পড়েনি।

একথা সত্যি যে, ইংরেজ তথা পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের ‘নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা’ বা ‘নিপীড়িতদের ইতিহাসচর্চা’ হিসেবে শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাসচর্চার ধারা ভারতবর্ষ ও তৃতীয় বিশ্বের দরজায় প্রবেশ করার ফলেই এদেশে শ্রমিক ইতিহাসচর্চার সূত্রপাত হয়েছিল। এই দেশের শ্রমিক ইতিহাসচর্চার তাই হিলটন, হিল, এ.এল. মর্টন, ই. পি.টমসন, হবস্বম, গ্রামশিচ প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত ইতিহাসবিদদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণে ঋণী। তাঁরা শুধু নিম্নবর্গ তথা শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রকে প্রসারিতই করেননি, উত্তরোত্তর এর শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। এইসঙ্গে সামাজিক অচ্ছুৎদের ঐতিহাসিক মর্যাদা দেওয়ার প্রয়োজন আছে তা যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

এরই সূত্র ধরে ১৯২০ এর দশক থেকে শ্রমিকদের নিয়ে ভারতে ইতিহাসচর্চার সূত্রপাত হয়েছে ধরা যেতে পারে। যদিও ভারত ইতিহাসের মূল ধারার সঙ্গে দীর্ঘকাল তা আদৌ অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে শ্রমিকদের একটি আলাদা অর্থনৈতিক শ্রেণী হিসাবে গণ্য করে মূলতঃ তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা, কাজের পরিবেশ, খাদ্য, বাসস্থান ও অন্যান্য সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও ইতিহাস লেখার কাজ শুরু হয়। ইতিহাসচর্চার এই ধারায় উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিকগণ হলেন— রজনীকান্ত দাস (১৯২৩), কেলম্যান (১৯২৩), ব্রাউটন (১৯২৪), চমনলাল (১৯৩২), বি.শিবারাও (১৯৩৯), আর.কে মুখার্জী (১৯৫১), কে.পি.চট্টোপাধ্যায় (১৯৫২) ইত্যাদি। যেহেতু বাংলা ও বোম্বাই ছিল তদনীন্তন কালে শিল্পায়নত অঞ্চলগুলির একেবারে উপরে তাই সর্বভারতীয় আলোচনাতে এই দুই অঞ্চলের শ্রমিকদের নানা কথা বার বার উচ্চারিত হয়েছে। শ্রমিকদের আন্দোলন নিয়েও ইতিহাসচর্চার সূত্রপাত সেই বিশেষ দশক থেকেই। কারণ ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, সংক্ষেপে AITUC গড়ে উঠেছে। এর পূর্বে মাদ্রাজে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে Textile Labour Union গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন কলকারখানা, চটকল, বস্ত্রকল ও আরও নানা প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন একের পর এক

গড়ে উঠতে লাগল। বামপন্থী শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ভারতবর্ষের বিভিন্ন শ্রমিক প্রতিষ্ঠানে গড়ে উঠল। কম্যুনিস্টরা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে শুরু করলেন। কংগ্রেস নেতাদের মধ্যেও অনেকে শ্রমিক আন্দোলনের ব্যাপারে এগিয়ে এলেন। এর ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯২০ পর পরবর্তী প্রায় ৫০ বছর ধরে শ্রমিক

উপনিবেশিকযুগে এমনকি আজ থেকে দু-দশক পূর্বেও ভারতে শ্রমিক ইতিহাসচর্চা শৈশব অবস্থায় ছিল। কারণ সে সময়কার ইতিহাস ছিল 'এলিটিস্ট' মনোভাবাপন্ন, সেখানে নিম্নবর্গের মানুষদের কোন ভূমিকা ছিল না। কিন্তু ১৯২০-এর দশক থেকে হিলটন, হিল, টমসন, হবস্বম, গ্রামস্চি, রজনী পামদত্ত প্রমুখের হাত ধরে ভারতে এক নতুন ধরনের ইতিহাস চর্চার সূত্রপাত হয় যেখানে কায়িকশ্রমে নিযুক্ত অর্থাৎ নিম্নবর্গ বা নিপীড়িতদের গুরুত্ব দেওয়া হয়। আবার ১৯৭০-এর দশক থেকে শ্রমিক ইতিহাস চর্চা সারা ভারতের কথা না বলে নির্দিষ্ট অঞ্চলের নির্দিষ্ট শিল্পের শ্রমিক নিয়ে আলোচনা করেন।

ইতিহাসচর্চার ধারা এগিয়ে চলল। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে কালানুক্রমিক ধারায় প্রধান প্রধান ধর্মঘটের কথা ও আনুষ্ঠানিক ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলির কার্যকলাপ ও দাবি দাওয়ার কথা নিয়ে ঐতিহাসিক কর্ণিক (১৯৬৭), রজনীকান্ত দাস (১৯২৩) ও আরও কেউ কেউ ইতিহাস লিখলেন। শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক ভূমিকা ও আন্দোলনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করলেন মার্কসবাদ ঐতিহাসিকেরা। এর পথিকৃত নিঃসন্দেহে রজনী পামদত্ত (ইণ্ডিয়াটুডে, ১৯৪০)। পরবর্তীকালে মার্কসবাদী লেখকরা এই ধারা তো বজায় রাখলেনই, সেইসঙ্গে এই ধারার আলোচনার ক্ষেত্রে অনেক নতুন বিষয় সংযোজিত করলেন। অনেক মার্কসবাদী ঐতিহাসিক ডগম্যাটিক সংকীর্ণতার গণ্ডি ছাড়িয়ে প্রাক-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা উত্তরকালের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে নানা নতুন নতুন দিকের উন্মোচন ঘটালেন। ডগম্যাটিক সংকীর্ণতার গণ্ডি ছাড়িয়ে শ্রমিক ইতিহাসকে নতুন আলোকে বিচার করবার চেষ্টা শুরু করলেন।

১৯৭০-এর দশক থেকে শ্রমিকদের নিয়ে ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে একের পর এক নতুন ধারা আসতে থাকল। তার মধ্যে প্রধান ধারা হল এক সঙ্গে সারা ভারতের কথা না বলে নির্দিষ্ট অঞ্চলের নির্দিষ্ট শিল্পের শ্রমিক নিয়ে গবেষণা— যেমন বোম্বাই, আমেদাবাদ, কানপুর বা কোয়েম্বটুরের সুতাকল বা জামশেদপুরের ইস্পাত কারখানার শ্রমিক। শুধু প্রদেশভিত্তিক ইতিহাসই নয়, বিশেষীকরণ আরও এগিয়ে চলল যখন গবেষক-ঐতিহাসিকেরা এক-একটি সংক্ষিপ্ত পর্বের (Phase) উপর তাদের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করতে লাগলেন।

সময়ের পর্বভিত্তিক গবেষণা ছাড়াও, একটি মাত্র নির্দিষ্ট শিল্প বা তৃণমূল স্তরের একটি মাত্র অঞ্চলের শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক ইতিহাসচর্চার বিষয় হিসেবেপ এসে দেল। সবচেয়ে বেশী কাজ হয়েছে চটশিল্পের উপর। চা- বাগিচা শিল্প নিয়েও চটশিল্পের শ্রমিকদের নিয়ে নানা দিক দিয়ে আলোচনায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন— রণজিৎ দাশগুপ্ত, দীপেশ চক্রবর্তী নির্বাণ বসু, পরিমল ঘোষ, অর্জন দি হান, শুভ বসু, অমল দাস ও আরও অনেকে।

বোম্বে, আমেদাবাদ, কানপুরের সুতাকল শ্রমিকদের নিয়েও এখন পর্যন্ত বেশ ভাল ইতিহাসচর্চা রয়েছে ও হচ্ছে। এক্ষেত্রে মরিস.ডি মরিস. চার্লস মায়ার্স, আর, কে. নিউম্যান, সব্যসাচী ভট্টাচার্য, রাজনারায়ণ চন্দ্রভারকার, চিত্রা যোশী প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। জামশেদপুরের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের শ্রমিকদের নিয়েও সময়ের পর্বভিত্তিক আলোচনা ও বিশেষীকরণ বেশ ভালভাবেই শুরু হয়েছে।

নারী শ্রমিকদের নিয়ে আলাদাভাবে অনুসন্ধান চলেছে। মহিলা শ্রমিক নেত্রীদের ভূমিকা নিয়ে গবেষণা করেছেন মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়। সাধারণ নারী শ্রমিকদের জীবন ও দাবি দাওয়া নিয়ে নানান দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা

ও ইতিহাসচর্চা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য হলেন— সুনীল সেন, শমিতা সেন, নির্মালা ব্যানার্জী, এগেলস ডাগমার ও আরও কেউ কেউ। সামাজিক শ্রেণী হিসাবে শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব নিয়েও ঐতিহাসিকেরা আলোচনা করেছেন। শ্রমিকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার সমস্যাটিও ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি এড়ায়নি। শ্রমিকদের সাম্প্রদায়িকতা চেতনা নিয়ে লিখেছেন দীপেশ চক্রবর্তী। অবশ্য এর বিপরীত মতও পাওয়া গেছে অন্য শ্রমিক ইতিহাসচর্চায়।

রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসচর্চার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল জাতীয় আন্দোলনের বিশাল প্রেক্ষাপটে বামপন্থী শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের অনুকূল-প্রতিকূল সম্পর্ক নিয়ে বিস্তৃত গবেষণা। এ ব্যাপারে সবচেয়ে উদ্বদান রেখেছেন গৌতম চট্টোপাধ্যায়। শ্রমিক আন্দোলন নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনাও কিছু কিছু হয়েছে। বিশিষ্ট শ্রমিক নেতাদের জীবনীমূলক আলোচনা ও তাদের মূল্যায়ন নিয়েও ইতিহাস লেখা হয়েছে। জীবনীমূলক অভিধান রচনা করেছেন পঞ্চগনন সাহা।

তবে সংগঠিত শিল্প শ্রমিকদের নিয়ে যা বড় বড় শিল্পগুলি সম্পর্কে ইতিহাসচর্চার অগ্রগতি হলেও মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের শ্রমিকও অসংগঠিত নানা শিল্পের শ্রমিকদের নিয়ে ইতিহাসচর্চা তুলনামূলকভাবে কম। তবে সুখের বিষয়, এই অভাববোধ শ্রমিক ইতিহাসচর্চাকারীদের মধ্যে অধুনা এসেছে এবং কেউ কেউ এ কাজে এগিয়ে এসেছেন। আরও একটা কথা বলা প্রয়োজন। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের নানা শিল্পের শ্রমিকদের তুলনায় স্বাধীনতা উত্তরকালে নানা শিল্পের শ্রমিকদের নানা সমস্যা-আন্দোলন নিয়ে ইতিহাসচর্চা অপেক্ষাকৃত কম বললেই চলে। অবশ্য সাম্প্রতিককালের শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে কিছু কিছু ইতিহাসচর্চা হয়েছে। নয়া অর্থনীতির ফলস্বরূপ রিট্রেক্টমেন্ট ও নয়া প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা ও লেখা হয়েছে।

প্রশ্ন

১। কয়েকজন নিম্নবর্ণীয় ইতিহাসবিদদের নাম লেখ?

২। ভারতে শ্রমিক ইতিহাসচর্চা কোন কোন বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন?

১.৫.১৩.৫ : উপসংহার (Conclusion)

উপরের আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তের আসা যায় যে ভারতের শ্রমিকদের নিয়ে ইতিহাসচর্চা এখন মোটেই পিছিয়ে নেই। ভারত-ইতিহাসে আর্থ-সামাজিক বিষয় হিসেবে শ্রমিকদের ইতিহাস নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বহু বিচিত্র পথে এই গবেষণা ও ইতিহাসচর্চার ধারা এখন এগিয়ে চলেছে।

১.৫.১৩.৬ : সহায়ক গ্রন্থ (References Books)

1. Sanjay Subrahmanyam (ed) : Money and Market in India;1100-1700.
2. Sugata Bose : Peasant Labour and Colonial Capital : Rural Bengal since 1770.
3. Sumit Guha : The Agrarian Economy of the Bombay-Deccan,1881-1941.

4. R.S. Rungta : The Rise of Business Corporations in India, 1851-1900.
5. R.K.Ray (ed) : Entrepreneurship and Industry in India 1800-1947.
6. T. Roy : Traditional Industry in the Economy of Colonial India.
7. Burton Stein and Sanjay Subrahmanyam (ed) : Institutions and Economic change in South Asia.
8. Dwijendra Tripathi (ed) : Business Communities of India.
9. A.K. Banerjee : Aspects of Indo-British Economic Relations, 1858-98.
10. Ranajit Guha : Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India.
11. Narahari Kabiraj : A Peasant Uprising in Bengal.
12. Narahari Kabiraj : Wahabi and Farazi Rebels of Bengal,
13. Blair B. Kling : The Blue Mutiny : The Indigo Disturbances in Bengal 1859-1862.
14. Majid Siddiqui : Agrarian Unrest in Northern India : The United Provinces 1918-32.
15. E.D. Murphy : Unions in Conflict : A Comparative Study of four South Indian Textile Centres, 1918-1939.
16. Samita Sen : Women and Labour in Late Colonial India : the Bengal Jute Industry.
17. H.J Mc Closkey : Ecological Ethics and Politics.
18. D.E. Worster : Nature's Economy : The Roots of Ecology.
18. William Tucker : Progress and Privilege: America in the Age of Environmentalism.
19. বিনয়ভূষণ রায় : উনিশ শতকে বাংলার বিজ্ঞান সাধনা।
20. C.A. Bentley : Malaria and Agriculture in Bengal.
21. Pandita Ramabai : The High Caste Hindu Woman.
22. B.C. Law : Women in Buddhist Literature.
23. Bharati Ray (ed) : From the Seams of History : Essays on Indian Women.
24. Usha Chakraborty : Condition of Bengali Women around the second half of the Nineteenth century.
25. অমল দাশ : ইতিহাস—অনুসন্ধান (১৫)—সম্পাদনা গৌতম চট্টোপাধ্যায়—সাম্প্রতিককালে ভারতে শ্রমিক ইতিহাসচর্চা।
26. নির্বাণ বাসু (সম্পাদনা) : বাংলার শ্রমিকচর্চা সংক্রান্ত রচনাপঞ্জী।
27. সুমিত সরকার : আধুনিক ভারত।
28. সব্যসাচী ভট্টাচার্য : ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস. আধুনিক ভারত ইতিহাস, সভাপতির ভাষণ, ১৯৮২।

১.৫.১৩.৭ : নমুনা প্রশ্ন (Model Questions)

1. Discuss the views of various authors on the economic history of Colonial India.
 2. What are the differences between colonialist and nationalist works on Indian economic history?
 3. How did the peasant and working class histories begin?
 4. Discuss the history related to peasants and working class before independence.
 5. Give an account of the history of Peasant and working class after independence.
 6. Discuss the historical works related to gender.
 7. ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক ইতিহাসে শ্রমিক ইতিহাসে শ্রমিক ইতিহাসচর্চার উদ্ভবের প্রেক্ষাপট আলোচনা কর।
 8. ভারতের ইতিহাসে শ্রমিক ইতিহাসচর্চার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব আলোচনা কর।
 9. শ্রমিক ইতিহাসচর্চা প্রাক স্বাধীনতা যুগে কতটা প্রসারলাভ করেছিল? এই ইতিহাসচর্চার প্রকৃতি কী ছিল?
 10. সাম্প্রতিককালে শ্রমিক ইতিহাসচর্চার অগ্রগতি আলোচনা কর।
 11. শ্রমিক ইতিহাসচর্চার সীমাবদ্ধতা কী?
-

একক-১৪

Religion, Culture, Environment and Science and Technology

বিন্যাস ক্রম :

- ১.৫.১৪.০ : উদ্দেশ্য (objective)
- ১.৫.১৪.১ : পরিবেশ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (Environment, Science And Technology)
- ১.৫.১৪.২ : নারী-ইতিহাস (Women History)
- ১.৫.১৪.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী (Suggested Readings)
- ১.৫.১৪.৪ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Assignment)
-

১.৫.১৪.০ : উদ্দেশ্য (objective)

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন :

- (১) আধুনিক ভারতের ইতিহাসে পরিবেশ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা ও ইতিহাসচর্চার ধারা
 - (২) আধুনিক ভারতের ইতিহাসে পরিবেশ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গুরুত্ব এবং গবেষণার ফলে এই সব ক্ষেত্রে ইতিহাস অগ্রগতি
 - (৩) ভারতীয় ইতিহাসে নারীর গুরুত্ব ও গবেষণার প্রসার
 - (৪) নারী ইতিহাসচর্চার মূল্যায়ন—প্রাক স্বাধীনতায়ুগে এবং উত্তরপর্বে
-

১.৫.১৪.১ : পরিবেশ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (Environment, Science and Technology)

আধুনিক ভারতের ইতিহাস ও ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলি একে অন্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। জনসংখ্যার ব্যাপক পরিবর্তন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে ভারতের প্রাকৃতিক ভূচিত্র পাল্টে গিয়েছে। এই বিরাট রূপান্তর ইদানীংকালে ভারতের ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। একথা মনে করলে ভুল করা হবে যে ভারত ইতিহাসের মূল উপাদান হিসাবে প্রযুক্তি, বিজ্ঞান ও পরিবেশ বিগত প্রজন্মের ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। তথাপি কেবলমাত্র ১৯৯০ এর দশক থেকেই ভারতের বেশ কিছু ঐতিহাসিক এগুলিকে স্বাধীন গবেষণার বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ভারতীয় জনগণের কল্যাণ ও দেশের আবহাওয়ার উপর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাব সম্পর্কে তাঁরা একমত নন। তাঁদের মতভেদের ফলে দেশের জনমত, সরকার এবং রাজনীতির মধ্যে বিভেদ দেখা দিয়েছে। এর ফলে দেশে বিভিন্ন Lobby বা গোষ্ঠীর উদ্ভব

হয়েছে। যেমন—Science lobby, economics and planning lobby এবং environment lobby, তবে আসন্ন আকস্মিক দুর্বিপাকের আকাঙ্ক্ষায় সবাই সম্মুখ। বিশ্বব্যাপী শিল্পায়নের পরিপ্রেক্ষিতে 'Greenhouse effect' এর ফলে গ্লোসিয়ারের ক্ষয়প্রাপ্তি চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। পরিবেশের এই সংকটকে কেন্দ্র করে গণবিতর্ক স্বাভাবিকভাবেই ঐতিহাসিকদের প্রভাবিত করেছে। ১৯৯০ এর দশক থেকে এই সমস্যা সম্পর্কে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে। তারও আগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন উত্থাপিত হতে থাকে। যেমন—ভারতের আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কি ঔপনিবেশিক শাসনের দ্বারা বিবৃত হয়েছিল? বৃটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতে বিজ্ঞানের অবস্থা এবং প্রযুক্তির মান কেমন ছিল?

ইউরোপীয় যুক্তিবাদ ও আধুনিক বিজ্ঞান ঔপনিবেশিক ভারতে ছড়িয়ে দেবার সুবাদে ব্রিটিশরা ভারতে তাদের শাসনের যৌক্তিকতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিল।

বিশেষত ১৯৯০ দশকের পর থেকে ভারতের ইতিহাস চর্চায় বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ এ বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে থাকে। এবং এই আলোচনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের Lobby বা গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেছিল। ১৯৯০ এর দশক এর আগেও যদি দেখি তবে সেখানেও বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন দেখা যায়। যেমন-ভারতের আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কি ঔপনিবেশিক শাসনের দ্বারা বিবৃত হয়েছিল? বৃটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতে বিজ্ঞানের অবস্থা এবং প্রযুক্তির মানই বা কেমন ছিল? এই ধরনের বিভিন্ন প্রশ্নের আলোচনা করতে গিয়ে ভারত ইতিহাস চর্চায় এক নতুন শাখা বিশেষ ভাবে স্থান পেয়েছে।

ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে ব্রিটিশদের ধারণা ছিল, এটা প্রধানতঃ ধর্মনির্ভর, বিজ্ঞান নির্ভর নয়। কিন্তু সাত শতাব্দী আগে প্রথম দিকের মুসলমান ভ্রমণকারীদের মত কিন্তু আলাদা ছিল। ১০৩০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ আলবিরুনী ভারতের ধর্ম ও বিজ্ঞানের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। মুসলমানরা কিছু কারিগরী দ্রব্য এদেশে এনেছিলেন। যেমন, কাগজ ও 'Persian wheel'। ইউরোপও সে সময়ে চীন ও মুসলমান জগৎ থেকে কিছু প্রযুক্তিবিদ্যা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সতেরো শতকে বৈজ্ঞানিক বিপ্লব এবং আঠারো শতকে শিল্প বিপ্লবের ফলে ইউরোপ সবাইকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যায়। এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশরা ভারতে তাদের বিজ্ঞান ও সভ্যতার উৎকৃষ্টতা দাবী করতে থাকে। উনিশ শতকের শেষে এবং বিংশ শতকের গোড়ার দিকে ব্রিটিশ ভারতের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় বিজ্ঞানীরাও ভারতে আধুনিক বিজ্ঞান আনার ক্ষেত্রে ব্রিটিশদের ভূমিকার কথা অস্বীকার করেননি। কিন্তু একই সঙ্গে তাঁরা একথাও জোর দিয়ে বলেছেন যে প্রাচীন যুগে ভারতে বৈজ্ঞানিক ট্রাডিশন অব্যাহত ছিল। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের এই দ্বৈত ধারণা ধরা পড়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়নের অধ্যাপক ও বিখ্যাত বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মধ্যে। তিনি একদিকে নাইট্রেটের ক্ষেত্রে কয়েকটি প্রধান রাসায়নিক আবিষ্কার করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে *The History of Hindu Chemistry* বইটিও রচনা করেন। ১৯০২ এবং ১৯০৮ সালে দুখণ্ডে প্রকাশিত এই বইখানির মাধ্যমে এই পৃথিবী বিখ্যাত বিজ্ঞানী ব্রিটিশদের 'imperialist idea of science as the achievement of Western enlightened thought alone'-ধারণাকে ইতিহাসগতভাবে নস্যাত করে দিয়েছেন। পরবর্তীকালে অনেক ঐতিহাসিক এই যুক্তি দেখিয়েছেন যে আধুনিক বিজ্ঞান উদ্ভূত হয়েছে বহুমাত্রিক সভ্যতার মাধ্যমে, শুধু ইউরোপীয় সভ্যতার দ্বারা নয়। জেসেফ নিড্‌হামের লেখা *Science and Civilisation in China* বইটিতেও একই সুর শোনা যায়।

ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্বের মধ্যেও আধুনিক বিজ্ঞান ও ভারতীয় সভ্যতার তার ঐতিহাসিক প্রভাব সম্পর্কে দুটি ভিন্নমুখী চিন্তাধারা গড়ে ওঠে। ডঃ রজত রায় লিখেছেন, "Mohan Das Karamchand

Gandhi denounced railways lawyers and doctors, and declared machinery to be a 'great sin'. Hind Swaraj-এ গান্ধীজী লিখেছিলেন, “It is machinery that has impoverished India”. তাঁর শিষ্য জওহরলাল নেহরু কিন্তু এই মত গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি *The Unity of India* নামে একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন, “Politics led me to economics, and this led me inevitably to science and the scientific approach to all our problems of hunger and poverty”. ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তিনি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে, বড় বড় বাঁধ নির্মাণ করে এবং ইস্পাত কারখানা স্থাপন করে ভারতের ‘landscape’-এর রূপান্তর ঘটিয়েছিলেন। আধুনিককালের সংস্কারপন্থী পরিবেশবাদী ঐতিহাসিকরা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশের প্রশ্নে বিতর্কের ক্ষেত্রে নেহরুর চেয়ে গান্ধীজীর উপরই বেশী নির্ভর করেন।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ পর্বে যে পরিবেশগত প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছিল সেটি হল : how far had the face of the country changed over time? রাধাকম মুখার্জী তাঁর ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত *The Changing face of Bengal: a study in Riverine Economy* গ্রন্থে ঐতিহাসিক তথ্যের মাধ্যমে নদী ও পরিবেশের পরিবর্তন সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছিলেন। তবে পরিবেশ পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে তিনিই প্রথম ব্যক্তি ছিলেন না। উনিশ শতকের গোড়ায় D.Butter নামে এক ব্রিটিশ অফিসার পরিবেশ সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেন। তার নাম হল : *An Outline of the Topography and Statistics of the Southern Districts of Oudh*. ১৮৩৯ সালে প্রকাশিত এই রিপোর্টে তিনি বিগত কয়েক দশকের গ্রীষ্মকালীন গরম হাওয়া বা 'loo' এর 'unremitting advance' সম্পর্কে লিখেছিলেন। ঔপনিবেশিক অফিসারদের ঐতিহাসিক ভূগোল সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ ছিল। আলেকজান্ডার কনিংহামের লেখা *The Ancient Geography of India* গ্রন্থটি এক্ষেত্রে পথ দেখিয়েছিল। এইসব লেখাগুলি থেকে বোঝা যায় আধুনিক বিজ্ঞান ভারতে প্রবেশ করার আগেই জনসংখ্যা ও ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসারের ফলে ইতিমধ্যেই ভারতের পরিবেশে পরিবর্তন ঘটেছিল।

১৯৯০ এর দশকে নতুন করে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ সম্পর্কের ঐতিহাসিক চর্চার পরিপ্রেক্ষিতে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। যেমন, What was the popular reception of science-acceptance or resistance? What was the impact of ecological change upon the question of welfare-partially beneficial or wholly negative? তবে ঐতিহাসিক গবেষণার নিরিখে এই প্রশ্নগুলি একেবারে নতুন নয়। নতুন ইতিহাস চর্চার নতুনত্ব হল এই যে তাঁরা সব প্রশ্নগুলিকে একত্রে নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। এর আগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ছিল। একদিকে দেশপ্রেমী ভারতীয়রা বৈদিক যুগের অনেক আবিষ্কারের কথা বলে পশ্চিমী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে নগণ্য করার চেষ্টা করেছেন। আবার অন্যদিকে কিছু ঐতিহাসিক ঔপনিবেশিক বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নতির কথা বলেছেন।

সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে 'power and politics' সংক্রান্ত প্রশ্ন সম্পর্কে প্রকাশিত বিখ্যাত বই হল অধ্যাপক দীপক কুমার এর লেখা *Science and the Raj*. এক্ষেত্রে আরও কতকগুলি বই হল : ডেভিড আর্নল্ড-এর *Colonizing the Body : State, Medicine and Epidemic Disease in Nineteenth Century India*; জ্ঞান প্রকাশের *Another Reason : Science and the Imagination of Modern India*; ডেভিড আর্নল্ডের *Science, Technology and Medicine in Colonial India*. নিম্নবর্ণিত ঐতিহাসিক ডেভিড আর্নল্ড ও জ্ঞান প্রকাশ

দুজনেই দেখিয়েছেন, বিজ্ঞানের মাধ্যমে রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা দুজনেই নতুন প্রযুক্তিকে দেখেছেন 'a link between space and the state'. এঁদের মতে বিজ্ঞান হল ক্ষমতা ও আধিপত্যের মাধ্যম। ঔপনিবেশিক শাসন আমলে বিজ্ঞানের মাধ্যমে আধিপত্য প্রসারের নীতি গ্রহণ করেছিল; এর মধ্যে ঔপনিবেশিক মানুষদের জন্য কল্যাণকামনা ছিল না। এঁদের মতে বিজ্ঞান নির্ভর রেলপথ ও টেলিগ্রাফের প্রসারের ফলে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ মানুষ ঔপনিবেশিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে গণ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। জনস্বাস্থ্যের অবনতি ও মৃত্যুর কারণ হিসাবে প্লেগ, ম্যালেরিয়া, বসন্তস কলেরা, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতির উপর ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া এইসব রোগের জন্য রাজনৈতিক অস্থিরতা ও প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলার কথাও আলোচিত হয়েছে। কঠোর ঔপনিবেশিক জনস্বাস্থ্য নীতির বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কেও বই প্রকাশিত হয়েছে।

পৃথিবীব্যাপী পরিবেশ আন্দোলনের প্রভাবে ১৯৯০ এর দশকে ইতিহাসের একটি বিশেষ শাখা হিসাবে পরিবেশের ইতিহাস রচনার উদ্ভব ঘটে। ১৯৮৭ সালে C.A. Bayly মন্তব্য করেছিলেন, "Ecological change in India is the coming subject but no overview has appeared". বেইলী নিজেই এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে ১৮৭০ সালের পরের একশো বছরে ভারতীয় উপমহাদেশে এক বিপুল পরিমাণ বৃক্ষশূন্যতার সূচনা হয়েছিল। নতুন প্রজন্মের পরিবেশ ইতিহাসবিদদের প্রথম উল্লেখযোগ্য বই হল : রামচন্দ্র গুহ-র *The Unquiet Woods : Ecological Change and peasant Resistance in the Himalaya*. বইটি ১৯৯১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। বইটি অধ্যাপক গুহ নিম্নবর্গীয় ঐতিহাসিকদের 'থিম' অনুযায়ী পরিবেশের পরিবর্তন অপেক্ষা "dominance and resistance"-এর কথাই বেশি বলেছেন। হিমালয় অঞ্চলের বনসম্পদের বাণিজ্যিক গণ শোষণের বিরুদ্ধে হিমালয়ের পাদদেশের মানুষের গণ আন্দোলনের উত্থানের কথা এখানে আলোচিত হয়েছে। ১৯৯২ সালে প্রকাশিত হয় রামচন্দ্র গুহ ও মাধব গ্যাড্‌গিল এর লেখা *This Fissured land : an ecological history of India* গ্রন্থটি। এখানে আলোচনার বিষয়বস্তুর পরিধি অনেক বিস্তৃত ছিল। এঁদের সিদ্ধান্ত হল : "In India the ongoing struggle between the peasant and industrial modes of resources use has come in two stages : colonial and post colonial. It has left in its wake a fissured land, ecologically and socially fragmented beyond belief and, to some observers, beyond repair". ঔপনিবেশিক নীতির ক্ষতিকারক পরিবেশগত ফলাফল সম্পর্কে দুখানি উল্লেখযোগ্য বই প্রকাশিত হয়েছে। একটি Richard H. Grove-এর লেখা *Green Imperialism : Colonial Expansion, Tropical Island Edens, and the Origins of Environmentalism 1600-1860*. বইটি ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত হয়। আরেকটি বই এর লেখক হলেন Mahesh Rangarajan. বইটির নাম হল : *Fencing the Forest: Conservation and Ecological change in India's Central Provinces 1860-1914*. বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ সালে। পরিবেশের ইতিহাসের কতকগুলি মূল বিষয় হল : বনবাসীদের অধিকার হারানো, তাদের প্রতিরোধ এবং বনসংরক্ষণের জন্য প্রচেষ্টা।

প্রথাগত ইতিহাসে ইতিমধ্যেই পরিবেশের উপর ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব আলোচিত হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রের সম্প্রসারণ, সেচ খাল খনন, জমা-জল, রোগের প্রাদুর্ভাব প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে অনেকেই লিখেছেন। এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল : এলিজাবেথ হোয়াইকোম্ব—এর *Agraian Conditions in Northern India : The United provinces under British Rule, 1860-1900* আয়ান স্টোন এর *Canal Irrigation in British India :*

Perspectives on Technological change in a Peasant Economy. এম. মুফাখারুল ইসলাম এর Irrigation, Agriculture and the Raj: Punjab 1887-1947. বইগুলি থেকে যে বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে তা হল, রাস্তা ওখাল জলের স্বাভাবিক গতিধারাকে ব্যাহত করেছিল, যদিও জলসেচের সুবিধার ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল। Robert Varady-র রেলপথের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা থেকে জানা যায় কীভাবে রেলপথ নির্মাণের ফলে হিমালয় অরণ্য অঞ্চল এবং সমতলের বনাঞ্চল অবলুপ্ত হয়েছিল। রাস্তা এবং রেলপথ তৈরির ফলে বিভিন্ন রোগ ও মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটে। পরিবেশ ইতিহাসবিদ ছাড়াও অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকরা কৃষির সম্প্রসারণের ফলে বনাঞ্চল ধ্বংস সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল শিরিন মুসভি-র *Man and Nature in the Mughal Era (1993)*. তবে পরিবেশের উপর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাব সম্পর্কে জানতে হলে শুধু পরিবেশ ইতিহাসবিদ নয়, মূলস্রোতের অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকদের কাজগুলি নিয়ে একত্রে আলোচনা করা দরকার। তবেই একটি 'balanced picture' পাওয়া সম্ভব।

পরিবেশের ইতিহাসের উত্থানের ফলে আধুনিক ভারতের ইতিহাসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা নতুন করে চিন্তা শুরু করেছেন। এর কারণ হল, ঔপনিবেশিক ও উত্তর ঔপনিবেশিক পর্বে প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সে সম্পর্কে পরিবেশ ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ। কারিগরী উন্নতি আগেকার অসমালোচনামূলক ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে বর্তমানে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গৃহীত হয়েছে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকরা একরকম নিশ্চিত যে বৃটিশ শাসন, ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সূচনা করে ভারতীয়দের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে চেয়েছিল। তবে তাঁরা মনে করেন যে একেবারে শুরুতে ভারতীয়রা রেলপথ ও টেলিগ্রাফ স্থাপনের বিরোধিতা করেছিল। সিপাহী বিদ্রোহের কারণ হিসাবে J,H,Kaye ভারতীয়দের এই ব্রিটিশ বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাঁর বিখ্যাত *A History of the sepoy war in India* গ্রন্থে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক বক্তব্য হল : বিদ্রোহ দমনের পর প্রযুক্তি, যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতির ফলে ভারতের প্রকৃত উন্নতি ঘটেছিল। L.S.S O'Malley এনামে একজন ঔপনিবেশিক অফিসার তাঁর বিখ্যাত *Modern India and the West : a study of the interactions of the civilisations* গ্রন্থে 'Mechanism and Transport' নামে একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় রচনা করেছেন। এই অধ্যায়ে তিনি রেলপথ, যোগাযোগ, বেতার, ফিল্ম, প্রভৃতির নতুন গঠন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে এর ফল ভারতের অনুকূলেই গিয়েছিল।

স্বাধীনতা লাভের পর প্রযুক্তি সম্পর্কে গ্রন্থ মূলত : ইতিহাসের বিশ্লেষণাত্মক ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে রচিত হয়েছিল। ভারতের এই গতিধারা অনুযায়ী ভারতের কয়েকজন প্রথম সারির বিজ্ঞানীও 'technicaleducator' রা নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম ও লাইব্রেরীতে কতকগুলি বক্তৃতা দেন। ১৯৭৭ সালে এই বক্তৃতাগুলি বি.আর.নন্দার সম্পাদনার *Science and Technology in India* নামক গ্রন্থের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এখানেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ফলাফল সম্পর্কে অসমালোচনামূলক সদর্শক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয় এবং জওহরলাল নেহরুর প্রগতিমূলক নেতৃত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই সমস্ত গ্রন্থে প্রযুক্তিকে বিজ্ঞানের ইতিহাসের একটি অংশ হিসাবে গ্রহণ করা হয়। প্রযুক্তির নিজস্ব পৃথক ইতিহাস গড়ে উঠতে কিছুটা সময় লাগে। ইউরোপের অনেক ঐতিহাসিক দেখাতে চান যে পশ্চিম থেকে অ-পশ্চিমী সমাজে প্রযুক্তির হস্তান্তরের ফলেই উন্নতি সম্ভব হয়েছিল।

Daniel R.Headrick-এর লেখা *The Tentacles of Progress : Technology Transfer in the Age of Imperialism, 1850-1940* গ্রন্থে এই ধরনের বক্তব্যের প্রকাশ ঘটেছিল। Roy McLeod ও Dipak Kumar সম্পাদিত *Technology and the Raj* গ্রন্থে ভারতের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই গ্রন্থের ভারতীয় রেলপথের উপর একটি প্রবন্ধে Ian Derbyshire বলেছেন, "Technical development remained colonial-dependent." F.Lehmann হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, 'during the entire period of British rule in India, not more than 700 locomotives were built in the country, despite the vast railway network that existed in 1947'. অন্যান্য রেল ইঞ্জিনগুলি বিদেশ থেকে আনা হয়েছিল যেগুলির অধিকাংশই সম্ভবতঃ ইংলণ্ডে তৈরি হয়েছিল। একই ধরনের বক্তব্য রেখেছেন Daniel Thorner. তিনি বলেছেন, "India alone of the countries with great railway networks is unindustrialized".

প্রথমে ব্রিটেন থেকে ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির হস্তান্তরের ঐতিহাসিক ভূমিকার সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রধানতঃ পরিবেশের চেয়ে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই বেশি করে দেখা হয়েছিল। কিন্তু পরিবেশের ইতিহাসের উত্থানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকায় সমালোচনা একটি নতুন মাত্রা পায়। রেলপথের উপর অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক ও পরিবেশ ইতিহাসবিদদের প্রবন্ধগুলি একত্রিত করে সম্পাদনা করেছেন Ian. J. Kerr. বইটির নাম *Railways in Modern India*. তিনি রেলপথের শুভ ও অশুভ দুরকম ফলাফল নিয়েই লেখা প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিহাসের একটি বিশেষ দিক হল ভারতে ইউরোপীয় ঔষধের আমদানী। এক্ষেত্রেও আধুনিক গবেষকরা এর সদর্থক ও নঞর্থক দুই ধরনের ফলাফলের উল্লেখ করেছেন। তবে নতুন গবেষণা "has still not dislodged the impression that technology brought important benefits".

যাই হোক, গবেষণার অগ্রগতির ফলে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশের ইতিহাস ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে একটি নতুন শাখা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রশ্ন

- ১। ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে ব্রিটিশদের কি ধারণা ছিল?
- ২। আধুনিক ভারতের ইতিহাসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের নতুন ভাবনাটা কি?

১.৫.১৪.১ : নারী-ইতিহাস (Women History)

দীর্ঘদিন ধরে ভারতের ইতিহাসচর্চায় নারীদের গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। বর্তমানে এর পরিবর্তন ঘটলেও অধ্যাপিকা রেখা পাণ্ডুর ভাষায় বলা যায়, "In the Indian context Women's history is still at its infancy". এর অর্থ এই নয় যে, আসলে নারীদের সমস্যা নিয়ে কোন গভীর চিন্তা ভাবনা করা হয়নি। যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হল একটি "independent and natural discipline". হিসাবে নারী ইতিহাস তখন স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী হয়নি। তবে ভারতে বিভিন্ন নারী ইতিহাসচর্চা কেন্দ্র স্থাপিত হবার ফলে এবং সিলেবাসে নারী ইতিহাস স্থান পাওয়ার বিষয়টি বর্তমানে গুরুত্ব পাচ্ছে।

ভারতীয় ইতিহাসচর্চায় নারীদের অবহেলিত হওয়ার প্রধান কারণগুলি হল :

- (১) ভারতীয় ইতিহাসচর্চা ছিল প্রধানত পুরুষকেন্দ্রিক। যদিও কিছু কিছু গ্রন্থে নারীদের সম্পর্কে আলোচনা থাকত, সেগুলি স্থান পেত একেবারে পুস্তকের শেষ অধ্যায়ে। বৈদিক, পরবর্তী বৈদিক, মধ্যযুগ ও বিজয়নগর সমাজে নারীদের অবস্থা সম্পর্কে লেখা থাকলেও এই পর্বে ভারতের ইতিহাসে নারীদের ভূমিকার যথাযথ বিশ্লেষণ করা হয়নি।
- (২) প্রচলিত ভারতের ইতিহাসচর্চায় রাজনীতি, যুদ্ধ, কূটনীতি প্রভৃতি যে বিষয়গুলির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হত সেখানে নারীদের ভূমিকা তুলে ধরার কোন সুযোগ ছিল না। সুলতানা রাজিয়া বা ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাইকে ইতিহাসের পাদপ্রদীপে তুলে আনা হয়েছিল এই কারণে যে তারা নারী হয়েও পুরুষের ভূমিকা পালন করেছিলেন।
- (৩) নারীদের প্রধান কাজগুলি যথা সন্তানের জন্ম দেওয়া, রান্না করা, চাষের কাজে অংশগ্রহণ, লোকশিল্পে অংশগ্রহণ প্রভৃতিকে ঐতিহাসিকরা ইতিহাসের বিষয়বস্তু হবার মত উপযুক্ত বা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতে চাননি। এইজন্য নারী ইতিহাসের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি।
- (৪) নারী ইতিহাস অবহেলিত হওয়াতে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল উপাদানগত অপ্রতুলতা। প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক উপাদানগুলিতে রাজনৈতিক ইতিহাসের কথাই বেশি জানা যায়, নারীরা সেখানে অবহেলিত। রেখা পাণ্ডে তাই মন্তব্য করেছেন, "Nurnismatics , archaeology, inscriptions and literary texts reflect an elite world, and coupled with the pre-occupation with Political history, have completely ignored women".

উনিশ শতকের কয়েকজন ইউরোপীয় লেখক ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহী হন এবং তাদের রচনায় ভারতীয় নারী গুরুত্ব পায়। ভারতীয় নারীদের অবস্থা সম্পর্কে তত্ত্বগত বিতর্ক দেখা দেয়। প্রাচ্যবাদী ইউরোপীয়রা ভারতের প্রাচীন সভ্যতার প্রশংসা করলেও উনিশ শতকে ইউটিলিটারিয়ান ও ইভানজেলিস্টরা (Utilitarians and Evangelists) সমকালীন ভারতীয় সমাজের কঠোর সমালোচনা করেন। তারা ভারতীয় নারীদের 'low status'-এর কথা তুলে ধরেন। এই সমালোচনার জবাবে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য উল্লেখ করে দেখান যে ভারতীয় নারী 'high status'-এর অধিকারী ছিল। উইলিয়াম জোন্স এবং এইচ.টি.কোলব্রুক প্রমুখ প্রাচ্যবাদীরা সংস্কৃত সাহিত্যে ভারতীয় ইতিহাস ও দর্শনের প্রশংসা করেন। কিন্তু তাদের রচনাতেও নারীদের স্থান ছিল নগণ্য; জোন্স কেবলমাত্র গার্গীকে একজন শিক্ষিতা মহিলা হিসাবে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সতীদাহ প্রথা বা ভারতের বিধবা মহিলাদের কথা বলেননি। কোলব্রুক ধর্মীয় সাহিত্যে সতীদাহ প্রথার ব্যাখ্যা খোঁজার চেষ্টা করেছেন।

প্রাচীন ভারতে পুরুষকেন্দ্রিক ইতিহাসচর্চা উপাদানগত অপ্রতুলতা প্রভৃতি কারণে ভারতের ইতিহাস চর্চায় নারীদের গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। কিন্তু আসলে এই নয় যে, নারীদের সমস্যা নিয়ে কোন গভীর চিন্তা ভাবনা করা হয়নি। আসলে যেটা হয়েছিল তা হল নারী ইতিহাস এমন স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী হয়নি। কিন্তু উনবিংশ এবং বিংশ শতকে থেকে ভারতীয় ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিজীবীরা নারীদের বিভিন্ন সমস্যা ও তাদের চিন্তা ভাবনা নিয়ে আলোচনা করতে থাকেন এবং এর ফলে নারী ইতিহাস চর্চা যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে।

Clarisse Bader তাঁর "Women in Ancient India"(1925) গ্রন্থে আর্যযুগের ভারতীয় নারীদের প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন আর্য নারীদের ধর্মীয় নমনীয়তা, স্বার্থতাগ, পরিবারের প্রতি সীমাহীন দায়িত্ববোধ ও

আনুগত্য প্রভৃতি গুণ পশ্চিমী মহিলাদের অনুকরণযোগ্য। Bader ভারতীয় নারীদের স্বামীর সঙ্গে সতী হওয়ার ঘটনাকে তাদের 'আধ্যাত্মিক সাহসিকতা' বলে বর্ণনা করেছেন। Isabel Blen Horner বৌদ্ধ পালি সাহিত্যের উপর নির্ভর করে নারীদের একটি নতুন বিভাগ সংযোজন করেছেন, সেটি হল 'Women Workers' : তিনি তাঁর বিখ্যাত 'Women Under Primitive Buddhism' (1930) গ্রন্থে প্রচলিত মাতা, কন্যা, স্ত্রী ও বিধবাদের কথা না বলে নারী শ্রমিকদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

জেমস মিল তাঁর 'History of British India' (1871) গ্রন্থে হিন্দু সভ্যতার নিষ্ঠুরতার কথা বলেছেন। কারণ হিন্দুরা নারীদের কোন সম্মান দেয়নি। মিলের মতে, "They excluded women from sacred texts, while depriving them of education, of a share of paternal property, and held them as unworthy to eat with their husbands." নারীদের শিক্ষা ও পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার তিনি কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে যেহেতু হিন্দু সমাজ মেয়েদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা দিতে পারেনি সেজন্য ভারতে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের অনুপ্রবেশ প্রয়োজন। তিনি আরো বলেছেন যে, হিন্দু পুরুষরা Self-rule এর জন্য মোটেই উপযুক্ত নয়। মিলের বক্তব্যকে অনেক ব্রিটিশ প্রশাসক ও রাজনীতিবিদ সমর্থন করেন। পশ্চিমী ধারণায় শবদাহের সময় কোন বিধবার মৃত্যু এবং শিশুকন্যার বিবাহ মানেই ভারত বলে মনে করা হতে থাকে। Katherine Mayo তাঁর বিখ্যাত 'Mother India' (1927) গ্রন্থে ভারতীয় নারীদের শোচনীয় দুর্গতি এবং বিশেষ করে শিশুপত্নীদের কষ্টের কথা বলেছেন। এইজন্য ভারতীয় পুরুষদের উপর তিনি দোষারোপ করেছেন।

- (১) পশ্চিমী ঐতিহাসিকদের সমালোচয় বলা যায় যে, তারা ভারতীয় সমাজের আংশিক ছবি তুলে ধরেছেন, পূর্ণাঙ্গ নয়। এর কারণ হল তাদের ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা। এই উপাদানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না। কারণ এই ধরনের সাহিত্যে প্রধানত ধর্মীয় ও আইনগত বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। যেমন নারীর পুনঃবিবাহের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, সন্তানহীন বিধবার দত্তক গ্রহণ, শিক্ষার অধিকার, জনসমাবেশে নারীদের উপস্থিতির প্রশ্ন প্রভৃতি। এই ধরনের সাহিত্যে কেবলমাত্র মেয়েদের সাংসারিক জীবন ও স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের কথা বিশেষভাবে বলয়ছে। সমাজের অন্যান্য কাজকর্মের কথা স্থান পায়নি। এই সাহিত্যে সমাজের উচ্চশ্রেণীর কথা বলা আছে।
- (২) পশ্চিমী লেখকদের রচনায় ভারতীয় নারীদের 'low status'-এর ব্যাখ্যার পিছনে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। এর মাধ্যমে তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ভারত শাসন এবং ভারতীয় সমাজের রূপান্তরের নৈতিক অধিকার দাবী করার চেষ্টা করেছিল।
- (৩) এইসব লেখকরা কেবলমাত্র বিশেষ একটি শ্রেণী অথবা উচ্চশ্রেণীর নারীদের সম্পর্কে লিখেছেন। অধ্যাপিকা পাণ্ডে তাই মন্তব্য করেছেন, "Women of other castes and sections were totally omitted from scrutiny and were not a matter of concern".

উনিশ শতকের প্রথম ভাগ থেকেই ভারতের বুদ্ধিজীবীরা নারী সচেতন হয়ে ওঠেন। সতী, শিশুকন্যা বিবাহ, কন্যাহত্যা ও বিধবাদের সম্পর্কে তারা চিন্তা ভাবনা করতে থাকেন। তার সমাজ সংস্কারের কথা বলতে থাকেন। এর বিরোধিতাও করা হয়। দুপক্ষই কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের যুক্তির সমর্থনে সংস্কৃত শাস্ত্রের উপর নির্ভর করতে থাকে।

বিংশ শতাব্দীতে বেশ কিছু ঐতিহাসিকদের রচনায় নারীদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

- (১) এক্ষেত্রে প্রথম উল্লেখযোগ্য বই হল A.S. Altekar-এর “position of women in Hindu Civilization”. (1938), বইটি ব্রাহ্মণ্য উপাদানের উপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছিল। গ্রন্থটিতে প্রাচীন আইনবিদদের নারীদের শিক্ষা, বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, বিধবাদের অবস্থা, নারীদের সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে মতামত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়। Altekar-এর মতে কোন দেশের সভ্যতাকে বুঝতে হলে সেই দেশের নারীদের অবস্থা কী ছিল তা আগে জানা দরকার। তাঁর মতে, বিবাহ আইন ও প্রথায় নারীদের কেবলমাত্র ‘market commodities’ বলে মনে করা হত, না ‘husband’s valued partner’ হিসাবে দেখা হত, তার মধ্যেই নারীদের প্রকৃত অবস্থা জানা যাবে। আলতেকার মনে করেন, হিন্দু নারীরা কন্যা সন্তানের চেয়ে পুত্র সন্তান চাইত এই কারণে যে বিধবারা পিতা মাতার দুঃখের কারণ ছিল অথবা পিতা মাতা তাদের কন্যাদের বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করতে পারত না বলে। কারণ সে যুগে পুনঃবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল না। আলতেকার লিখেছেন মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার দেওয়া হত না এই কারণে যে শত্রুদের হাত থেকে তা রক্ষা করবার মত ক্ষমতা তাদের ছিল না। তিনি আরো বলেছেন যে মেয়েদের অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়া হত এই কারণে যে তারা যাতে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম গ্রহণ করতে না পারে। অবশ্য আলতেকার ও উচ্চশ্রেণীর মহিলাদের কথা বলেছেন। এর ফলে প্রাচীন যুগের নারী ইতিহাস রচনার বিশ্লেষণধর্মিতা বাধা প্রাপ্ত হয়।
- (২) Devaki Indra তাঁর ‘Status of Women in Ancient India’ (1940) গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে আদি আর্য সমাজের মেয়েদের সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবস্থা পূর্ববর্তীযুগের চেয়ে অনেক ভালো ছিল। J.B. Chowdhuro তাঁর ‘Position of Women in Vedic Ritual’ (1956) গ্রন্থে ভারতীয় নারীদের রক্ষণশীলতা এবং তা ধরে রাখার ক্ষেত্রে তাদের আগ্রহের কথা বলেছেন। “The Status of Wmmen in the Epic” (1966) গ্রন্থে Shakambari Jayal দেখিয়েছেন যে, প্রথমে নারীদের ‘high status’ থাকলেও পরবর্তী বৈদিক যুগ অনার্য স্ত্রীদের আগমনের ফলে অবস্থান অবনতি ঘটে।
- (৩) ডি.ডি. কোশাস্বী আর.এস.শর্মা প্রমুখ মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরা প্রচলিত রাজনৈতিক ইতিহাসেদে ওপর বেশি জোর দেওয়া ফলে নারী ইতিহাস তাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। রোমিলা থাপারের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়।
- (৪) সরোজ গুলাটি এবং কমলা গুপ্ত প্রমুখ medievalist ঐতিহাসিকদের সম্পর্কে সমালোচনা প্রতিবাদ করেছেন, তাদের মতে এইসব নারীরা যখন রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন তখন তাদের সম্পর্কে অপব্যাখ্যা করা হয়েছিল। যেমন রাজিয়া একজন ‘wise, just, generous, a protector of her subjects and leader of her armies’ হওয়া সত্ত্বেও দাস ইয়াকুত এর সঙ্গে তার সম্পর্ককে কেন্দ্র করে অনেক সমালোচনা করা হয়েছে। একইভাবে নূরজাহানের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভকেও সমকালীন ইতিহাসে অযথা সমালোচনা করা হয়েছে এবং ‘Petticoat Government’ বলে নিন্দা করা হয়েছে। রেখা মিশ্র তাঁর ‘Women in Mughal India’ (1967) গ্রন্থে মহিলাদের

রাজনীতিতে অংশগ্রহণের কথা লিখেছেন। অবশ্য সরোজ গুলটি 'Women and Society' গ্রন্থে মহিলাদের সাংসারিক কাজকর্মের কথা বললেও 'Production Process'-এ মহিলাদের ভূমিকা সম্পর্কে কিছুই বলেনি।

১৯৪৭ সালের পর অর্থাৎ স্বাধীনতা উত্তর পর্বে নারী ইতিহাসচর্চায় নতুন দেখা যায়। উনিশ শতকের সামাজিক সংস্কারের গণ্ডি পেরিয়ে ঐতিহাসিকরা নারী ইতিহাস আলোচনায় জাতীয়বাদী প্রকাশ ঘটাতে চেয়েছেন। Joanna Liddle এবং Roma Joshi তাদের 'Daughters of Independence' গ্রন্থে যে বক্তব্য পেশ করেছেন তা হল "women could not envisage an independent programme for they had to find their understanding of women's participation within the conceptional framework of the national movement". স্পষ্ট করে বলা যায় জাতীয় আন্দোলনে নারীদের ভূমিকার কথা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। Partha Chatterjee 'Recasting Women' (1989) গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে 'Nationalism' এবং 'Women Question' এর মধ্যে সম্পর্কের কথা বলেছেন। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে জাতীয়তাবাদ 'Women Question' এর সমাধান করেছে।

K.Lalita 'Women Writing in India' (1991-1993) গ্রন্থে কৃষক সংগ্রামে নারীদের ভূমিকার কথা বলেছেন। তেলেঙ্গানা আন্দোলনে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তিনি বলেছেন।

বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন ঐতিহাসিকেরা নারী ইতিহাস রচনার ফলে নারী ইতিহাসচর্চা বর্তমানে যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে। তাই বিভিন্ন যুগে আর্থ-সামাজিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে মহিলাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় এখনো প্রকাশিত হয়নি। তবে বর্তমানে ইতিহাস রচনায় 'male and elite perspective'-এর সঙ্গে সঙ্গে নারী ইতিহাসও যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে। যার উদ্দেশ্য হল : Building a new comprehensive history in which women are given a proper place as par with man".

প্রশ্ন

১। ভারতীয় ইতিহাস চর্চার নারীদের অবহেলিত হওয়ার কারণগুলি কি ছিল ?

১.৫.১৪.৩ : সহায়ক গ্রন্থ (References Books)

1. Sanjay Subrahmanyam (ed) : Money and Market in India; 1100-1700.
2. Sugata Bose : Peasant Labour and Colonial Capital : Rural Bengal since 1770.
3. Sumit Guha : The Agrarian Economy of the Bombay-Deccan, 1881-1941.
4. R.S. Rungta : The Rise of Business Corporations in India, 1851-1900.
5. R.K. Ray (ed) : Entrepreneurship and Industry in India 1800-1947.
6. T. Roy : Traditional Industry in the Economy of Colonial India.
7. Burton Stein and Sanjay Subrahmanyam (ed) : Institutions and Economic change in South Asia.

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Dwijendra Tripathi (ed) | : Business Communities of India. |
| 9. A.K. Banerjee | : Aspects of Indo-British Economic Relations, 1858-98. |
| 10. Ranajit Guha | : Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India. |
| 11. Narahari Kabiraj | : A Peasant Uprising in Bengal. |
| 12. Narahari Kabiraj | : Wahabi and Farazi Rebels of Bengal. |
| 13. Blair B. Kling | : The Blue Mutiny : The Indigo Disturbances in Bengal 1859-1862. |
| 14. Majid Siddiqui | : Agrarian Unrest in Northern India : The United Provinces 1918-32. |
| 15. E.D. Murphy | : Unions in Conflict : A Comparative Study of Four South Indian Textile Centres, 1918-1939. |
| 16. Samita Sen | : Women and Labour in Late Colonial India : the Bengal Jute Industry. |
| 17. H.J McCloskey | : Ecological Ethics and Politics. |
| 18. D.E. Worster | : Nature's Economy : The Roots of Ecology. |
| 18. William Tucker | : Progress and Privilege: America in the Age of Environmentalism. |
| 19. বিনয়ভূষণ রায় | : উনিশ শতকে বাংলার বিজ্ঞান সাধনা। |
| 20. C.A. Bentley | : Malaria and Agriculture in Bengal. |
| 21. Pandita Ramabai | : The High Caste Hindu Woman. |
| 22. B.C. Law | : Women in Buddhist Literature. |
| 23. Bharati Ray (ed) | : From the Seams of History : Essays on Indian Women. |
| 24. Usha Chakraborty | : Condition of Bengali Women around the second half of the Nineteenth century. |

১.৫.১৪.৪ : নমুনা প্রশ্ন (Model Questions)

1. Write a note on the role of technology in modern history.
 2. Discuss some of the historical works on science, technology and environment.
 3. Why did the early writers of Indian history relegate women to the background?
-

পর্যায় গ্রন্থ - ৬
একক ১৫
Social History

বিন্যাস ক্রম :

- ১.৬.১৫.০ : উদ্দেশ্য (Objective)
১.৬.১৫.১ : ইতিহাসে বিতর্ক (Debates in History)
১.৬.১৫.২ : ইংলণ্ডের গৃহযুদ্ধ (১৫৪২ খ্রীঃ)
১.৬.১৫.৩ : হেনরী পিনের বিতর্ক
১.৬.১৫.৪ : সহায়ক গ্রন্থ (Reference Books)
১.৬.১৫.৫ : নমুনা প্রশ্ন (Model Questions)

১.৬.১৫.০ : উদ্দেশ্য (Objective)

এই অংশটি অধ্যয়ন করে ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারবেন :

- ১) ইতিহাস বিতর্কের কারণ
- ২) ইংলণ্ডের গৃহযুদ্ধের কারণ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য ও নানা অভিমত
- ৩) হেনরী পিনের তত্ত্ব
- ৪) এই তত্ত্ব নিয়ে ঐতিহাসিক বিতর্ক
- ৫) এই তত্ত্বের গুরুত্ব

১.৬.১৫.১ : ইতিহাস বিতর্ক

ইতিহাস চর্চার একটি প্রধান আকর্ষণীয় বিষয় হল কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক। বিক্ষিপ্ত ও ত্রুটিপূর্ণ ঐতিহাসিক নথিপত্রের ফলে ঐতিহাসিকদের মধ্যে ভিন্নধর্মী ব্যাখ্যা বোর সুযোগ ঘটে।

ইতিহাস চর্চার একটি প্রধান বিষয় হল কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঐতিহাসিক বিতর্ক। কারণ এই বিতর্কের সাহায্যেই আজ সমৃদ্ধশালী হয়েছে ইতিহাস চর্চা ও ইতিহাস চর্চার জগৎ।

সৃষ্টি হয় ঐতিহাসিক বিতর্কের। তবে এই বিতর্কই ইতিহাসকে সজীব ও প্রাণবন্ত করে রেখেছে। ঐতিহাসিক আর্থার মারউইক অবশ্য মনে করেন, বিতর্ক দুর্ভাগ্যজনক। কারণ, এর ফলে ইতিহাস গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য অর্থাৎ অতীত সম্পর্কে গভীর বোধ বা অনুভূতির সৃষ্টি ব্যাহত হয়। তা সত্ত্বেও ঐতিহাসিক বিতর্ক ইতিহাস চেতনার প্রসারে সাহায্য করে, মতানৈক্যের

ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত হয় এবং নথিপত্রগুলি নতুনভাবে পরীক্ষিত হয়। এই বিতর্কের মধ্য দিয়েই অদ্ভুত হয়েছে ইতিহাসের অনেক নতুন ব্যাখ্যা ও নতুন তত্ত্ব। আবির্ভাব ঘটেছে নতুন নতুন ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর। এর ফলে ইতিহাসের অন্তরালে জমে থাকা অনেক নতুন তথ্য ও ঐতিহাসিক সত্যের উদ্ঘাটন সম্ভব হয়েছে। সমৃদ্ধশালী হয়েছে ইতিহাসচর্চা ও ইতিহাসের জগৎ।

১.৬.১৫.২ : ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধ (১৬৪২ খ্রীঃ)

এমনই একটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক বিতর্কের বিষয় হল সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধ (১৬৪২ খ্রীঃ)। এই গৃহযুদ্ধের কারণ ও প্রকৃতি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দিয়েছে।

লং পার্লামেন্ট (Long Parliament) কেন দ্বিধাবিভক্ত হয়েছিল — এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধের প্রকৃতির ব্যাখ্যা অন্তর্নিহিত আছে। লং পার্লামেন্টের বিভাজনের প্রকৃত কারণ অথবা গৃহযুদ্ধের চরিত্র কী ছিল তা নিয়ে ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন ধরনের মতামত প্রকাশ করেন। রাজতন্ত্রী ও পার্লামেন্টের মধ্যে বিবে কেন হয়েছিল তা বুঝতে হলে উভয় পক্ষের মধ্যে ধর্মীয়, সাংবিধানিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পার্থক্যগুলি আলোচনা করা দরকার। স্টুয়ার্ট আমলে ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধের ধর্মীয় প্রেক্ষাপট লক্ষ্য করার মতো। কতগুলি ধর্মীয় নীতি ও নিয়ম ইংল্যান্ডের জনগণের উপর চাপানোর ফলে গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা যায়। যদি রাজা চার্লস এবং আর্চবিশপ লড ‘প্রেয়ার বুক’ জোর করে চাপানোর চেষ্টা না করতেন তা হলে হয়তো লং পার্লামেন্ট ডাকার দরকার হত না।

১৬৪২ খ্রীঃ ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধের কারণ খুঁজে পেতে হলে আমরা লং পার্লামেন্ট কেন দ্বিধাবিভক্ত হয়েছিল এবং রাজা ও পার্লামেন্টের অধিকারের বিরোধ— এই দুটি বিষয় জানা দরকার।

আর্চবিশপ লড কর্তৃক নানান ধরনের ধর্মীয় আচার ও নিয়মকানুনের পরিবর্তন ইংল্যান্ডের পিউরিটান জনগণকে আহত করেছিল। পার্লামেন্ট যখন নতুন বিশপের নতুন নিয়মকানুনের প্রতিবাদ করল তখন তারা খুব সহজেই ইংল্যান্ডের জনসাধারণের সমর্থন পেল। পরবর্তীকালে এই ধর্মীয় নীতি নিয়ে পার্লামেন্টের বিবাদের প্রতিক্রিয়া থেকে জনসাধারণ অব্যাহত পায়নি। গৃহযুদ্ধের সময় এই ধর্মীয় বিরোধের প্রতিফলন নিশ্চিতভাবে পড়েছিল।

ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধের সাংবিধানিক পটভূমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। একদিকে রাজার প্রচলিত বিশেষ ক্ষমতা ভোগের দাবী এবং অন্যদিকে পার্লামেন্টের ধর্ম, ব্যবসা বাণিজ্য, বৈদেশিক নীতি, কর স্থাপন প্রভৃতি বিষয়ে

অধিকার অর্জনের নিরলস প্রচেষ্টা দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে যে উত্তপ্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল তার প্রতিফলন গৃহযুদ্ধের মধ্যে খুব সহজেই লক্ষ্য করা যায়। রাজা চার্লস যখন বললেন, “Parliamentary Privileges had their /imitations and since they emanated from the grace and the permission of the king and they were never above Remembers of the Parliament” তখন বিক্ষুব্ধ পার্লামেন্ট জানাল “The privileges of the Parliament are the birthrights and due inheritance of the people of England”. এইজন্য ঐতিহাসিক গার্ডিনার গৃহযুদ্ধকে ‘Puritan Revolution’ বলে মন্তব্য করেছেন। কারণ তার মতে এই যুদ্ধ ছিল পার্লামেন্টের ধর্মীয় ও সাংবিধানিক অধিকার ও স্বাধীনতা অর্জনের বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠা। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ট্রেভেলিয়ান গার্ডিনারের মত সমর্থন করেছেন। তিনি মন্তব্য করেছেন, “In motive the great rebellion was a war not of clauses but of ideas.”

যদিও গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে গার্ডিনার ও ট্রেভেলিয়ানের ধ্রুপদী ব্যাখ্যা একনো পর্যন্ত অব্যাহত আছে তবুও আধুনিক ঐতিহাসিকরা মধ্য সপ্তদশ শতকের গৃহযুদ্ধের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। পিউরিটান রেভোলিউশনের সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যা রইংরেজ ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রচণ্ড মতভেদের সৃষ্টি করেছে। শুধুমাত্র বিভিন্ন রধরনের মতামতই নয়, ঐতিহাসিকদের মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীত মতও প্রকাশ পেয়েছে।

গৃহযুদ্ধের আধুনিকতম ব্যাখ্যা হল যে সমাজের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক শক্তিগুলির বিরাট রূপান্তর ঘটেছিল।

- (১) অধ্যাপক টনি দেখিয়েছেন যে ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে জমি পুনঃবন্টনের ফলে যে সম্পত্তিগত ভারসাম্য বিনষ্ট হয়েছিল, তার প্রতিবিধান করার জন্য গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়। টনির মতে, একটি নতুন জেন্ড্রি বা জমিদার শ্রেণী ইংল্যান্ডের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছিল।
- (২) টনির মতে, জেন্ড্রিরা Capitalism এর পক্ষে বড় শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল টনি ও তার সমর্থকদের মতে, গৃহযুদ্ধের সময় শ্রেণী সংগ্রাম ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। যখন স্টুয়ার্ট রাজারা রাজত্ব করতে আসেন তখনই জেন্ড্রি পরিচালিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ইংরেজ জডনগণের মধ্যে সবচেয়ে কর্মক্ষম শ্রেণী হিসাবে পরিচিত ছিল। এই নতুন জেন্ড্রি শ্রেণীর উত্থান টিউডর আমল থেকে শুরু হয়েছিল। তারা ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। এই অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক ক্ষমতা তাদের স্বাভাবিকভাবেই বিদ্রোহী করে তুলেছিল। প্রকাশ্য যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে এই দুই পক্ষের প্রচার যুদ্ধ চলেছিল। এতে যেমন উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী অংশগ্রহণ করেছিল তেমনি অপরদিকে ধনী ও জমিদাররা বাদ যায়নি।

টনির Thesis-এর সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেছেন অধ্যাপক ট্রেভার রোপার।

- (ক) তিনি মনে করেন না যে নব জাগ্রত পিউরিটানিজমের সঙ্গে ক্যাপিটালিজমের সমীকরণ সঠিক।
- (খ) তিনি এটা মনে করেন না যে যুদ্ধের পূর্বে এই জেন্ড্রি শ্রেণীর উত্থান হয়েছিল। অপরদিকে তিনি কতগুলি উদাহরণ দিয়ে দেখান যে এক শ্রেণীর জমিদারদের উত্থান নয় বরং পতন শুরু হয়েছি। ট্রেভার রোপার ক্রমওয়েলকে একজন ‘ক্ষীয়মান ভদ্রলোক’ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, “The great rebellion was not the clear headed self-assertion of he rising bourgeoisie

and the gentry but rather the blind protest of the depressed gentry.” তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, জেন্ট্রিদের একাংশ বা mee gentry অন্য এক ধরনের court gentry-দের বিরোধিতা করে ও তাদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে। অধ্যাপক রোপার এই mere gentry-দের Round heads-দের সঙ্গে এবং court gentry-দের Cavalier সঙ্গে তুলনা করেছেন।

অধ্যাপক ক্রিস্টোফার হিল বলেছেন যদি আমরা ক্রমওয়েলের মত Independent কে declining gentlemen-এর সঙ্গে তুলনা করি তাহলে বোধহয় গৃহযুদ্ধের প্রকৃত চরিত্র পাওয়া যাবে না। কারণ যখন যুদ্ধ শুরু হয় তখন ওয়েস্টমিনিস্টারের নেতৃত্বে Independent-দের হাতে ছিল না। বরং ওয়ারউইক এসেক্স, হ্যাম্পডেন প্রমুখ পিয়ারদের হাতে তা ছিল। হিলের মতে, Independent রা যুদ্ধ জয়ের বড় হাতিয়ার হলেও তারা গৃহযুদ্ধ শুরু করেনি।

কিন্তু আধুনিক গবেষকরা গৃহযুদ্ধের অর্থনৈতিক বক্ষ্যখ্যার ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ মেনে নিতে পারেননি। ওদের মতে ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড কখনোই পরিষ্কারভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিতে বিভক্ত হয়নি। উভয়পক্ষই ব্যবহারজীবী, ‘country gentlemen’ এবং ‘Universit graduate-দের দ্বারা সমর্থিত হয়েছিল। এমনকি ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেকেই রাজতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন। কেবলমাত্র সমাজের উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক প্রশ্নকে কেন্দ্র করে মতভেদ দেখা দিয়েছিল। ব্রানটন ও পেনিংটন পার্লামেন্টের সদস্যদের Family, Local, Economic এবং Patronage এর উপর ভিত্তি করে নানাভাবে বিভক্ত করেছেন। কিন্তু তাদের মতে, এই প্রতিটি গ্রুপ কোন বিশেষ আদর্শ ও নীতির দ্বারা একতাবদ্ধ ছিল না। সুতরাং তাদের মতে, গৃহযুদ্ধকে কখনোই শ্রেণীসংগ্রাম বলা যায় না।

অধ্যাপক হিল, ব্রানটন ও পেনিংটন-এর বক্তব্যের প্রতিয়বাদ করেছেন। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে লতাদের বিশ্লেষণের মধ্যই দেখা যায় যে, পার্লামেন্টের সদস্যদের দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। তাঁর মতে ব্রানটন ও পেনিংটন landed এবং mercantile interest-এর মধ্যে পার্থক্য দেখাননি।

হিল, ব্রানটন ও পেনিংটন-এর সমালোচনা করে বলেছেন যে, তিনি ইংল্যাণ্ডের ভৌগোলিক বিভাজনের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেননি। কারণ তাঁর মতে, ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চল অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধশালী ছিল এবং রতারা পার্লামেন্টের সদস্যদের সমর্থক ছিল। তুলনায়

আসলে ইংল্যাণ্ডের গৃহযুদ্ধের মূলে ছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক পার্থক্য। কারণ একদিকে ধনী ও সাধারণ মানুষ পার্লামেন্টকে সমর্থন করেছিল এবং অন্যদিকে উচ্চশ্রেণী ও জমিদার যারা রাজাকে সমর্থন করেছিল এবং এই দুই এর সংঘাতেই গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়।

উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চল আর্থিক দিক থেকে অনেক পিছিয়ে ছিল এবং তারা Royalist দের সমর্থন করত। তবে হিল এবং ব্রানটন ও পেনিংটন সকলেই একমত যে পার্লামেন্টের সদস্যরা গোষ্ঠীবদল করত। দেখা গেছে অনক সদস্য যারা প্রথমে রাজতন্ত্রের বিরোধিতা করেছিলেন তারাই পরে Royalist-দলে যোগদান করেছিল।

এর মধ্যে আমরা হিল এ মতামতকেই গুরুত্ব দিতে পারি। হিল বলেছেন সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পার্থক্য গৃহযুদ্ধের মূলে ছিল। তিনি মনে করেন, ধনী ও সাধারণ মানুষ পার্লামেন্টকে সমর্থন করেছিল এবং উচ্চশ্রেণী ও জমিদার শ্রেণী যারা ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিল না তারা রাজাকে সমর্থন করেছিল। গৃহযুদ্ধের জন্য ইংল্যাণ্ডের ভৌগোলিক পার্থক্য অনেকাংশে দায়ী ছিল।

প্রশ্ন

- ১। ১৬৪২ খ্রীঃ ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধের মূল বিতর্কগুলি কি?
- ২। ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধের সম্পর্কে ক্রিস্টোফার হিল এর বক্তব্য কী?

১.৬.১৫.৩ : হেনরী পিরেন বিতর্ক

মধ্যযুগে খ্রীষ্টান জগৎ, ইসলামীয় সাম্রাজ্য এবং ক্যারোলিঞ্জিয় রাজ্যের বিকাশের উপর আরবদের সম্প্রসারণের প্রভাব সম্পর্কে বেলজিয়ান ঐতিহাসিক হেনরী পিরেনের অভিমত ঐতিহাসিক মহলে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। ‘Medieval Cities’ নামক গ্রন্থে পিরেন-এর মতবা প্রথম প্রকাশিত হয়। তারপর ‘Muhammad And Charlemagne’ গ্রন্থে তাঁর সিদ্ধান্ত তত্য ও পরিসংখ্যান দ্বারা সমর্থিত হয়। তাঁর বক্তব্য ইউরোপীয় পণ্ডিত সমাজকে বিস্মিত করেছিল। হেনরী পিরেনের মূল বক্তব্য হল : খ্রীষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে বর্বরজাতির আক্রমণে পশ্চিম ইউরোপের ভূমধ্যসাগর কেন্দ্রিক যে জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়নি, তা সপ্তম শতকে ইসলামের শক্তির অসামান্য বিস্তারে বিপর্যস্ত হয়ে যায়। পরোক্ষভাবে ইসলামই ছিল ফ্রাঙ্করাজ শার্লামেনের সম্রাটের মর্যাদায় ভূষিত হবার মূল কারণ।

পিরেন প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইউরোপের মধ্যে ভেদরেখাকে কৃত্রিম ও অবাস্তব বলে মনে করতেন। তাঁর পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকরা ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্যের পতনকে প্রাচীন ইউরোপের ইতিহাসের ছেদ চিহ্ন বলে মনে করতেন। পিরেন এই মত মেনে নেননি। তাঁর মতে, বর্বর আক্রমণের ফলে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের আয়তন হ্রাস পেলেও তার রাষ্ট্রীয় এক্য বিনষ্ট হয়নি। রোমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি অক্ষত থাকে। বৃদ্ধি পায় ভূমধ্যসাগরের উপর নির্ভরতা। ভূমধ্যসাগরের আমদানী বাণিজ্য অব্যাহত থাকে। রোমানদের জীবনে বর্বরদের রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠানের অনুপ্রবেশ ঘটলে তাদের সাময়িক জয়ের ফলে জার্মান সংস্কৃতি রোমান সংস্কৃতির স্থান দখল করতে পারেনি। রোমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ছিল। ৪৭৬ খ্রীঃ থেকে ফ্রাঙ্কশাসক শার্লামেনের আবির্ভাব পর্যন্ত ভূমধ্যসাগর কেন্দ্রিক ইতিহাসের মধ্যে কোন ছেদ হেনরী পিরেন দেখতে পাননি। মেরোভিজিয়ান আমলে আগের মতই প্রাচ্য দেশগুলর সঙ্গে ব্যবসায়িক লেনদেন অব্যাহত ছিল। হেনরী পিরেন মনে করেন, বর্বর আক্রমণের ব্যাপকতা ও প্রচণ্ডতা পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক জগতের শ্রী ও সমৃদ্ধি হ্রাস করলেও কৃষিভিত্তিক সমাজের প্রতিষ্ঠা ও ব্যবসা বাণিজ্যের অপমৃত্যু ঘটেনি। বর্বর আক্রমণে রোমান সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী নগরগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও বেশিরভাগ নগরের সজীবতা বজায় ছিল। নগরগুলির পৌর চরিত্র বিনষ্ট হয়নি। পিরেন পরবর্তীকালের নগরগুলিতেও রোমান নামে অস্তিত্বের সন্ধান পেয়েছেন।

পিরেন মনে করেন, বর্বর আক্রমণ সত্ত্বেও পশ্চিম ইউরোপের ভূমধ্যসাগরকেন্দ্রিক জীবনযাত্রার অব্যাহত গতি কেবলমাত্র সপ্তম শতকে ইসলামীয় শক্তির অভিঘাতে স্তব্ধ হয়ে যায়। ইসলামের দিগ্বিজয় অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটায়। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে চীন সাগর থেকে আটলান্টিক পর্যন্ত ভূভাগে মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় অপ্রতিহত গতিতে। মুসলমানদের অকস্মাৎ আক্রমণ ও অভূতপূর্ব সাফল্যে ইউরোপের ইতিহাসের ধ্রুপদী অধ্যায় শেষ হয়ে যায়। মুসলমান অধিকৃত অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রবর্তিত হয়। রোমান আইএনের জায়গা দখল করল মুসলমান আইনকানুন। গ্রীক ও লাতিনের স্থান অধিকার করল আরবী। সুদীর্ঘকালের রোমান প্রভাবাধীন ভূমধ্যসাগর ‘মুসলমান হ্রদে’ পরিণত

হল। ভূমধ্যসাগরের উপকূলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ৬৫০ খ্রীঃ থেকে আরবদের হস্তগত হবার ফলে বহির্বিশ্বের সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পিরেন মনে করেন, অষ্টম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইউরোপের বিপর্যয় শুরু হয়েছিল। পশ্চিম ইউরোপ হয়ে পড়েছিল নিঃসঙ্গ অবরুদ্ধ। পশ্চিম ইউরোপের কেন্দ্রবিন্দু ভূমধ্যসাগর থেকে সরে গেল উত্তর ইউরোপে। রোমের জায়গা দখল করল আখেন। বহু শতাব্দীর পুরানো সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। ছিন হল পশ্চিম ইউরোপের ইতিহাসের ধারাবাহিকতা। হেনরী পিরেন মনে করেন, এভাবেই ইউরোপে ধ্রুপদী যুগের অবসান ঘটেছিল এবং মধ্যযুগ শুরু হয়েছিল।

ঐতিহাসিক পিরেন-এর মতে, ক্যারোলিঞ্জিয় অধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য সমস্ত ঘটনাই ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে মুসলমান শক্তির বিস্তারের প্রতিক্রিয়া মাত্র। ইসলামের বিজয় ক্যারোলিঞ্জিয় ফ্রাঙ্কদের ইউরোপের ভাগ্যবিধাতা হতে সাহায্য করেছিল। যে ফ্রাঙ্করা এতদিন লাতিন ইউরোপে অনুজ্জ্বল ভূমিকায় ছিল, তারা ইতিহাসের পাদপ্রদীপের সামনে আসার সুযোগ পেল। ইসলামীর অভিঘাতে সৃষ্ট ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের শূন্যতা পূর্ণ করা ও ক্ষতিপূরণের

মধ্যযুগে খ্রীষ্টান জগৎ, ইসলামীয় সাম্রাজ্য এবং ক্যারোলিঞ্জিয় রাজ্যের বিকাশের উপর আরবদের সম্প্রসারণের প্রভাব সম্পর্কে হেনরী পিরেনের বক্তব্য হল : খ্রীষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে বর্বরজাতির আক্রমণে পশ্চিম ইউরোপের ভূমধ্যসাগর কেন্দ্রিক যে জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়নি, তা সপ্তম শতকে ইসলামের শক্তির অসামান্য বিস্তারে বিপর্যস্ত হয়ে যায়। আসলে পরোক্ষভাবে ইসলামই ছিল ফ্রাঙ্করাজ শার্লামেনের সম্রাটের মর্যাদায় ভূষিত হবার মূল কারণ।

দায়িত্ব ফ্রাঙ্কদেরই নিতে হয়েছিল। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপের বিচ্ছিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমী সভ্যতার অশিষ্টকে কেন্দ্র করে রোমে এক নতুন সাম্রাজ্যের জন্ম হয়। সৃষ্টি হয় পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের যা ছিল সম্পূর্ণরূপে প্রাচীন পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের প্রভাবমুক্ত। সুতরাং পরোক্ষভাবে মুসলমানগণই ছিল ফ্রাঙ্ক রাজ শার্লামেনের সম্রাটের মর্যাদায় ভূষিত হবার মূল কারণ। অর্থাৎ “মহম্মদই শার্লামেনকে সম্রাট করেছিলেন”। পিরেন মনে করেন, ইসলামী আক্রমণের ফলেই অষ্টম শতকের শুরুতে প্রাচ্যের বাণিজ্য সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় এবং তার ফলে পশ্চিম ইউরোপ অবরুদ্ধ হয়। এই অবরুদ্ধ অর্থনীতির ফলে উদ্ভব হয়

সামন্ততন্ত্রের। পিরেন-এর মতে শার্লামেন সামন্ততন্ত্রের ফল। এ প্রসঙ্গে পিরেনের বিখ্যাত মন্তব্যটি স্মরণীয়— “Without Islam, the Frankish Empire would probably never have existed and Charlemagne without Muhammad would be inconceivable.” তাঁর মতে, কতকগুলি অর্থনৈতিক কারণ এবং ঘটনাবলী এই দুই ব্যক্তির জীবনকে যুক্ত করেছিল। পিরেন-এর সব শেষ বক্তব্য হল — সকল ক্ষেত্রেই শার্লামেনের যুগকে পুনরুজ্জীবনের যুগ বলে মেনে নেওয়া হলেও দুর্ভাগ্যবশতঃ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই ধারণা সঠিক নয়।

হেনরী পিরেনের বক্তব্য নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ। কিন্তু অনেক ঐতিহাসিকই তা গ্রহণ করতে রাজী নন। আধুনিক গবেষণা বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণের পিরেন-এর মত খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন। এর ফলেই জন্মলাভ করেছে পিরেন বিতর্ক।

প্রথমতঃ, ঐতিহাসিক আর. এইচ. সি. ডেভিস যুক্তি দেখিয়েছেন যে মুসলমান আক্রমণের আগেই ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যের অবনতি দেখা দিয়েছিল। তাঁর মতে ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্য চার শতক ধরে হ্রাস পেতে থাকে এবং সপ্তম শতকের শেষে তা চূড়ান্তভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এজন্য ডেভিস মনে করেন যে মুসলমান আক্রমণই এই বাণিজ্যিক পতনের জন্য দায়ী করা সমীচীন হবে না।

দ্বিতীয়তঃ, রবার্ট লোপেজ ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্য থেকে কতকগুলি পণ্যদ্রব্যের অন্তর্হিত হওয়া সম্পর্কে পিরেনের বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। লোপেজের মতে, পিরেন কর্তৃক উল্লিখিত চারটি অন্তর্হিত হওয়া দ্রব্যের মধ্যে তিনটি—স্বর্ণমুদ্রা, বস্ত্র ও প্যাপিরাসের উপর মেরোভিজিয়ান সরকারের একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার ছিল। পিরেন বলেছেন, আরবরা ৬৩৯ খ্রীঃ থেকে ৬৪২ খ্রীঃ এর মধ্যে মিশর অধিকার করে এবং একমাত্র মিশরেই প্যাপিরাস তৈরী হত। এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে লোপেজ দেখিয়েছেন যে ৬৯২ খ্রীঃ পর্যন্ত মেরোভিজিয়ান চ্যান্সারিতে সরকারী কাজে প্যাপিরাস ব্যবহৃত হত।

তৃতীয়তঃ, ড্যানিয়েল সি, ডেনেট ও এ্যান রাইসিং যুক্তি দেখিয়েছেন যে সপ্তম অথবা অষ্টম শতকে আরবদের ভূমধ্যসাগর বন্ধ করার উদ্দেশ্য ছিল এবং তারা ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্য থেকে পশ্চিমকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল এমন কোন প্রমাণ নেই।

চতুর্থতঃ, ডেভিস প্রশ্ন তুলেছেন যে, যদি ধরেও নেওয়া হয় যে অষ্টম শতকের প্রথমে ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্য হয়েছিল, তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে এই প্রমাণ কি আছে যে মুসলমান আক্রমণের ফলেই এই বাণিজ্য বন্ধ হয়েছিল?

সূত্রাং, হেনরী পিরেন-এর ‘catastrophic’ বা ‘আকস্মিক বিপর্যয়’-এর তত্ত্বটি মেনে নেওয়া কঠিন। আরবদের অতর্কিত আক্রমণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ধ্বংস হয়নি। পিরেন যতটা অনুমান করেছিলেন মহম্মদ-এর জীবন ইউরোপের ঘটনাবলীকে ততটা প্রভাবিত করেনি। তবুও একথা বলা যায় যে, যদিও পশ্চিমী বাণিজ্যের আকস্মিক বন্ধ হওয়ায় ঘটনাটি অতিরঞ্জিত তবুও আগের তুলনায় অষ্টম ও নবম শতকে যে বাণিজ্য হ্রাস পেয়েছিল সেদিকে পিরেন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

প্রশ্ন

- ১। হেনরী পিরেন প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইউরোপেই ইতিহাসের মধ্যে ভেদরেখাকে দ্বিক ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন?
- ২। হেনরী পিরেন কোন দেশের ইতিহাসিক এবং তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম লেখ।

১.৬.১৫.৪ : সহায়ক গ্রন্থ (Reference Books)

- | | | |
|----------------------------------------------|---|------------------------------------------|
| 1. অমলেশ ত্রিপাঠী | : | ইতিহাস ও ঐতিহাসিক |
| 2. Arthur Marwick | : | The Nature of History |
| 3. Albert Soboul | : | Understanding the French Revolution |
| 4. g. M. Trevelyan | : | English Social History |
| 5. D. H. Pennington | : | Seventeenth Century Europe |
| 6. L. W. Owie | : | Seventeenth Century Europe. |
| 7. Sumit Sarker | : | Modern India |
| 8. R. C. Majumdar | : | The sepoy Mutiny and The Redvolt of 1857 |
| 9. The Cambridge Economic History fo Europe. | | |

১.৬.১৫.৫ : নমুনা প্রশ্ন (Model Questions)

1. Analyse the debate among historians on the nature of the Civil War in England.
 2. Do you think that the civil War in England was a 'Puritan Revolution'?
 3. 'Charlemagne without Muhammed would be inconceivable'—Do you agree with this view of H. Pirenne.
 4. Evaluate the importance of Pirenne Thesis.
-

একক ১৬

Economic History

বিন্যাস ক্রম :

- ১.৬.১৬.০ : উদ্দেশ্য (Objective)
- ১.৬.১৬.১ : অর্থনৈতিক ইতিহাস এবং তার প্রকৃতি
- ১.৬.১৬.২ : সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণ—যুগ সন্ধিক্ষণের বিতর্ক
 - ১.৬.১৬.২.১ : মরিস ডব ও পল সুইজি
 - ১.৬.১৬.২.২ : মাইকেল পস্টান ও রবার্ট ব্রেনার
- ১.৬.১৬.৩ : ফরাসী বিপ্লব কি বুর্জোয়া বিপ্লব?
- ১.৬.১৬.৪ : সহায়ক গ্রন্থ
- ১.৬.১৬.৫ : নমুনা প্রশ্ন (Model Questions)

১.৬.১৬.০ : উদ্দেশ্য (Objective)

এই অধ্যায়টি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা ঐতিহাসিক বিতর্ক সমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ অর্থনৈতিক ইতিহাস ও তার প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে পারবে। সাম্প্রতিক কালে ঐতিহাসিক বিতর্কগুলিতে অর্থনৈতিক ইতিহাস কিভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছে — তা শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধি করবে। সর্বোপরি এই পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত অর্থনৈতিক ইতিহাস পাঠ করে শিক্ষার্থী দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক যথা : (১) সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণ এবং (২) ফরাসী বিপ্লব একটি বুর্জোয়া বিপ্লব ছিল কিনা সে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কগুলি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হবে।

১.৬.১৬.১ : অর্থনৈতিক ইতিহাস এবং তার প্রকৃতি

অর্থনৈতিক ইতিহাস মূলত অর্থনৈতিক এবং অতীতে ঘটে যাওয়া অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত চর্চা। প্রধানত ঐতিহাসিক পদ্ধতি, পরিসংখ্যানগত পদ্ধতি এবং অর্থনৈতিক তত্ত্বের একত্রে প্রয়োগে এই ধরনের ইতিহাসের আলোচনা সংঘটিত হয়। বর্তমান সময়কালের ঐতিহাসিক আলোচনায় অর্থনৈতিক ইতিহাস অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং অর্থনৈতিক ইতিহাস ছাড়া আধুনিক ইতিহাসের আলোচনায় মূল্যহীন। সামাজিক ইতিহাসের সীমা অতিক্রম করে মূলত আর্থিক ও বাণিজ্যিক ইতিহাস, জনসংখ্যাগত এবং শ্রমিক ইতিহাস ইত্যাদি বিষয় অর্থনৈতিক ইতিহাসের অধীনস্থ। উল্লেখ্য অর্থনৈতিক ইতিহাস সংক্রান্ত চর্চা ‘Cliometrics’ নামেও পরিচিত।

উনবিংশ শতকের শেষার্ধ্বে জার্মানিতে Gustav Von Schmoller এর অধীনে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এক নতুন ঐতিহাসিক গোষ্ঠী (Historical School of Economic History) গড়ে তোলেন। এই গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকেরা পরিমাণগত এবং গাণিতিক দৃষ্টিভঙ্গী উপেক্ষা করেছিলেন। সমগ্র বিংশ শতক জুড়ে তাদের আলোচনায় প্রধানত ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীই প্রাধান্য পেয়েছিল। পরবর্তীকালে ব্রিটেনে অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রসার ঘটান William Ashle (1860-1927)। ব্রিটেনে অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক George Unwin। ফ্রান্সে অর্থনৈতিক ইতিহাস প্রসারিত হয়েছিল অ্যানাল ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর দ্বারা। প্রধানত ‘Annales’, ‘Histoire’, ‘Sciences Sociales’ ইত্যাদি পত্রিকার মাধ্যমে তারা অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রসার ঘটান।

ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস একটি বহুল চর্চিত বিষয়। প্রধানত কৃষিজীবী এবং বাণিজ্যিক সমাজ থেকে ভারত কিভাবে শিল্পোন্নত তথা মিশ্র অর্থনীতির দেশে রূপান্তরিত হল, তা অর্থনৈতিক ইতিহাসের মূল বিষয়বস্তু। হরপ্পা সভ্যতার (৩৩০০-১৫০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে) বাণিজ্য, ষোড়শ মহাজনপদের সময়কালে (খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী) অঙ্কচিহ্নিত মুদ্রা, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বাণিজ্য, নগরায়ণের বিকাশ, ৩০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ থেকে মৌর্য যুগের কৃষি ও বাণিজ্যের মেলবন্ধনে এক অভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, দিল্লী সুলতানি যুগের ইকতা, রাজস্ব ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক পরীক্ষ-নিরীক্ষা, এরপর মুঘল যুগের রাজস্ব ব্যবস্থা, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ভারতে বিভিন্ন ধরনের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা, বাণিজ্য, সম্পদের নির্গমন, অবশিষ্টায়ন, রেলপথের প্রসার, কৃষির বাণিজ্যিকরণ দেশীয় শিল্পের প্রসার ইত্যাদি ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রধান আলোচ্য বিষয়বস্তু। ডি. ডি. কোশাম্বী, রোমিলা থাপার, ডি. এন. ঝাঁ, ঈশ্বরী প্রসাদ, ইরফান হাবিব, সুমিত সরকার, রজনীপাম দত্ত, অমিয় বাগচী, তীর্থঙ্কর রায়, সব্যসাচী ভট্টাচার্য প্রমুখ ভারতীয় ঐতিহাসিক ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের রূপরেখা আলোচনা করেছেন।

সাম্প্রতিককালে ইতিহাসচর্চায় ঐতিহাসিক বিতর্কগুলি একটি বিশেষ স্থান লাভ করেছে। এদের মধ্যে অর্থনৈতিক ইতিহাস সংক্রান্ত বিতর্ক বরাবরই আকর্ষণীয় এবং ইতিহাসচর্চাকে তা বহুল পরিমাণে সমৃদ্ধ করেছে। সাধারণত নিত্যনতুন ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদঘাটনে আলোচনা, সমালোচনা, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আলোচ্য অধ্যায়ে অর্থনৈতিক ইতিহাসের বিতর্কগুলিতে একাধিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সাধারণত এই বিষয়ে অবগত হওয়া প্রয়োজন যে, ভারত ও বিশ্বের ইতিহাসে গতিপ্রকৃতি নির্ধারণকারী অর্থনৈতিক বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। কারণ সেগুলি ইতিহাসে খুবই প্রাসঙ্গিক। এদের মধ্যে ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব, ইউরোপে সামন্ততন্ত্র, সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণ এবং ফরাসী বিপ্লবের বুর্জোয়া প্রকৃতি সম্পর্কে ঐতিহাসিক বিতর্কগুলি আলোচনা করা হবে।

১.৬.১৬.২ : সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণ — যুগ সন্ধিক্ষণের বিতর্ক

অর্থনৈতিক, আর্থ-সামাজিক বা শাসনতান্ত্রিক — যে কোন দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই ঐতিহাসিকেরা একটি বিষয়ে একমত হয়েছেন। এটি হল দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই সামন্ততন্ত্র তীব্র হয়ে উঠেছিল। তবে ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ্বে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির পতন দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। উল্লেখ্য এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে ঐতিহাসিকেরা

একমত হলেও এর পতনের কারণ সম্পর্কে তাঁরা একমত হতে পারেননি। কারণ এটি শুধু এক বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবসানই নয়, বরং এর সঙ্গে অপর একটি যুগ ব্যবস্থার উত্থানের প্রশ্নও জড়িত আছে। যা ধনতন্ত্র নামে পরিচিত। এই রূপান্তরের ঘটনা এবং তার প্রকৃতি সম্পর্কে বিংশ শতকের গোড়ায় এক বিতর্ক দেখা দেয় — যা ‘যুগসন্ধিক্ষণের বিতর্ক’ বা ‘Transition debate’ নামে পরিচিত। সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয়ের হাত ধরে ধনতন্ত্রের উদ্ভবের প্রথাকে, তার পদ্ধতিকে, এবং নিয়মপ্রণালীকে ঘিরে পণ্ডিত মহলে প্রচুর মতামত আছে। তিনপ্রকার গোষ্ঠীর মধ্যে প্রথমতঃ ডব-সুইজি; দ্বিতীয়তঃ মাইকেল পস্টান ও বরার্ট ব্রেনার এবং তৃতীয়তঃ হবসবম—ট্রেভার — রোপার। এক্ষেত্রে প্রথম দুটি বিতর্ক বিশেষ আলোচনার দাবী রাখে।

১.৬.১৬.২.১ : মরিস ডব ও পল সুইজি

ব্রিটিশ মার্কসীয় অর্থনীতিবিদ মরিস ডব ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত ‘Studies in the Development of Capitalism’ গ্রন্থে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি ও তার পতন সম্পর্কে দুটি অভিমত প্রকাশ করেন। প্রথমতঃ সামন্ততান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার ভরকেন্দ্র ভূমিদাস প্রথার অবসানই সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির পতনের সূচক। দ্বিতীয়তঃ সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির পতনের জন্য দায়ী ছিল সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোয় নিহিত অন্তর্বিরোধ। মূলত ডবের আলোচনায় সামন্ততন্ত্রের পতন উৎপাদন সম্পর্কের বা Production relation-এর মধ্যেই নিহিত ছিল।

ডবের মতে, দশম শতাব্দীতে কৃষি নির্ভর ইউরোপীয় অর্থনীতিতে কৃষিকার্যে নিযুক্ত মানুষ স্বেচ্ছায় বা পরিস্থিতির চাপে সামন্তপ্রভুর বশ্যতা স্বীকার করে ভূমিদাসে পরিণত হয়। প্রতিটি সামন্তপ্রভুর অধীনস্থ এলাকা বা ম্যানর-এ বসবাসকারী ভূমিদাস বা সার্করা জমির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে গণ্য হত। এই ভূমিদাস প্রথাকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছিল সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি। এই ব্যবস্থায় প্রতিটি ম্যানরে যা উৎপন্ন হত তা ম্যানরেই সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়ে যেত। ম্যানরের বাইরে বা বাজারে কেনাবেচার কোনো উদ্দেশ্যে উৎপাদনের কোনো তাগিদ ছিল না। তাই সামগ্রিকভাবে এই ধরনের অর্থনীতিকে বলা হত Economy of no outless।

কিন্তু সাধারণত ম্যানরে ব্যবহার হয় এমন অধিকাংশ বস্তু ম্যানরে প্রস্তুত হলেও কিছু দৈনন্দিন জিনিসপত্র যেমন— নুন, মশলা ইত্যাদি ম্যানরের বাইরে থেকে আনতে হত। —যা যোগান দিত বণিকেরা। ম্যানরের দুস্থাপ্য পণ্যের পরিবর্তে এঁরা ম্যানর থেকে শস্য এবং খাদ্য বা পণ্যদ্রব্য নিম্নে নগরবাসীদের চাহিদা মেটাতে। একাদশ শতকের শেষ লগ্ন থেকে ইউরোপীয় দূরবাণিজ্যের প্রসার ঘটলে এই বণিকেরা সুদূর এশিয়া থেকে আমদানি করা পণ্যদ্রব্য (যেমন — মশলা, রেশম, মসলিন, ধূপ ইত্যাদি) ইউরোপের প্রায় সর্বত্র পৌঁছে দেন। ইউরোপের এক প্রান্তের জিনিস (যেমন উত্তর ইউরোপের পশম, পশুচামড়া, ফরাসি মদ) অন্য প্রান্তের বাজারে পৌঁছাতে থাকে।

তবে ডবের মতে, উন্মুক্ত বাণিজ্যিক দিগন্তই সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ার একমাত্র কারণ নয়। তাঁর মতে, বণিকদের দ্বারা ম্যানরের বাইরে থেকে আনীত নতুন নতুন এবং মূল্যবান দ্রব্য সংগ্রহ করার জন্য সামন্তপ্রভুরা প্রজাদের উপর বাড়তি কর চাপাতে থাকেন। পশ্চিম ইউরোপের বাড়তি করের চাপ সহ্য করতে না পেরে অনেক সময় ভূমিদাস ম্যানর ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে নিকটবর্তী নগরাঞ্চলে বা জঙ্গলে গা ঢাকা দিত। ভূমিদাস প্রথার আইন অনুসারে কোনো ভূমিদাস যদি পালিয়ে গিয়ে একবছর গা ঢাকা দিতে সফল হত, তবে সে ভূমিদাসই থেকে মুক্তি পেত। এহেন পরিস্থিতিতে সামন্তপ্রভুরা তাদের বর্ধিত চাহিদা মেটাতে খাজনা শস্যের বদলে নগদে চাইতে শুরু

করে। একে বলে ‘খাজনা নগদীকরণ’। ডবের মতে, এটিই ছিল সামন্ততন্ত্রের পতনের সূচক। কারণ নগদীকরণের পরে সামন্তপ্রভুদের উৎপাদনের উপর পূর্ববৎ নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ আর ছিল না। ইতিমধ্যে ভূমিদাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে প্রজারা ম্যানরের বাইরে বাজারের জন্য উৎপাদন করতে থাকে। এ প্রসঙ্গে ডব বলেছেন, ‘there seems, in fact, to be as much evidence that the growth of money economy per se led to an intensification of serfdom as there is evidence that it was the cause of the feudal decline.’

ডবের মতে, মামুলি প্রযুক্তি, সাধারণ উৎপাদনের সাধন দিয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যে উৎপাদন বিশাল বৃদ্ধি করা সম্ভব ছিল না বলেই ভূমিদাসরা পালাতে চেয়েছিল। পক্ষান্তরে সামন্তপ্রভুরাও উৎপাদন ব্যবস্থা অপরিবর্তিত রেখে চাহিদা এমন জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলেন যা সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় মেটানো সম্ভবপর ছিল না। চাহিদা এবং উৎপাদন ব্যবস্থার এই বিরোধকেই ডব সামন্ততন্ত্রের ‘অন্তর্বিরোধ’ (Internal Contradiction) বলেছিলেন। ডবের মতে, যেসব ভূমিদাসরা পালাতে পারত না, তাদের পুরানো ব্যবস্থার ভিত্তিতেই এই ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য অতিরিক্ত শ্রম দিতে হত। এছাড়া তাদের সংখ্যাও খুব অল্প ছিল। এই পরিস্থিতিই সামন্তপ্রভুদের কিছু কিছু উপযোগী উপায় যেমন—শ্রমের নগদ মজুরী, ভাড়াটিয়া কৃষকদের (Tenant farmers) খাসজমি লিজ দেওয়া প্রভৃতি গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল—এটিই শেষ পর্যন্ত উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটিয়েছিল।

মার্কিন অর্থনীতিবিদ পল সুইজি ডবের এই অন্তর্বিরোধের তত্ত্ব মানেন না। সুইজির দৃষ্টিতে সামন্ততন্ত্রের অবসানে ইউরোপীয় অর্থনীতিতে দূরবাণিজ্যের প্রসারই ছিল একমাত্র চালিকা শক্তি। ১৯৫০ সালে ‘Science and Society’ নামক পত্রিকায় সুইজি ‘Feudalism : A Critique’ প্রবন্ধে বলেছেন, একাদশ শতকের শেষ লগ্ন থেকে পৃথকভাবে ভূ-মধ্যসাগরীয় এবং উত্তর সাগরীয় বাণিজ্য বাড়তে থাকার ফলে পশ্চিম ইউরোপের নগরজীবন জন্ম হয়ে উঠতে শুরু করে। ধর্মযুদ্ধ এবং ধর্মযুদ্ধকে কেন্দ্র করে বাড়তে থাকা খ্রিস্টীয় চেতনা ইউরোপের মধ্যে আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ বাড়িয়ে তোলে। এর ফলে ইতালিয় বণিকেরা ভূ-মধ্যসাগরীয় এশিয়া এবং আফ্রিকার পণ্যসম্ভার নিয়ে পশ্চিম ও পূর্ব ইউরোপে প্রবেশ করতে থাকেন। ফ্রান্স, ফ্লান্ডার্স, রাইনল্যান্ড প্রমুখ অঞ্চলে বণিকদের সঙ্গে এই ইতালিয় বণিকদের বাৎসরিক মিলন ক্ষেত্র ছিল শম্পান (Champagne) মেলা। এই আন্তঃ ইউরোপীয় বাণিজ্য পথকে কেন্দ্র করে পশ্চিম-মধ্য ইউরোপের অসংখ্য নতুন নগরের পত্তন হয় বা ক্ষয়িষ্ণু বহু নগর পুনর্জীবন লাভ করে।

সুইজির মতে, এই নগরায়ণের প্রক্রিয়া ছিল সামন্ততন্ত্রের পতনের অন্যতম কারণ। এই সময় নগরবাসীদের চাহিদা এবং ক্রয়ক্ষমতা আনুপাতিক হারে বাড়তে থাকে। নগরাঞ্চলে ম্যানরের উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্যের (শস্য, সবজি ইত্যাদি) চাহিদা বাড়ার কারণে নগদীকরণ প্রক্রিয়াও কার্যকরী হয়েছিল। অন্যদিকে সামন্তপ্রভুদের বর্ধিত খাজনার চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ পলায়নোন্মুখ প্রজারা পশ্চিম ইউরোপের নগরাঞ্চলে আশ্রয় নিলে জনসংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। এর ফলে ইউরোপীয় শিল্পক্ষেত্রও আয়তন বাড়তে থাকে। উৎপাদন এই সময় ক্রমশ বাজারমুখী হয়ে পড়লে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে অবসান ঘটে সামন্ততন্ত্রের। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, ‘It seems to me that the important conflict in this connection is not between “money economy” and “natural economy” but between production for the market and production for use.’ যদিও তিনি বলেন যে, সামন্ততন্ত্রের পতনে অর্থনীতির বাণিজ্যিকরণ ছিল এক অপরিহার্য পূর্বশর্ত।

১.৬.১৬.২.২ : মাইকেল পস্টান ও রবার্ট ব্রেনার

সমসাময়িক ইতিহাসবিদ মাইকেল পস্টান উভয়ের উপরোক্ত মতামত মেনে নিতে পারেননি। তাঁর মতে, ইতিহাসের দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তনের মূল ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় জনসংখ্যার দীর্ঘমেয়াদি তারতম্যে। সামন্ততন্ত্রের শীর্ষবিন্দু এবং অবসানের আলোচনাতেও মাইকেল পস্টান তাঁর জনসংখ্যা-বিষয়ক (demographic) তত্ত্বের অবতারণা করে দেখান যে, সামন্ততন্ত্রের সঙ্কট তাঁর কাঠামোতে নিহিত ছিল না। তা ছিল সামন্ত সমাজের আয়তন এবং শক্তি বিন্যাসের উপর নির্ভরশীল।

পস্টান বলেন যে, দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপের জনসংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। এর সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের চাহিদাও ক্রমশ বাড়তে থাকে। কিন্তু কৃষির উৎপাদনশীলতা প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। এই পরিস্থিতিতে পূর্বের পতিত জমিগুলি তখন চাষ করা শুরু হয়। কৃষিজমির উপর চাপ বাড়তে থাকায় জমির উর্বরতা কমেতে থাকে। পরিণামে খাদ্যমূল্য বাড়তে থাকে এবং সামন্তপ্রভুরা তাদের খাজনার পরিমাণ বাড়তে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। জমি ব্যবহারের বিনিময়ে ভূমিদাসের প্রদত্ত খাজনা নির্দিষ্ট থাকার ফলে সামন্তপ্রভুরা অন্যান্য খাতে বাড়তি খাজনা আদায় করতে সচেষ্ট হন। যেমন — অন্যান্য ধরনের জরিমানা, কর (taillage), সামন্তপ্রভুর জমিতে বাড়তি শ্রম (Labor Services)। জনসংখ্যা এবং খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে জীবনধারণের স্বার্থে কৃষিজীবী শ্রেণী সামন্তপ্রভুর উপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। শ্রমজীবী এবং জমির তুলনামূলক চাহিদা যোগানের নিরিখে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সামন্তপ্রভুর অনুকূলে চলে যায়।

পস্টান এই মতামত তুলে ধরেন যে, চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটেছিল জনসংখ্যাগত কারণেই। কৃষির উপর চাপ বৃদ্ধির কারণে জমির উর্বরতা হ্রাস, দুর্ভিক্ষ, মহামারি প্রভৃতির কারণে ব্যাপক হারে জনসংখ্যায় হ্রাস পেতে শুরু করে। ফলস্বরূপ শ্রমের চাহিদা শ্রমের যোগানের তুলনায় বেশি হতে থাকে। চাষের কাজে প্রয়োজনীয় শ্রমশক্তি হারাবার আশঙ্কায় সামন্তপ্রভুরা খাজনার ভার কমানো ছাড়াও কৃষিজীবীদের উপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল করতে বাধ্য হন। এই পরিস্থিতিতেই খাজনার নগদীকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। প্রশস্ত হয় কৃষিজীবীর স্বাধীনতরা ক্ষেত্র। দুর্বল হতে থাকে ভূমিদাসপ্রথা এবং সামন্ততন্ত্র।

অপর একজন ব্রিটিশ মার্কসীয় ইতিহাসবিদ রবার্ট ব্রেনার সামন্ততন্ত্রের পতন এবং ধনতন্ত্রের উত্থানের পথ ব্যাখ্যা করেছেন। ১৯৭০-এর দশকে ‘Past and present’ পত্রিকায় ব্রেনার তাঁর ‘Agrarian class structure and Economic Development in pre-industrial Europe’ প্রবন্ধে ‘বাণিজ্যিকীকরণ তত্ত্ব’ এবং ‘জনসংখ্যা তত্ত্ব’র মাধ্যমে সামন্ততন্ত্রের পতনের যুক্তি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। বাণিজ্যিকীকরণ তত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি দেখান যে, পশ্চিম ইউরোপের মত পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতেও বাণিজ্য বিপ্লব সামন্তপ্রভুদের চাহিদা বৃদ্ধি করেছিল। ফলে খাজনার নগদীকরণের ক্ষেত্র উপস্থিত ছিল। বাণিজ্যের পরিমাণ এতটা কম ছিল না যে, পূর্ব ইউরোপে নগরায়ণ সম্ভবপর হত না। ব্রেনার প্রশ্ন তুলেছেন যে, পূর্ব ইউরোপে তাহলে পশ্চিম ইউরোপের মত পরিবর্তন হল না কেন? অন্যদিকে জনসংখ্যা বিষয়ক বক্তব্য তুলে ধরে ব্রেনার আরো প্রশ্ন করেন যে, দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে ইউরোপের দুটি দিকেই জনসংখ্যা বেড়েছিল, এবং চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে দু’দিকেই জনসংখ্যা কমে গিয়েছিল। তাঁর মতে, একই ঘটনা পরম্পরার দুটি পৃথক পরিণত হবার কারণ কি?

ব্রেনার মনে করেন যে, সামন্ততন্ত্রের পতন সম্পর্কিত ব্যাখ্যায় রাজনীতিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। তাঁর মতে রাজনৈতিক শক্তি সমাজের অর্থনীতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। এবং অনেক ক্ষেত্রে সমাজের আর্থ-সামাজিক চরিত্র নির্ধারণে রাজনৈতিক শক্তির বিন্যাস খুব প্রভাবশালী ভূমিকা নিয়ে থাকে। ব্রেনার বলেন যে, পশ্চিম এবং পূর্ব ইউরোপে রাজনৈতিক শক্তির বিন্যাস একরকম ছিল না। সামন্ততন্ত্রের শীর্ষ বিন্দুতেও পশ্চিম ইউরোপে (বিশেষত—ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জার্মান সাম্রাজ্যভুক্ত অঞ্চল, নেদারল্যান্ডস) রাজশক্তি এবং রাজন্যবর্গের মধ্যে ক্ষমতার সংঘর্ষ তীব্র হয়। রাজশক্তি কোথাও সামন্ত শ্রেষ্ঠ হিসাবে (যেমন — ফ্রান্স) বা দেবাধিকার প্রাপ্ত শক্তি হিসাবে (যেমন— জার্মান শাসনাধীন পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য) রাজন্যবর্গের বা অভিজাতবর্গের মোকাবিলা করতে উদ্যোগী হয়। এর জন্য রাজাকে নিজের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে হয় এবং তার সাধন যোগান দিতে পারত একমাত্র কৃষিজীবী মানুষ। তাই কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের উপর রাজশক্তির প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপায় ছিল রাজকীয় আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সামন্তপ্রভুর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে রাখা। ঠিক এই কারণেই পশ্চিম ইউরোপে ভূমিদাসত্বের তীব্রতম পরিস্থিতিতেও ভূমিদাসদের ন্যূনতম কিছু অধিকার ছিল যা সামন্ত প্রভুরাও লঙ্ঘন করতে পারত না। এছাড়া জনসংখ্যার চাপে অনাবাদী জমি চাষের আওতায় আনার ব্যাপারে এবং নতুন বসতি পত্তনের ক্ষেত্রে এই কৃষিজীবীরা সামন্তপ্রভুদের অধিকার আরও সীমিত রাখতে সফল হয়। ফলে রাজশক্তি এবং প্রজাবর্গের মিলিত চাপে সামন্তপ্রভুরা নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতেই দেখা দেয় খাজনার নগদীকরণ, ভূমিদাস প্রথার অবসান এবং সামন্ততন্ত্রের পতন।

অন্যদিকে পূর্ব ইউরোপের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে রোমান সাম্রাজ্য বাদ দিলে রাষ্ট্রশক্তি বলতে কিছু ছিল না। ফলে সামন্তশক্তির হাতেই সামগ্রিক নিরাপত্তার ভার ন্যস্ত থাকার ফলে বণিকরা এই অঞ্চলে সম্পূর্ণত সামন্তশক্তির মুখাপেক্ষা হয়ে বাণিজ্য চালাত এবং এ থেকে লাভবান হয়েছিল শুধু সামন্ত শ্রেণী। এই কারণে পশ্চিম ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের অবসান হলেও রাজনৈতিক শক্তির বিন্যাসের পার্থক্যের জন্যই পূর্ব ইউরোপে সামন্ততন্ত্র আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে বলে মনে করতেন রবার্ট ব্রেনার।

উক্ত ঐতিহাসিকগণ ছাড়াও মার্ক ব্লখ, রোদনী হিলটন প্রমুখ ঐতিহাসিকরা সামন্ততন্ত্রের পতনে বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তবে এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, চতুর্দশ শতকেই সামন্ততন্ত্রের পতন তরাণিত হয়। কারণ চতুর্দশ শতাব্দীতে ইউরোপের অর্থনীতি এক সঙ্কটের মুখোমুখি হয় যা সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর অবশিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলিকে দূর করে ধনতন্ত্রের আগমনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

১.৬.১৬.৩ : ফরাসী বিপ্লব কি বুর্জোয়া বিপ্লব?

১৭৮৯ সালের ১৪ই জুলাই বাস্তিল দুর্গের পতনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত ফ্রান্সের ফরাসী বিপ্লব বিশ্ব ইতিহাসে এক যুগান্তকারী পরির্তনের সূচনা করেছিল। মূলত সামাজিক, অর্থনৈতিক দিক থেকে অধিকারভোগী শ্রেণীর (যাজক ও অভিজাত) বিরুদ্ধে অধিকারহীন শ্রেণীর (বুর্জোয়া, কৃষক, শ্রমিক, সাঁকুলেৎ প্রভৃতি) এই বিপ্লব ফ্রান্সে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার সূচনা করেছিল। ‘তৃতীয় এস্টেট’ (অধিকারহীন) নিজেকে জাতীয় সভা হিসাবে ঘোষণা

করে রাজার স্বৈরাচারী ক্ষমতার বিরোধিতা করেছিল। ‘সাংবিধানিক সভা’ ১৭৮৯ সালের ২৬শে আগস্ট ‘ব্যক্তি ও নাগরিকের অধিকার ঘোষণা’ (Declaration of the Right of Man and Citizen) করে সকল মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠার পথকে প্রশস্ত করে।

জাতীয় সভা ফ্রান্সের জন্য একটি সংবিধান রচনার কাজে ব্রতী হলে এই সভা সংবিধান সভায় রূপান্তরিত হয়। সংবিধান সভা ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দের আগস্টে সংবিধান রচনার কাজ আরম্ভ করেছিল, ১৭৯১ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে তা শেষ হয়।

কিন্তু সাম্প্রতিককালে ঐতিহাসিকদের মধ্যে অর্থনৈতিক ইতিহাসের যে বিষয়গুলি নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে, তা হল ফরাসী বিপ্লবের চরিত্র বা প্রকৃতি নির্ণয় করা। উল্লেখ্য অর্থসঙ্কটে অসহায় এবং অভিজাত বিদ্রোহে ভীত ফরাসী রাজ ষোড়শ লুই ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ১লা মে স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন ডাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা গিয়েছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতেই যাবতীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। অধিকারহীন তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেছিল ধনী ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্কার ও চাকুরীজীবী বুর্জোয়ারা। কার্যক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতেই সমস্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি নিষ্কিপ্ত হয়েছিল।

ষোড়শ লুই জাতীয় সভা ডাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর সকল শ্রেণীর প্রজাদের কাছ থেকে জাতীয় সভা সম্পর্কে তাদের প্রস্তাব ও অভিযোগগুলি জানাতে কেহিয়াঁস বা আবেদন পত্র পাঠাতে বলেন। উল্লেখ্য তৃতীয় শ্রেণীর পক্ষ থেকে যে কেহিয়াঁসগুলি আসে তা গুরুত্বপূর্ণ। এই কেহিয়াঁসগুলি রচনার সময় বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরাই প্রধান ভূমিকা নেয়। ঐতিহাসিক কোক্বানের মতে, শহুরে অধিবাসীদের কেহিয়াঁসে স্বচ্ছল কৃষকদের অভিমত প্রতিধ্বনিত হয়। কেহিয়াঁসগুলিতে জমি বন্টনের দাবী ছিল না। লাফায়েৎ বা মিরাব্যু (বুর্জোয়া নেতৃবৃন্দ) সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের বিপক্ষে ছিলেন না। প্রধানত অপ্রতিহত স্বৈরতন্ত্র থেকেই বুর্জোয়া শ্রেণী মুক্তি চেয়েছিল। অর্থবান ও ক্ষমতাসম্পন্ন উচ্চ শ্রেণীর বুর্জোয়ারা পুরানো ব্যবস্থায় নিজেদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের বাধাকে সরাতে চেয়েছিলেন।

জাতীয় সভার অধিবেশন বসলে দেখা যায় এই সভার ১২১৪ জন মোট সদস্যদের মধ্যে যাজক ও অভিজাতদের মোট সদস্য ছিল ৫৯৩ জন এবং তৃতীয় শ্রেণীর সদস্য ছিল ৬২১ জন। তৃতীয় শ্রেণীর পক্ষে প্রধানত বুর্জোয়ারাই নির্বাচিত হয়। তৃতীয় শ্রেণীর সদস্যদের মধ্যে আইনজীবী ছিল ২০%, চাকুরীজীবী ৫%, বণিক ও শিল্পপতি ছিল ১৩%, কৃষকের প্রতিনিধি ছিল ৭-৯%। ইতিমধ্যে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের প্রচার ও যুক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বেশ কিছু যাজক ও কিছু অভিজাত নিজ নিজ শ্রেণী ত্যাগ করে বুর্জোয়া সদস্যদের সঙ্গে যোগ দেয়।

একদিক থেকে এই বিদ্রোহকে ‘বিপ্লব’ বলা যায়। কারণ অভিজাত ও যাজক এই দুই সুবিধাভোগী শ্রেণীর চিরাচরিত বৈষম্যমূলক অধিকার নাশ করার কাজে বুর্জোয়া শ্রেণী সক্রিয় উদ্যোগ নিয়েছিল। যদি শ্রেণীসংগ্রামকে ‘বিপ্লব’ বলা হয়, তবে বুর্জোয়া শ্রেণীর এই সংগ্রাম ছিল বিপ্লব। তাছাড়া বুর্জোয়া নেতারা যে বিপ্লবী সংবিধান রচনা করে তা সামন্তপ্রথার মৃত্যু ঘণ্টা বাজায়। বুর্জোয়া বিপ্লব দ্বারা স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের পতন ত্বরান্বিত হয়। বুর্জোয়া শ্রেণী যে নতুন সংবিধান রচনা করেন তাতে ফরাসী দার্শনিক মন্টেস্কুর ‘ক্ষমতা বিভাজন নীতি’ অনুসরণের মাধ্যমে রাজার ক্ষমতা হ্রাস করা হয়।

কিন্তু কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন যে, বুর্জোয়া শ্রেণীর জয়লাভের ফলে কোনো আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন সঙ্গে সঙ্গে ঘটেনি। এমনকি রাজতন্ত্রও বহাল ছিল। বুর্জোয়ারা অভিজাতদের বিশেষ অধিকার কেড়ে নিয়ে রাজনৈতিক ও শাসন ক্ষমতা নিজ শ্রেণীর হাতে ন্যস্ত করে। তারা সর্বসাধারণের ভোটাধিকার দ্বারা গ্রামীণ কৃষক ও শ্রমিকদের ভোটাধিকার না দিয়ে সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার চালু করে। ফলে সম্পত্তিভোগী বুর্জোয়া শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত্ব করে। সুতরাং এই সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বুর্জোয়া শ্রেণীর বিপ্লবকে ‘প্রকৃত বিপ্লব’ বলা যায় না।

কোনো কোনো গবেষক বুর্জোয়া শ্রেণীর বিপ্লবকে প্রকৃত বিপ্লব বলতে আপত্তি প্রকাশ করেছেন। কারণ বুর্জোয়া শ্রেণী রক্তপাত ও হিংসার পথে না গিয়ে রাজনৈতিক ও আইনের চাপে জাতীয় সভায় তাদের অধিকার আদায় করে। যদিও খুব শীঘ্রই সাঁকুলেৎ ও জনসাধারণ বুর্জোয়াদের ক্ষমতাচ্যুত করে। এইভাবে বুর্জোয়া বিপ্লব শেষ পর্যন্ত জাতীয় বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করে।

সাংবিধানিক সভার বুর্জোয়া সদস্যরা সম্পত্তির অধিকারকেই একমাত্র পবিত্র অধিকার বলে গণ্য করত। এই কারণে এই সভা ফ্রান্সের সকল নাগরিককে সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার দেয়। ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন এই কারণে বলেন যে, যাজক, অভিজাত ও সাধারণ লোকের পরিবর্তে এই সংবিধান পাউণ্ড, সিলিং ও পেনীর ভিত্তিতে নতুন শ্রেণী গঠন করে। ভোটাধিকার নীতির এই বঞ্চনার ফলে ফ্রান্সের প্রায় ৩০ লক্ষ নাগরিক ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। মানব জাতির ঘোষণাপত্রে সাংবিধানিকসভা রুশোকে অনুসরণ করে বলে যে, ‘সকল মানুষ স্বাধীনতা ও সমান অধিকার নিয়ে জন্মায়। তাহলে এই ৩০ লক্ষ নাগরিককে সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত করে সংবিধান সভা পরস্পরবিরোধী কাজ করেছিল। ফ্রান্সে বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সকল নাগরিকদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। কৃষক ও সাঁকুলেৎ সম্প্রদায়কে বঞ্চিত করে বুর্জোয়ারা সব ক্ষমতা কুক্ষিগত করে। লেফেভর-এর মত ঐতিহাসিক বলেন যে, সংবিধান সভা ফ্রান্সে অর্থনৈতিক সমতার দিকে নজর না দিয়ে পুঁজিবাদী বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

১.৬.১৬.৪ : সহায়ক গ্রন্থ

1. রীলা মুখার্জী—‘রূপান্তরিত ইউরোপ’
2. Meenakshi Phukan—‘The Rise of the Modern West’
3. প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী—‘ফরাসী বিপ্লব’
4. ‘ইউরোপের যুগান্তর’—সুভাষ রঞ্জন চক্রবর্তী, ভাস্কর চক্রবর্তী, কিংশুক চট্টোপাধ্যায়
5. ‘The Transition from Feudalism to Capitalism’—Paul Sweezy
6. The ‘French Revolution’ Vol-I—George Lefebvre

১.৬.১৬.৫ : নমুনা প্রশ্ন (Model Questions)

1. ঐতিহাসিক বিতর্কে অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রকৃতি আলোচনা কর?
 2. সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণের প্রক্রিয়াগুলি আলোচনা কর?
 3. মরিস ডব ও পল সুইজি কিভাবে সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণের বিষয়টি আলোচনা করেছেন?
 4. সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণের বিষয়ে মাইকেল পস্টান ও রবার্ট ব্রেনার — এর বক্তব্যগুলি আলোচনা কর?
 5. তুমি কি মনে কর যে, ফরাসী বিপ্লব একটি বুর্জোয়া বিপ্লব ছিল?
-